শৈলী, পাঠকের বোধগম্যতা এবং তাত্ত্বিক অনুসন্ধান: নবনীতা দেবসেনের নির্বাচিত কথাসাহিত্য

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচ.ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

পারমিতা দাস

নিবন্ধীকরণ সংখ্যা: AOOBE0500119

নিবন্ধীকরণের তারিখ: 19.08.2019

তত্ত্বাবধায়ক

ড. পায়েল বসু

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৫

Certified that the Thesis entitled

"শৈলী, পাঠকের বোধগম্যতা এবং তাত্ত্বিক অনুসন্ধান: নবনীতা দেবসেনের নির্বাচিত কথাসাহিত্য" submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Dr. Payel Basu and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor : Payel Basu

Dated : 2/6/25

Assistant Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata-700 032

Candidate : Paramita Das

Dated : 02/06/2025

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণাকর্ম আমার একক প্রয়াস নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বেশ কিছু মানুষের প্রেরণা, সহায়তা ও ভালোবাসা। পথ চলার প্রতিটি ধাপে যাঁরা পাশে থেকেছেন, সময় দিয়েছেন এবং চিন্তার উদ্দীপনা সঞ্চার করেছেন, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এই গবেষণা যদি এতটুকু সাফল্য অর্জন করতে পারে, তবে তা হবে তাঁদেরই সম্মিলিত অবদানের প্রতিফলন।

আমি প্রথমেই অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. পায়েল বসুকে। তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ, সহানুভূতিশীল দিকনির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই গবেষণা সম্ভব হত না। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক ড. সমীর কর্মকারের নিরলস সহায়তা ও তত্ত্বাবধান এই গবেষণাকে সফল করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর প্রতি আমার সকৃতজ্ঞ প্রণাম রইল।

গবেষণায় বিশেষ সহায়তা ও দিকনির্দেশনার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রাজ্যেশ্বর সিনহাকে। তাঁর সাহায্য ও মূল্যবান পরামর্শ আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর কাছে আমি কৃতঋণ। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ NPTEL এবং IIT Guwahati কর্তৃক আয়োজিত ‘Language, Culture and Cognition: An Introduction’ কোর্সটির প্রতি। এই কোর্সটি থেকে অর্জিত জ্ঞান আমার গবেষণার চিন্তা ও বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কোর্সটির প্রশিক্ষক অধ্যাপক ড. বিদিশা সোম, যাঁর গভীর জ্ঞান ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা আমার গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছে, তাঁর প্রতিও রইল আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। ভাষাবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির মূলে যাঁর অবদান বিশেষ স্মরণীয়, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। তাঁকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অন্যান্য শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাইদের থেকেও নানা সময়ে প্রাজ্ঞ

পরামর্শ পেয়েছি, মাস্টারমশাইতুল্য সহকর্মীদের থেকেও পেয়েছি সহযোগিতা। তাঁদের কাছেও স্বীকার করি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা, জানাই প্রণাম।

আমার মা, শ্রীমতী রিনা দাস যেভাবে আমাকে গবেষণার জন্য পরিসর যুগিয়েছেন, তা সকৃতজ্ঞচিত্তে আমার চিরস্মরণীয়। গবেষণাকর্মের অন্যতম প্রেরণাদাতা আমার বাবা শ্রী নিতাই সুন্দর দাস, যিনি বাংলা সাহিত্যের একজন শিক্ষক, তাঁর কাছেই আমার বাংলা সাহিত্য অধ্যয়নে হাতেখড়ি। মা-বাবাকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমার অন্যান্য প্রিয়জন ও বন্ধুদের আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা। গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগারিকদের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এই কাজটি সকলের সম্মিলিত অবদানের ফসল।

অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের এই লিপিবদ্ধ সন্দর্ভ বিশেষজ্ঞ পরীক্ষকদের কাছে আমি বিনীতভাবে উপস্থাপন করছি। ত্রুটিমুক্তভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলেও, অনবধানবশত যদি কোনও ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে থাকে, তার জন্য গবেষক ক্ষমাপ্রার্থী।

বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা
০২.০৬.২০২৫

পারমিতা দাস

সূচিপত্র

বিষয়সূচি

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii

সূচিপত্র........ v

ভূমিকা........ x

শৈলীবিজ্ঞান ও বোধগত শৈলীবিজ্ঞান: উদ্ভব ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী........ xvii

নবনীতা দেবসেনের জীবন ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা xxx

১. নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার বৈচিত্র্য অনুসন্ধান........ ১-৪৪

১.১. ভূমিকা ২

১.২. পদ্ধতি ৫

১.৩. বিশ্লেষণ ও আলোচনা ৮

১.৩.১. চিত্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্র........ ৮

১.৩.২. চিত্রকল্পের প্রকার........ ৮

১.৩.৩. চিত্রকল্পে ধৃত বিবিধ ধারণা........ ২৫

১.৪. উপসংহার........ ৩৯

১.৫. তথ্যসূত্র........ ৪১

২. পাঠকের বোধে চিত্রকল্পের প্রবেশ ও প্রভাব........ ৪৫-৫৫

২.১. ভূমিকা........ ৪৬

২.২. পদ্ধতি ৪৭

২.৩. বিশ্লেষণ ও আলোচনা........ ৫০

২.৫. তথ্যসূত্র........ ৫৪

৩. নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে আন্তর্বয়নের প্রকৃতি নির্ধারণ........ ৫৬-১১২

৩.১. ভূমিকা........ ৫৭

৩.২. পদ্ধতি........ ৬৩

৩.৩. বিশ্লেষণ ও আলোচনা ৬৬

৩.৩.১. আন্তর্বয়নের প্রকৃতি অন্বেষণ........ ৬৬

৩.৩.২. চিত্রকল্প নির্মাণে আন্তর্বয়ানের ভূমিকা........ ৯৮

৩.৩.৩. আন্তর্চারিত্রিকতা ও তার প্রকৃতি অন্বেষণ........ ১০০

৩.৪. উপসংহার ১০৬
৩.৫. তথ্যসূত্র...১০৮

৪. পাঠকের বোধে আন্তর্বয়ানের প্রবেশ ও প্রভাব ১১৩-১২৪
৪.১. ভূমিকা ১১৪
৪.২. পদ্ধতি ১১৪
৪.৩. বিশ্লেষণ ও আলোচনা...১১৭
৪.৩.১. আন্তর্বয়ানের উপস্থিতি নির্ধারণে পাঠকের বোধগত প্রক্রিয়া ১১৭
৪.৩.২. আন্তর্বয়ানের অর্থ অনুধাবনে পাঠকের বোধগত কাঠামোর সক্রিয়তা ও বিবর্তন.........১১৮
৪.৩.৩. আন্তর্বয়ান ও মেটাফরের আচরণগত সাদৃশ্য ১২১
৪.৫. তথ্যসূত্র...১২৩

৫. নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে বিচ্যুতি ও সমান্তরতার কার্যকারিতা............................১২৫-১৫৫
৫.১. ভূমিকা..১২৬
৫.২. পদ্ধতি ১৩০
৫.৩. বিশ্লেষণ ও আলোচনা ১৩২
৫.৪. উপসংহার...১৫১
৫.৫. তথ্যসূত্র ১৫৩

৬. পাঠকের বোধে বিচ্যুতি ও সমান্তরতার প্রবেশ ও প্রভাব...১৫৬-১৬৭
৬.১. ভূমিকা..১৫৭
৬.২. পদ্ধতি...১৫৭
৬.৩. বিশ্লেষণ ও আলোচনা ১৫৮
৬.৩.১. বিচ্যুতি-সমান্তরতা থেকে প্রাপ্ত প্রমুখন অনুধাবনে পাঠকের বোধগত প্রক্রিয়া............১৫৮
৬.৩.২. পাঠকের জ্ঞানের ছকে বিচ্যুতি ও সমান্তরতার প্রভাব...১৫৯
৬.৩.৩. মেটাফরের বৈশিষ্ট্য-বাতিলকরণ তত্ত্ব, সমান্তরতা এবং চরিত্রায়ণে তার প্রভাব ১৬১
৬.৪. তথ্যসূত্র...১৬৭

৭. নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের আখ্যানকৌশল অনুসন্ধান....................................... ১৬৮-২০৭
৭.১. ভূমিকা..১৬৯
৭.২. পদ্ধতি ১৭০
৭.৩. বিশ্লেষণ ও আলোচনা...১৭১

৭.৩.১. বিষয়...১৭১
৭.৩.২. কাহিনি...১৭৪
৭.৩.৩. বাচনের প্রকৃতি ১৭৭
৭.৪. উপসংহার...২০৫
৭.৫. তথ্যসূত্র..২০৫

৮. আখ্যানের সম্ভাব্য বিশ্ব, বাস্তব বিশ্ব এবং পাঠকের বোধগত প্রক্রিয়া ও কাঠামো ২০৮-২৩১
৮.১. ভূমিকা...২০৯
৮.২. নবনীতা দেবসেনের উপন্যাসে নিহিত সম্ভাব্য বিশ্বের অবাস্তবায়নের সার্থকতা..................২১১
৮.৩. নবনীতা দেবসেনের আত্মজীবনীমূলক গল্পের বাস্তব বিশ্ব ও পাঠকের বোধ..................... ২১৭
৮.৪. 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের পৌরাণিকী পর্বের সম্ভাব্য বিশ্বের গুরুত্ব ও পাঠকের বোধ.... ২২১
৮.৫. উপসংহার..২২৯
৮.৬. তথ্যসূত্র ২৩০

৯. নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের অপরারপর বোধগত শৈলী অনুসন্ধান ২৩২-২৬৭
৯.১. ভূমিকা..২৩৩
৯.২. পদ্ধতি ২৩৩
৯.৩. বিশ্লেষণ ও আলোচনা ২৩৬
৯.৪. তথ্যসূত্র...২৬৪

১০. নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের শৈলীতে জীবনাদর্শের প্রতিফলন অনুসন্ধান...........২৬৮-২৯৮
১০.১. ভূমিকা...২৬৯
১০.২. নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনাদর্শ...২৭২
১০.৩. নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের শৈলীতে জীবনাদর্শের প্রতিফলন........................... ২৭৪
১০.৪. উপসংহার...২৯৫
১০.৫. তথ্যসূত্র...২৯৬

গবেষণালব্ধ ফল ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ গবেষণাকর্মের দিকনির্দেশ.......................................২৯৯-৩০৮

গ্রন্থপঞ্জি.. ৩০৯-৩১৫
পরিশিষ্ট ১ : নির্বাচিত পরিভাষা ৩১৬-৩২১
পরিশিষ্ট ২ : নবনীতা দেবসেনের সাহিত্যকর্মের তালিকা ৩২২-৩২৪

চিত্রসূচি

চিত্র ১: চিত্রকল্পের প্রকার ও তাদের আন্তঃসম্পর্ক ৭

চিত্র ২: ‘মেশোমশায়ের কন্যাদায়’ গল্পে কৌতুক চরিত্র নির্মাণে চিত্রকল্পের প্রকার ১২

চিত্র ৩: ‘সীতার পাতাল প্রবেশ’-এ মহাকাব্যিক চরিত্রের বিনির্মিত চিত্রকল্পের প্রকার ১৫

চিত্র ৪: ‘আমি অনুপম’ উপন্যাসে সময়ের চিত্রকল্পের প্রকার ১৭

চিত্র ৫: ‘মঁসিয়ো হুলোর হলিডে’ গল্পে পোষ্য প্রাণীর প্রকৃতি বর্ণনায় চিত্রকল্পের প্রকার.................... ২০

চিত্র ৬: আন্তর্বয়ন...৫৮

চিত্র ৭: বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট বিভিন্ন পাঠের সম্ভাব্য জাল (নেটওয়ার্ক)...৬০

চিত্র ৮: “ফিগারস্ অন্ লোন্” ১০১

চিত্র ৯: সম্মুখন ও পশ্চাদন..১১৫

চিত্র ১০: সাদা পৃষ্ঠা (পশ্চাদন) এবং কালো ছোপ (সম্মুখন) ১১৭

চিত্র ১১: প্রমুখনের দৃষ্টান্ত...১২৬

চিত্র ১২: বাচনিক পরিস্থিতি ১৪৭

চিত্র ১৩: গল্প পাঠকালে পাঠকের পুরুষবিহীন পরিবারের সাংসারিক পরিসর সংক্রান্ত বোধ ২২০

চিত্র ১৪: পাঠকের মনো-পরিসর..২২৩

চিত্র ১৫: পাঠকের মনো-পরিসর ২২৪

চিত্র ১৬: পাঠকের মনো-পরিসর ২২৫

চিত্র ১৭: পাঠকের মনো-পরিসর..২২৬

চিত্র ১৮: পাঠকের মনো-পরিসর ২২৭

চিত্র ১৯: ‘খেলা’ সংবর্গের মৌলিক প্রতিমাময়তা বা প্রতিনিধিত্বশীলতা..২৩৫

চিত্র ২০: বিপরিচিতিকরণের ফলে উদ্ভূত সম্মুখন-পশ্চাদন ধারণা ২৫২

চিত্র ২১: নিরীক্ষণ-পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্ত ভাবাদর্শ...২৮৪

সারণিসূচি

সারণি ১: প্যারডি সাহিত্যে আন্তর্বয়ন ৫৯

সারণি ২: বাক্যের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ৭০

সারণি ৩: "ভালোবাসা কারে কয়" গল্পে উদ্ধৃতি ও তার উৎস ৭৩-৭৪

সারণি ৪: "ভালোবাসা কারে কয়" গল্পে আবেশ ও তার উৎস ৭৭-৭৮

সারণি ৫: "মঁসিয়ো হুলোর হলিডে" গল্পে উদ্ধৃতি ও তার উৎস ৮১

সারণি ৬: "ডক্টর দেবসেনের বিদেশযাত্রা" গল্পে উদ্ধৃতি ও তার উৎস ৮৫

সারণি ৭: "জরা হট্‌কে জরা বঁচ্‌কে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান্‌!" গল্পে উদ্ধৃতি ও তার উৎস...... ৯৪

সারণি ৮: "বামুন-মুচি-রাজা" গল্পে আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান ও তার উৎস ৯৫

সারণি ৯: "বামুন-মুচি-রাজা" গল্পে উদ্ধৃতি ও তার উৎস ৯৬

সারণি ১০: পাঠকের জ্ঞান পুনর্গঠনে ব্যবহৃত পুরনো স্কিমার ছাঁচ ১২০

সারণি ১১: আন্তর্বয়ান ও মেটাফরের আচরণগত সাদৃশ্য ১২৩

সারণি ১২: রূপতাত্ত্বিক সমান্তরতা ১৪৩

ভূমিকা

প্রত্যেক লেখকের সৃষ্টির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে তাঁর চিন্তার ধারক ও বাহক। অপরদিকে, পাঠক সেইসব বৈশিষ্ট্যকে বোধগম্যতার দ্বারা স্পর্শ করতে করতে ক্রমশ এগিয়ে চলেন এবং লেখকের চিন্তার গ্রাহক হয়ে ওঠেন। লেখক তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে হাত বাড়িয়ে দেন। পাঠক পাঠের মাধ্যমে সেই বাড়িয়ে দেওয়া হাত স্পর্শ করেন। এমনি করে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হয় লেখক থেকে পাঠকের অভিমুখে। একটা সংযোগের সেতু তৈরি হয়, যার মাধ্যমে দেখা যায় অপরকে নিজের সাথে সংযুক্ত করে নেওয়ার প্রয়াস। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি ঠিক কীভাবে সম্পন্ন হয়, বর্তমান গবেষণায় তারই একটি তাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা হয়েছে।

গবেষণার লক্ষ্য

বর্তমান গবেষণার সুনির্দিষ্ট তিনটি লক্ষ্য হল – একজন সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মের শৈলীগত বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান, প্রাপ্ত শৈলীগত বৈশিষ্ট্যকে পাঠক কীভাবে বুঝতে পারেন, তার অনুসন্ধান এবং পাঠকের বোধের জগতে শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের প্রবেশ ও প্রভাব সম্পর্কিত একটি তাত্ত্বিক অনুসন্ধান।

লেখকভেদে শৈলীগত উপাদানের প্রয়োগবৈচিত্র্য প্রত্যাশিত ও অনিবার্য। কোনও একজন লেখকের সাহিত্যে প্রযুক্ত বিভিন্ন শৈলীগত উপাদানের প্রয়োগগত বৈশিষ্ট্য পাঠকের বোধে কীভাবে সাড়া জাগাতে পারে, বর্তমান গবেষণায় সেই বিষয়টি অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাই গবেষণাকার্যের প্রথম পর্যায়ে প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোনও লেখকের সাহিত্যের শৈলীগত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করা। তারপর দেখা প্রয়োজন যে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পাঠকের বোধে কীভাবে পৌঁছানো সম্ভব ও কী জাতীয় প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। এর মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত

আমরা বুঝতে চেষ্টা করব যে এই প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লেখকের কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয় কিনা। এই সম্পূর্ণ অন্বেষণ ও বিশ্লেষণের জন্য গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য হিসাবে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হয়েছে সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন (১৯৩৮-২০১৯)-এর লেখা নির্বাচিত উপন্যাস ও গল্প থেকে।

গবেষণা-প্রশ্ন

১) নবনীতা দেবসেনের নির্বাচিত গল্প ও উপন্যাসে কী কী প্রধান শৈলীগত বৈশিষ্ট্য (stylistic features) পাওয়া যায়? শৈলীগত বৈশিষ্ট্যগুলি বিভিন্ন গল্প এবং উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও আভ্যন্তরীণ বিবিধ প্রসঙ্গের নিরিখে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে?

২) গল্প ও উপন্যাস থেকে প্রাপ্ত শৈলীগত বৈশিষ্ট্যগুলি কি কোনও বিশেষ সামাজিক সমস্যা বা প্রশ্নকে (social issues) চিহ্নিত করে? ক্ষমতার সম্পর্ক (power relation) কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক (social relation) কীভাবে শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে প্রতিফলিত ও পুনর্নির্মিত হয়েছে?

৩) পাঠক তাঁর কী জাতীয় বোধগত প্রক্রিয়া (cognitive process)-র সাহায্যে প্রাপ্ত শৈলীগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করেন? প্রাপ্ত শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রকাশিত অর্থের আবেদনকে অনুধাবনের জন্য পাঠকের বোধগত কাঠামো (cognitive structure)-তে কীধরনের বিবর্তন সংঘটিত হয়? লেখিকা পাঠকের বোধের জগতে কীভাবে সাড়া ফেলতে চেয়েছেন?

৪) নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের শৈলীতে কি কোনও বিশেষ জীবনাদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়? সেই জীবনাদর্শ কি কোনও বিশেষ ideology দ্বারা নিয়ন্ত্রিত?

৫) বর্তমান গবেষণা শৈলীবিজ্ঞান তথা বোধগত শৈলীবিজ্ঞানের জগতে তাত্ত্বিক সম্প্রসারণ (theoretical extension)-এর কোনও অবকাশ তৈরি করতে পেরেছে কি?

গবেষণা পদ্ধতি

নবনীতা দেবসেনের গল্প ও উপন্যাসের অন্তর্গত শৈলীর বিবিধ বৈশিষ্ট্য শনাক্ত ক'রে সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গের নিরিখে তার তাৎপর্য নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে Critical Discourse Analysis বা CDA পদ্ধতি। পাঠক কীভাবে প্রাপ্ত ভাষিক বৈশিষ্ট্যগুলি মানসিকভাবে প্রক্রিয়া করেন এবং পাঠের অর্থ অনুধাবন করেন, তা অনুসন্ধান করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে Cognitive Stylistic Analysis পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে গবেষণার বিভিন্ন স্তরে যেসব তত্ত্বের সহায়তা নেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল সম্মুখন-পশ্চাদন (Figure-Ground), প্রতিনিধিত্বশীলতা (Prototypicality), ছক তত্ত্ব (Schema Theory), ধারণাগত রূপক তত্ত্ব (Conceptual Metaphor Theory), সম্ভাব্য বিশ্ব তত্ত্ব (Possible World Theory), মনো-পরিসর তত্ত্ব (Mental Space Theory)।

তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জির ক্ষেত্রে The Chicago Manual of Style ১৭-তম সংস্করণ (September, 2017)-এর নিয়ম অনুসৃত হয়েছে। সন্দর্ভে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি অনুসৃত হয়েছে এবং উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বানান মূল রচনার অনুবর্তী হয়েছে।

অধ্যায় পরিকল্পনা

সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ ক'রে আমরা আমাদের আলোচনা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। অধ্যায়গুলি ক্রমান্বয়ে নিম্নরূপ –

অধ্যায় ১ : নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার বৈচিত্র্য অনুসন্ধান

অধ্যায় ২ : পাঠকের বোধে চিত্রকল্পের প্রবেশ ও প্রভাব

অধ্যায় ৩ : নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে আন্তর্বয়নের প্রকৃতি নির্ধারণ

অধ্যায় ৪ : পাঠকের বোধে আন্তর্বয়ানের প্রবেশ ও প্রভাব

অধ্যায় ৫ : নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে বিচ্যুতি ও সমান্তরতার কার্যকারিতা

অধ্যায় ৬ : পাঠকের বোধে বিচ্যুতি ও সমান্তরতার প্রবেশ ও প্রভাব

অধ্যায় ৭ : নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের আখ্যানকৌশল অনুসন্ধান

অধ্যায় ৮ : আখ্যানের সম্ভাব্য বিশ্ব, বাস্তব বিশ্ব এবং পাঠকের বোধগত প্রক্রিয়া ও কাঠামো

অধ্যায় ৯ : নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের অপরারপর বোধগত শৈলী অনুসন্ধান

অধ্যায় ১০ : নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের শৈলীতে জীবনাদর্শের প্রতিফলন অনুসন্ধান

গবেষণালব্ধ ফল ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ গবেষণাকর্মের দিকনির্দেশ

প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম অধ্যায়ে নবনীতার লেখনীর যে চারটি দিক (চিত্রকল্প, আন্তর্বয়ন, বিচ্যুতি-সমান্তরতা এবং আখ্যানকৌশল) আলোচিত হয়েছে, আপাতভাবে সেই চারটি বিষয়কে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও, এগুলি আসলে নবনীতার কথাসাহিত্যে শৈলীর একেকটি প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। উক্ত চারটি অধ্যায়ে চারটি বিষয়ের বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বৈশিষ্ট্য অন্বেষণ ও বিশ্লেষণের জন্য গৃহীত পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে ওইসব অধ্যায়েই।

দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে উপরোক্ত চারটি শৈলীগত বৈশিষ্ট্য ঠিক কীভাবে পাঠকের বোধগত প্রক্রিয়া ও বোধগত কাঠামোয় অংশ নেয়। এক্ষেত্রে বোধগত শৈলীবিজ্ঞানের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে বোধগত শৈলীবিজ্ঞানকে অবলম্বন করেই নবনীতা দেবসেনের লিখনশৈলীর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ও পাঠকের সংশ্লিষ্ট বোধগম্যতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে নবনীতা দেবসেনের সাহিত্যের শৈলীতে কোনও এক বা একাধিক জীবনাদর্শের প্রকট অথবা প্রচ্ছন্ন প্রভাব পড়েছে কিনা, তার অনুসন্ধান করা হয়েছে।

সমস্ত বিশ্লেষণমূলক কার্যক্রমের শেষে পাওয়া যায় গবেষণালব্ধ ফল এবং সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ গবেষণাকর্মের কিছু দিকনির্দেশ, যা রয়েছে সন্দর্ভের একেবারে শেষ পর্যায়ে।

তবে গবেষণাভিত্তিক মূল অধ্যায়গুলি শুরু হওয়ার আগে শৈলীবিজ্ঞান ও বোধগত শৈলীবিজ্ঞানের চর্চার ইতিহাস সম্পর্কে এবং নবনীতা দেবসেনের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান 'ভূমিকা'-র ঠিক পরবর্তী অংশে। এছাড়া, সন্দর্ভের 'পরিশিষ্ট ১' এবং 'পরিশিষ্ট ২' অংশে রয়েছে যথাক্রমে নির্বাচিত পরিভাষা এবং নবনীতা দেবসেনের সাহিত্যকর্মের তালিকা।

গবেষণার পরিসর

বর্তমান গবেষণায় নবনীতা দেবসেনের বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প ও উপন্যাস বেছে নেওয়া হয়েছে। নবনীতার কথাসাহিত্য সব বয়সের পাঠকের কাছেই সমাদৃত। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে নগরের শিক্ষিত, প্রধানত উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত পরিসরে ব্যক্তিজীবনের চেহারা, বিশেষত নারীজীবনের গতিপ্রকৃতি ও উত্তরণের ছবি খুঁজে পান পাঠক। অন্যদিকে তাঁর বহুবিচিত্র গল্পের অধিকাংশতেই বিভিন্ন পরিস্থিতির সাপেক্ষে নিজেকে নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত মৃদু হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে তিনি যেন পাঠকের সামনে গল্পের আসর জমিয়ে তোলেন। তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে যেমন আছে সময়ের ছাপ, তেমনি উপন্যাস ও গল্প দুই ধরনের লেখাতেই রয়েছে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তার প্রকাশ। বলা বাহুল্য, এই সবকিছুকে ধারণ করে আছে গল্প ও উপন্যাসে ব্যবহৃত বিচিত্র ভাষাবৈশিষ্ট্য। কাহিনির বর্ণনায়, চরিত্রচিত্রণে, জীবনদর্শনের প্রয়োগে

কী ধরনের শৈলী ধরা দিয়েছে, তার ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করে একটি উপন্যাস বা গল্পের সার্থকতা। নির্বাচিত পাঠগুলি নিচে উল্লিখিত হল –

নির্বাচিত ১০টি উপন্যাস

'আমি অনুপম', 'স্বভূমি', 'বামা-বোধিনী', 'মায়া রয়ে গেল', 'শনি-রবি', 'অ্যালবাট্রস', 'দ্বিরাগমন', 'ঘূর্ণি', 'অভিজ্ঞান', 'ফিনিক্স'

নির্বাচিত ৩৫টি গল্প

'অভিজ্ঞানদুষ্মন্তম্', 'অমরত্বের ফাঁদে', 'অলৌকিক রত্নভস্ম ও নন্দকাকু', 'এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট', 'এলিজাবেথান সিস্টেম', 'চাষি বউয়ের মেয়ে', 'চাঁদ গড়ার কারিগর', 'জগমোহনবাবুর জগৎ', 'জরা হট্‌কে জরা বঁচ্‌কে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান্!', 'জীবে দয়া', 'টাওয়ার অব সাইলেন্স', 'ডক্টর দেবসেনের বিদেশযাত্রা', 'নাট্যারম্ভ', 'নিমন্ত্রণরক্ষা', 'পরীক্ষা', 'প্রজেক্ট চর্মচটিকা', 'পরভৃৎ', 'প্রাণবিন্দুবাবুর খরগোশ', 'প্রোপাইটার', 'বাপ রে বাপ!', 'বামুন-মুচি-রাজা', 'ভরতকথা', 'ভালোবাসা কারে কয়', 'মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর', 'মঁসিয়ো হুলোর হলিডে', 'মাতৃয়ার্কি', 'মুখর নৈঃশব্দ্য', 'মূল-রামায়ণ', 'মেশোমশায়ের কন্যাদায়', 'রাজকুমারী কামবল্লী', 'সীতার পাতাল প্রবেশ', 'সেদিন দুজনে', 'স্পটলেস স্পটেড ডিয়ার', 'হাওয়া-ই-হিন্দ', 'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ'

গবেষণার গুরুত্ব

বর্তমান গবেষণায় নবনীতা দেবসেনের গল্প-উপন্যাসে নিহিত প্রচলিত সমাজ মানসিকতা থেকে উত্তরণের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ইঙ্গিতকে উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে বিভিন্ন ভাষাবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তারপর দেখা হয়েছে পাঠক কীভাবে সেইসব বৈশিষ্ট্যকে নিজের বোধের আওতায় এনে উক্ত ইঙ্গিতটিকে ধরতে পারছেন। এই গবেষণাকর্ম যে তিনটি ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে, সেগুলি হল –

- **শৈলীবিজ্ঞানে গুরুত্ব**

নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের শৈলীগত উপকরণের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ শৈলীবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামোকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্ধিত করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। বিশেষত, আন্তর্বয়ানের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ তাত্ত্বিক কাঠামোর সম্ভাব্য পরিবর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

- **বোধগত শৈলীবিজ্ঞানে গুরুত্ব**

একজন নির্দিষ্ট লেখকের (বর্তমান গবেষণায় নবনীতা দেবসেনের) বহুবিধ শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের সমাহারে সৃষ্ট একাধিক সাহিত্যিক পাঠকে কীভাবে পাঠক নিজের বোধের আওতায় আনেন এবং পরিণামে লেখকের সামগ্রিক অভিপ্রায়কে ধরতে পারেন, তা বর্তমান গবেষণায় পাওয়া যাবে।

- **বাংলা সাহিত্যবিষয়ক গবেষণায় গুরুত্ব**

বাংলা সাহিত্য কেন্দ্রিক শৈলী চর্চার যে ধারা অব্যাহত, সেখানে বহু বিচিত্র গবেষণামূলক কাজ হলেও বোধগত ভাষাবিজ্ঞানের প্রভাবপুষ্ট বোধগত শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে পাঠকের বোধের বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধানের অভাব দেখা যায়। বর্তমান গবেষণায় সেই অভাব অন্তত কিছুটা পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণা যদি কিছুটা গঠনমূলক ভাবনা কিংবা খানিক গঠনমূলক বিতর্কের অবকাশ সৃষ্টি করতেও সমর্থ হয়, তবেই বর্তমান গবেষকের এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা কৃতার্থ হবে।

শৈলীবিজ্ঞান এবং বোধগত শৈলীবিজ্ঞান: উদ্ভব ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী

শৈলীবিজ্ঞানের তত্ত্ব গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বকে কেন্দ্র করে। যদিও প্রাচ্য রীতিবাদী ভাবনার সঙ্গে শৈলী সংক্রান্ত ভাবনার সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যিক বিশ্লেষণের প্রকৃতি তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি অনুপুঙ্খ। সেই সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য যে শৈলীবিজ্ঞানের চর্চা যখন থেকে শুরু হয়েছে, তখন একজন শৈলীবিজ্ঞানীর কাছে নিদর্শনের পরিমাণ হয়েছে অজস্র। কিন্তু ভারতীয় রীতিবাদী চিন্তাধারার উদ্ভব ও বিকাশ যে সময়পর্বে আবদ্ধ ছিল, সেই সময় আলঙ্কারিকদের সামনে নিদর্শন বলতে সংস্কৃত সাহিত্য। নিদর্শনের প্রাচুর্য না-থাকায় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সীমাবদ্ধতা ছিল। ভারতীয় রীতিবাদ এবং পাশ্চাত্য শৈলীবিজ্ঞানের প্রভেদ প্রসঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানী আর. এন. শ্রীবাস্তবের অভিমত –

> Indian poetics provides a background and a context for Indian stylistics but it is not the discipline of stylistics itself. [১]

'স্টাইলিস্টিক্' শব্দটি ১৮৬০ সাল থেকে ইংরেজি ভাষায় বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় রূপেই ব্যবহৃত হতে থাকে, যার অর্থ সাহিত্যশৈলীর বিজ্ঞান (the science of literary style)। মোটামুটি ১৮৮২ থেকে ইংরেজিতে 'স্টাইলিস্টিক্স' শব্দের প্রয়োগ শুরু হয়। তবে 'স্টাইল' শব্দটি ইউরোপীয় সাহিত্যতত্ত্বে প্রায় হাজার বছর ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। শব্দটির মূলে রয়েছে লাতিন শব্দ 'stilus'।

গ্রিকরা প্রথম শৈলী নিয়ে গবেষণাধর্মী চর্চা শুরু করেন। প্লেটো (৪২৭-৩৪৮ খ্রী. পূ.) এবং প্লেটোপন্থীদের মতে, শৈলী রচনার একটি বিশেষ গুণ। রচনাভেদে এই গুণ থাকতেও পারে

আবার না-ও থাকতে পারে। তাঁরা সবসময় কোনো একটি রচনার অন্তর্গত চিন্তা নিয়ে চর্চা করেছেন। তঁদের দৃষ্টিতে তাই শৈলীও হয়েছে চিন্তার সাথে জড়িত রচনার গঠনগত প্রকাশ। রচনার গঠনকে তাঁরা কখনো চিন্তা বা ভাবগত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি।

প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রী. পূ.) শৈলী বিষয়ে ছিলেন প্লেটোর বিপরীতপন্থী। তাঁর ঝোঁক ছিল কাব্যের গঠনগত দিকে অর্থাৎ কাব্যভাষার দিকে। অ্যারিস্টটল ও তাঁর অনুগামীদের মতে, সব রচনাতেই শৈলী থাকে। রচনার অন্তর্গত বিভিন্ন উপাদান বা বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে শৈলী গড়ে ওঠে। এইসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে রচনার লেখক, সময়, বিষয়, ভাষা, ভৌগোলিক স্থান, দর্শক এবং রচনার উদ্দেশ্য। সুতরাং যত রচনা তত শৈলী। শৈলী মোটেই রচনার ভাবগত বিষয় নয়। তা একান্তভাবেই যুক্তিনিষ্ঠ আঙ্গিকগত বিষয়।

গ্রিক আলঙ্কারিক তথা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যতাত্ত্বিকদের কাছে শৈলীর নির্দেশনামূলক (prescriptive) দিকটিই গুরুত্ব পেয়েছিল। তাঁদের মতানুসারে, চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লেখককে শৈলীর একটি সুসঙ্গত আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। যদিও অ্যারিস্টটল ছিলেন ব্যতিক্রমী। তিনি কবিকে পছন্দমতো শব্দপ্রয়োগ, প্রয়োজনে নতুন শব্দ নির্মাণ ও অলঙ্করণের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। কারণ রচনার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। এবিষয়ে সংশয়াতীতভাবে বলা যায়, আধুনিক শৈলীচিন্তার অনেক কাছাকাছি ছিল তাঁর শৈলীচিন্তার ধরন।

অষ্টাদশ শতকের ফরাসী চিন্তাবিদ বুফোঁ (George-Louis Leclerc, Comte de Buffon) (১৭০৭-৮৮) তাঁর ‘Discourse sur le style’ গ্রন্থে বলেন –

‘la style c’est l’home mệme’ (style is the man himself) [২]

একেই বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে ডেভিড ক্রিস্টাল (David Crystal) ও ডেরেক ডেভি (Derek Davy) তাঁদের 'Investigating English Style' গ্রন্থে বলবেন 'স্বকীয়তা' (individuality)। অর্থাৎ বুফোঁ রচনার শৈলী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে লেখকের ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। যদিও একই লেখকের কলমে মিশ্রশৈলীর সম্ভাবনার জটিলতার কোনো আভাস তাঁর মতবাদে পাওয়া যায় না।

অষ্টাদশ শতকের আরেক চিন্তাবিদ জোনাথন সুইফ্ট (Jonathan Swift) (১৬৬৭-১৭৪৫)-এর মতবাদ শৈলীবিজ্ঞানের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভাষায় –

> proper words in proper places, makes the true definition of a style [৩]

এই চিন্তাধারায় স্পষ্ট যে তিনি রচনার শৈলীর সঙ্গে সামাজিক উপলক্ষ্যকে জুড়তে চেয়েছেন। তবে বুফোঁর মতোই তিনিও মনে করেন যে শৈলী লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রকাশক। কারণ লেখকের নিজস্ব চিন্তার প্রতিফলন ঘটে তাঁর রচনার শব্দচয়নে।

উনিশ শতক পর্যন্ত সাহিত্যের ভাষাভিত্তিক যা কিছু সমালোচনা হয়েছে, সেই সবকিছুতেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে লেখককে, লেখকের চিন্তনকে। ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্বেষণ করা হয়েছে লেখকের ব্যক্তিত্বকে।

বিশ শতকে এসে ভাষাবিদদের অন্বেষণ বিশ্লেষণ লেখককেন্দ্রিক না-হয়ে অনেক বেশি সংশ্লিষ্ট রচনাকেন্দ্রিক হয়ে উঠল। লেখককেন্দ্রিক সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতিকে নাকচ করতে চাইলেন ব্রিটেনের দুই ভাষাতাত্ত্বিক আই. এ. রিচার্ডস (I. A. Richards) (১৮৯৩-১৯৭৯) এবং তাঁর শিষ্য উইলিয়াম এম্পসন (William Empson) (১৯০৬-১৯৮৩)। তাঁরা খুঁজতে চাইলেন একেকটি নির্দিষ্ট রচনার শৈলীগত বৈশিষ্ট্য কীভাবে পাঠকের মধ্যে সংবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত রিচার্ডসের 'Practical Criticism: A Study of Literary

Judgement' গ্রন্থটি এক্ষেত্রে স্মরণীয়। রিচার্ডস নির্দেশিত বিশ্লেষণের এই দৃষ্টিভঙ্গির নাম ব্যবহারিক সমালোচনাতত্ত্ব (practical criticism)। সমসাময়িক কালের এলিয়ট, লিভিস, ফরবিস্ প্রমুখ শৈলীবিজ্ঞানী ছিলেন এই ধারার অনুবর্তী।

ব্রিটেনের ব্যবহারিক সমালোচনা পদ্ধতির অনুরূপ পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেই পদ্ধতির নাম নব্য সমালোচনাতত্ত্ব (new criticism)। এই পদ্ধতি নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অন্যতম স্বনামধন্য ক্লিন্‌থ ব্রুক্‌স (Cleanth Brooks) (১৯০৬-৯৪) এবং রেনে ওয়েলেক (René Wellek) (১৯০৩-৯৫)।

ব্যবহারিক সমালোচনার মতোই নব্য সমালোচনাতেও নির্দিষ্ট রচনার নান্দনিক বৈশিষ্ট্য অন্বেষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ব্যবহারিক সমালোচনা পদ্ধতির সঙ্গে এই পদ্ধতির পার্থক্যের জায়গাটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যবহারিক সমালোচনা পদ্ধতি আরও এক ধাপ এগিয়ে। এই পদ্ধতিতে প্রাধান্য পেয়েছে কোনো নির্দিষ্ট রচনা পাঠের সময় পাঠকের মনস্তাত্ত্বিক স্তরে কী জাতীয় গড়াপেটা চলছে, তার অন্বেষণ। বলা বাহুল্য, বর্তমান শতকেও শৈলীবিজ্ঞানের জগতে এই দৃষ্টিভঙ্গির কদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। পাঠকের মনোজগতের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সন্ধান করতে করতে ক্রমশ এসেছে বোধগত শৈলীবিজ্ঞান, যার উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব।

শৈলীবিজ্ঞানের প্রগতিতে বিশ শতকের রুশ প্রকরণবাদ (formalism) এবং অবয়ববাদের (structuralism) অবদান নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য। আই. এ. রিচার্ডসের মতোই প্রাগ গোষ্ঠীর রোমান জ্যাকবসন (Roman Jakobson) (১৮৯৬-১৯৮২), জাঁ মুকারভস্কি (Jan Mukařovský) (১৮৯১-১৯৭৫)-র মতো বিশেষজ্ঞরাও রচনার লেখককে নয়, বরং গুরুত্ব দিয়েছেন রচনার গঠনশৈলীকে। তাঁরা রচনার ভাষিক গঠন কীভাবে পাঠকের মনোজগতে

প্রভাব বিস্তার করছে, তার অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন। আজকের শৈলীবিজ্ঞানে যে প্রমুখনের (foregrounding) তত্ত্ব খুবই সক্রিয়, প্রাগ গোষ্ঠীর হাতেই তার প্রাথমিক উদ্ভাবন। প্রমুখন সম্পূর্ণরূপে পাঠকের মানসিক ব্যাপার। কারণ রচনার অন্তর্গত কোনো অংশ যদি প্রচলিত ভাষিক নিয়ম বা ভাষিক ছাঁদ থেকে বিচ্যুত হয়, তবে তা আলাদা করে পাঠকের মনযোগ আকর্ষণ করে। এই বিচ্যুত অংশকে ধরতে পারার জন্য পাঠকের মনস্তাত্ত্বিক সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরও ব্যাপকভাবে শৈলী চর্চা শুরু হয়। বিভিন্ন অ্যাংলো-আমেরিকান আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হতে থাকে, যেগুলির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল শৈলী। এর ফলে একের পর এক প্রকাশ পেতে থাকে শৈলীবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ। এদের মধ্যে চারটি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য –

i. Fowler, Roger (ed.). *Essays on Style in Language*. London: Routledge and Kegan Paul. 1966.
ii. Freeman, Donald C. (ed.). *Linguistics and Literary Style*. New York: Holt, Rinehart & Winston. 1971.
iii. Leech, Geoffrey N. *A Linguistic Guide to English Poetry*. London: Longman. 1969.
iv. Sebeok, Thomas A. *Style in Language*. Cambridge, Mass.: MIT Press. 1960.

বিশ শতকেই শৈলীবিজ্ঞানের নানা শাখাপ্রশাখা উন্মোচিত হয়েছে। যেমন –

- রোমান জ্যাকবসনের উদ্ভাবিত formalist stylistics
- মাইকেল হ্যালিডের functionalist stylistics
- স্ট্যানলি ফিশ এবং মাইকেল টুলানের প্রবর্তিত affective stylistics
- এইচ. জি. উইডোসন, রোলান্ড কার্টার এবং পল সিম্পসনের ব্যাখ্যাত pedagogical stylistics
- মাইক শর্ট, মেরি লুইস প্র্যাট ও পিটার ভার্ডঙ্কের চর্চিত pragmatic stylistics

- রজার ফাওলার ও ডেভিড বার্চের critical stylistics
- বার্টন এবং সারা মিল্‌সের প্রবর্তিত feminist stylistics
- ডোনাল্ড ফ্রিম্যান, স্পার্বার, বার্টন প্রমুখের চর্চিত cognitive stylistics

একেবারে শেষেরটির উদ্ভাবন নিয়ে আমরা এবার বিশেষভাবে কথা বলব। কারণ এইটি আমাদের বর্তমান গবেষণায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে।

বোধগত শৈলীবিজ্ঞানের (cognitive stylistics) উদ্ভবের মূলে কেবলমাত্র শৈলীবিজ্ঞানের ভূমিকা নেই। একইসঙ্গে বোধগত ভাষাবিজ্ঞান (cognitive linguistics) তথা কগ্‌নিটিভ সায়েন্সের অবদান রয়েছে ভীষণভাবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই বোধগত শৈলীবিজ্ঞানের শিকড় খুঁজতে গেলে আমাদের কগ্‌নিটিভ সায়েন্স এবং কগ্‌নিটিভ লিঙ্গুইস্টিক্‌সের উদ্ভব ও প্রভাব সম্পর্কে কিছুটা জানা প্রয়োজন।

বিশ শতকের ছয়ের দশকে কগ্‌নিটিভ সায়েন্সের ধারণা আসে। তবে এর বহু আগে থেকেই দার্শনিক মহলে মানুষের মন ও তার চিন্তার প্রকৃতি নিয়ে নিরন্তর চর্চা হয়েছে। এই দিক থেকে দার্শনিকদেরকেই প্রথম কগ্‌নিটভ সায়েন্টিস্ট বলে মনে করা হয়। কীভাবে আমরা জ্ঞান লাভ করি এবং সেই লব্ধ জ্ঞানকে কীভাবে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি, এটাই হলো বোধের (cognition) গোড়ার কথা। বোধের এই গোড়ার বিষয়টি কিন্তু বহুকাল ধরেই চর্চিত হয়ে আসছে মানবমনের গতিপ্রকৃতি অন্বেষণকে কেন্দ্র করে। মানব মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে, কীভাবে মানুষ কোনো বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করে ইত্যাদি বিষয় প্রাচীন সময় থেকেই প্রাচ্য প্রতীচ্য নির্বিশেষে দার্শনিকদের ভাবিয়ে তুলেছিল। উপনিষদে আমরা পেয়েছি পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যার ধারণা। পরাবিদ্যা হলো পরম জ্ঞান। এটি ব্রহ্মজ্ঞান। অন্যদিকে অপরাবিদ্যা হলো যাবতীয় ইন্দ্রিয়বেদ্য পার্থিব জ্ঞান। একইভাবে জৈন_মতে বলা হয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানের কথা। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলো 'আত্মসাপেক্ষ' এবং পরোক্ষ জ্ঞান হলো 'ইন্দ্রিয়-মন সাপেক্ষ'।

সুতরাং ভারতীয় ঐতিহ্যে জ্ঞানের মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভাজন করা হয়েছে। এক প্রকার জ্ঞান আমরা আমাদের সচেতন মন ও ইন্দ্রিয় দ্বারা লাভ করি। অপরদিকে উচ্চ পর্যায়ের চিন্তনের দ্বারা আমরা দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানপ্রাপ্ত হই। আবার গ্রিক ঐতিহ্যে প্লেটোর দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তার বিষয়টি যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখন কেবল একটি কথা যোগ করা প্রয়োজন। মানুষের জ্ঞান সম্পর্কে তাঁর অভিমত ছিল নিম্নরূপ –

> As per Plato, purest form of knowledge was already implanted in every human. Task is to bring this innate knowledge to conscious awareness. [8]

প্লেটো আভ্যন্তরীণ জ্ঞানের কথা বলছেন। প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল জ্ঞান প্রসঙ্গে বলছেন, ইন্দ্রিয়ের সংবেদনশীলতার দ্বারাই আমরা তথ্য আহরণ করি এবং মনের মধ্যে তা বোধগম্য হয়। গ্রিক তত্ত্ব বহুদিনব্যাপী, প্রায় ইউরোপীয় রেনেসাঁস কালপর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতমহলে চর্চিত ও নানাভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে।

সপ্তদশ শতকে যুক্তিবাদী (rationalist) রেনে দেকার্ত (René Descartes) (১৫৯৬-১৬৫০) জানান, আমরা জ্ঞান লাভ করি যুক্তির (reason) ভিত্তিতে। শরীর এবং মন সম্পূর্ণ আলাদা। এই দুয়ের কোনো সম্বন্ধ নেই। এই তত্ত্বকে বলা হয় 'Cartesian Dualism'। এর বিপরীতে রয়েছেন অভিজ্ঞতাবাদী (empiricist) জন লোক (John Locke) (১৬৩২-১৭০৪), ডেভিড হিউম (David Hume) (১৭১১-৭৬), জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) (১৮০৬-৭৩)। এঁদের মতে, মনের মধ্যে জ্ঞান আহৃত হয় শরীরের ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। অর্থাৎ মন ও শরীরের সম্বন্ধ বিদ্যমান।

সুতরাং, মানবমন সংক্রান্ত কৌতূহল ও চর্চার ইতিহাস সুদীর্ঘকালের। গত শতকের ছয়ের দশকে যখন কগ্‌নিটিভ সায়েন্স এল, তখন বিজ্ঞানীরা যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষানিরীক্ষামূলক পদ্ধতির ওপর জোর দিলেন। কগ্‌নিটিভ সায়েন্সের উদ্ভবের প্রাককালে মনস্তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব সব

ক্ষেত্রেই ছিল আচরণবাদের (behaviourism) রমরমা। আমেরিকান স্নায়ুমনোবিদ কার্ল ল্যাশলি (Karl Lashley) (১৮৯০-১৯৫৮) এবং ভাষাবিদ নোয়াম চমস্কি (Noam Chomsky) (১৯২৮) – এই দুজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাঁরা সমকালে আচরণবাদের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার তত্ত্ব (stimulus-response) থেকে ভিন্ন দিশা দেখালেন। ল্যাশলি জানালেন, ভাষা ব্যবহারের পিছনে সবসময় উত্তেজক থাকে না। অনেকসময় ভাষা ব্যবহার হয় পরিকল্পিত। সেকারণেই ভাষা শিক্ষণীয় এবং ভাষা প্রয়োগে ভুল হলে তা সংশোধনযোগ্য। ভাষা ব্যবহারের পিছনে আসলে যেটা থাকে, তা হল একজন ভাষা ব্যবহারকারীর ভাষা ব্যবহারের ইচ্ছা (intention)। ভাষার অবস্থান ব্যক্তির মানসিক স্তরে – ল্যাশলি তাঁর এই মত প্রতিষ্ঠা করেন স্নায়বিক ক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্যাদির ভিত্তিতে। নোয়াম চমস্কি আনেন বৈশ্বিক ব্যাকরণের (Universal Grammar) ধারণা। তিনি জানালেন, দেশকাল নির্বিশেষে এই বৈশ্বিক ব্যাকরণ মানুষের জন্মগত ধারণা। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কগ্‌নিটিভ সায়েন্সের ধারণা প্রবর্তনের অব্যবহিত আগে এই দুই ভাষাতাত্ত্বিকের অবদান অবশ্য-স্মরণীয়। শুধু তাই নয়। এই সময়পর্বেই মানুষের মন সংক্রান্ত নানা গবেষণা চলতে থাকল এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (Artificial Intelligence বা AI) জন্ম হল। নিউরোসায়েন্সেও প্রগতিমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হল। এভাবে বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দেখা দিল বোধ সংক্রান্ত গবেষণার বিপ্লব (The Cognitive Revolution)। একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাচক্র চলতে থাকল। মানুষের মন কীভাবে কাজ করে, তা আবিষ্কারের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার লক্ষ্য নিয়ে এইসব আলোচনাচক্রে পৃথিবীর নানা প্রান্তের দার্শনিক, মনোবিদ, কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞ, নিউরোসায়েন্টিস্ট, ভাষাবিজ্ঞানী একত্র হলেন। আলোচনাচক্রগুলির মধ্যে উল্লেখের দাবি রাখে এমন কয়েকটি হল –

- Hixon Fund: Cerebral Mechanisms in Behavior (1948) California Institute of Technology
- Symposium on Information Theory: MIT (1956)
- 1946-1953: Macy conferences

এভাবেই বিভিন্ন শাখার পণ্ডিতদের পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ কর্মদক্ষতার পরিণামে ক্রমশ নতুন এক বিদ্যার জন্ম হল, যার নাম কগ্‌নিটিভ সায়েন্স। কগ্‌নিটিভ সায়েন্সের পরিধি তাই নিঃসন্দেহে আন্তর্বিদ্যার (interdisciplinary) পর্যায়ভুক্ত।

কগ্‌নিটিভ সায়েন্সের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল মানুষের বোধ (cognition)। কোনোকিছু জানা, ভাবা, বোঝা, শেখা, স্মরণ করা ইত্যাদিতে কী ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া চলে এবং সেইসব প্রক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াই-বা কী জাতীয় – এইসবই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উদ্ঘাটন করাই কগ্‌নিটিভ সায়েন্সের কাজ।

কগ্‌নিটিভ সায়েন্সের যুগান্তকারী চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে পড়ার কিছু কালের মধ্যেই আসে বোধগত ভাষাবিজ্ঞানের ধারণা।

> Cognitive linguistics is a modern school of linguistic thought that originally emerged in the early 1970s out of dissatisfaction with formal approaches to language. Cognitive linguistics is also firmly rooted in the emergence of modern cognitive science in the 1960s and 1970s, particularly in work relating to human categorisation, and in earlier traditions such as Gestalt psychology.[৫]

ভাষার বোধগত দিক নিয়ে চর্চা করতে থাকা ভাষাবিজ্ঞানীরা নিজেদেরকে ‘cognitive linguists’ বলে ঘোষণা করেন। ১৯৮৯-৯০ সাল নাগাদ প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল কগ্‌নিটিভ লিঙ্গুইস্টিক্স সোসাইটি। এই সময়কেই বোধগত ভাষাতাত্ত্বিক রোনাল্ড ল্যাঙ্গেকার (Ronald Langaker) তাঁর ‘Concept, Image, Symbol: The Cognitive Basis of Grammar’ গ্রন্থে বোধগত ভাষাবিজ্ঞানের আনুষ্ঠানিক সূচনার মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত করেন। বোধগত ভাষাবিজ্ঞান পৃথক কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেনি। বরং বলা যায়, ভাষাবিজ্ঞানের জগতে

এটি এক প্রকার অভিযান বা আন্দোলন, ল্যাঙ্গেকারের ভাষায় ‘movement’ বা ‘enterprise’।

বোধগত ভাষাবিজ্ঞানের চর্চার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে –

- ভাষায় প্রতীকের কার্যকারিতা
- চিন্তার সুনির্দিষ্ট গঠনপ্রকৃতি
- অঙ্গীভূত (embodied) অভিজ্ঞতা, বোধ ও পরিপার্শ্ব
- ভাষা, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বৈশ্বিক ও বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি
- ভাষা শিক্ষণে ব্যক্তির অনুধাবন ও ভাষা প্রয়োগ করতে পারার ক্ষেত্রে মানসিক ক্রিয়া
- বোধের ওপর প্রাসঙ্গিক ও সামাজিক প্রভাব
- বোধগত ব্যাকরণ

  বোধগত অর্থতত্ত্ব প্রভৃতি

বোধগত শৈলীবিজ্ঞান (cognitive stylistics), যার আরেক নাম বোধগত কাব্যতত্ত্ব (cognitive poetics), তা আসলে এতক্ষণের আলোচিত বোধ সংক্রান্ত চর্চার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের ফসল। একথার সমর্থনে বোধগত শৈলীবিজ্ঞানী জিরার্ড স্টীন (Gerard Steen) ও জোয়ানা গেভিন্স (Joanna Gavins)-এর মন্তব্য উল্লেখ করা যায় –

> cognitive poetics … suggests that readings may be explained with reference to general human principles of linguistic and cognitive processing, which ties the study of literature in with linguistics, psychology, and cognitive science in general.[৬]

১৯৭০-এর দশকে মনোভাষাবিদ রেউভেন সার (Reuven Tsur) তাঁর ‘Toward a Theory of Cognitive Poetics’ গ্রন্থে প্রথম ‘cognitive poetics’ কথাটি ব্যবহার করেন। যেকোনো সাহিত্যকর্ম পাঠকের কাছে কীভাবে অনুভববেদ্য হয়, তার সন্ধান করতে গিয়েই তিনি এই শব্দবন্ধের অবতারণা করেন। তারপর গত কয়েক দশক ধরে ক্রমশ সাহিত্য সমালোচনার এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তা বোধগত মনোবিদ্যা ও বোধগত ভাষাবিজ্ঞানকে

সংযুক্ত করে সাহিত্যের শৈলী বিশ্লেষণের পথ দেখিয়েছে। বোধমূলক নৃতত্ত্ব, বোধমূলক মনোবিদ্যা, বোধগত ভাষাবিজ্ঞান এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিত্যনূতন আবিষ্কার নতুন নতুন গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বকে যখন সামনে নিয়ে এল, তখন সেইসব তত্ত্ব সাহিত্যের গবেষকদের কাছেও সহজলভ্য হয়ে উঠল। তাঁরা পাঠকের মনে যেকোনো একটি সাহিত্যিক পাঠের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী হলেন। প্রথাগত শৈলী বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাথেই যুক্ত হল পাঠকের বোধের অনুসন্ধান পদ্ধতি। বোধগত শৈলীবিজ্ঞানী এলিনা সেমিনো (Elena Semino) এবং জোনাথন কাল্‌পেপার (Jonathan Culpeper) 'Cognitive Stylistics: Language and cognition in text analysis' গ্রন্থের ভূমিকায় বোধগত শৈলীবিজ্ঞানের চর্চার এলাকা এবং প্রথাগত শৈলীচর্চার সাথে তাঁর যোগসূত্রটি স্পষ্ট করেছেন –

> Cognitive stylistics combines the kind of explicit, rigorous and detailed linguistic analysis of literary texts that is typical of the stylistics tradition with a systematic and theoretically informed consideration of the cognitive structures and processes that underlie the production and reception of language.[৭]

পাশ্চাত্যে বিশেষত ইংল্যান্ডে বোধগত শৈলীবিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রতিপত্তি। কয়েকজন প্রভাবশালী বোধগত শৈলীবিজ্ঞানী এবং এই বিষয়ে তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থের নাম প্রকাশনা সংস্থা ও প্রকাশের সালসহ নিচে উল্লেখ করা হল –

- Peter Stockwell – 'Cognitive Poetics: An Introduction' (Routledge: 2002)
- Joanna Gavins – 'Cognitive Poetics in Practice' (Routledge: 2003)
- Elena Semino এবং Jonathan Culpeper – 'Cognitive Stylistics: Language and cognition in text analysis' (John Benjamins: 2002)
- Gerand Steen এবং Joanna Gavins – 'Understanding Metaphor in Literature' (Longman: 1994)

- Reuven Tsur – ‘Poetic Rhythm: Structure and Performance – An Empirical Study in Cognitive Poetics’ (Peter Lang: 1998) এবং ‘Toward a Theory of Cognitive Poetics’ (North Holland, Amsterdam: 1992)

এবার যদি বাংলা ভাষায় শৈলী চর্চার ঐতিহ্য নিয়ে কথা বলা হয়, তাহলে দেখা যাবে বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে প্রথম শৈলীভিত্তিক সার্থক গ্রন্থ হল ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত শিশিরকুমার দাশের ‘Early Bengali Prose: From Carey to Vidyasagar’। পরবর্তীকালে বাংলা ভাষার শৈলী সংক্রান্ত যেসব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির হল – নবেন্দু সেনের ‘গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর’, অপূর্বকুমার রায়ের ‘উনিশ শতকের বাংলা গদ্য সাহিত্য: ইংরেজি প্রভাব’, ‘বাংলা গদ্যচর্চা: বিদ্যাসাগর গোষ্ঠী’, ‘শৈলীবিজ্ঞান’, আশিসকুমার দে’র ‘উপন্যাসের শৈলী’, পবিত্র সরকারের ‘গদ্যরীতি পদ্যরীতি’, শুদ্ধসত্ত্ব বসুর ‘স্টাইলিস্টিক্স ও বাংলা কবিতা’, বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘কবির ভাষা: কবিতার ভাষা’, অশোককুমার মিশ্রের ‘কাব্যশৈলীমঞ্জরী’, বিপ্লব চক্রবর্তীর ‘লোকাভরণ: আধুনিক কবিতার শৈলী’, ‘শৈলীচিন্তাচর্চা’, অভিজিৎ মজুমদারের ‘শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব’ ইত্যাদি। এছাড়াও, যাঁরা শৈলী বিষয়ক নানা গবেষণাধর্মী কাজ ক’রে বাংলা শৈলীচর্চার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরেশচন্দ্র মজুমদার, সুভাষ ভট্টাচার্য, উদয়কুমার চক্রবর্তী, অমিতাভ দাস প্রমুখ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ।

বাংলা ভাষায় শৈলী চর্চার যে ধারা, সেখানে বহু বিচিত্র গবেষণামূলক কাজ হলেও বোধগত ভাষাবিজ্ঞানের প্রভাবপুষ্ট বোধগত শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি এখনও পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যভাবে কেউ গ্রহণ করেননি। এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবত প্রথম গৃহীত হয়েছে বর্তমান গবেষণার মধ্য দিয়ে। এই গবেষণা সন্দর্ভ যদি কিছুটা গঠনমূলক ভাবনা কিংবা কিছুটা

গঠনমূলক বিতর্কের অবকাশ সৃষ্টি করতেও সমর্থ হয়, তবেই বর্তমান গবেষকের এই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

তথ্যসূত্র

১। অভিজিৎ মজুমদার, *শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬), ৪২।

২। মজুমদার, *শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব*, ৩৭।

৩। মজুমদার, *শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব*, ৪৮।

৪। Bidisha Som, "Lec 1: Nature of Human Thought – I," *NPTEL IIT Guwahati*, video, 48:08, posted January 18, 2022, at 09:25, https://youtu.be/lfdXVlutp_E?si=Xzds6RUrj2Vj3SzT.

৫। V. Evans and M. Green, *Cognitive Linguistics: An Introduction* (Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2006), 3.

৬। Joanna Gavins and Gerard Steen, (eds.), *Cognitive Poetics in Practice* (London: Routledge, 2003), 2.

৭। Elena Semino and Jonathan Culpeper, eds., *Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis* (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002), ix.

নবনীতা দেবসেনের জীবন ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

"People feel they can trust me, they feel I will understand. They feel I am of some use to them when they need human warmth. My writing is obviously creating a bridge between these individuals and myself so that they feel I'm part of their lives and in a way they become a part of mine, too…it's a blessing… what more can I expect from life? Or from art?" [১]

কুড়ি ও একুশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে একটি বিশিষ্ট নাম নবনীতা দেবসেন। তিনি কেবল গল্পকার কিংবা ঔপন্যাসিকই নন, একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, ভ্রমণকাহিনি লেখক, রম্যরচনাকার, অনুবাদক, শিশুসাহিত্যিক, অধ্যাপক, গবেষক, শিক্ষাবিদ। দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্থান পার্কের 'ভালো-বাসা' বাড়িতে ১৯৩৮-এর ১৩ই জানুয়ারি নবনীতা দেবসেন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নরেন্দ্র দেব (১৮৮৮-১৯৭১) এবং মাতা রাধারাণী দেবী (১৯০৩-১৯৮৯) ছিলেন বাংলার বিশিষ্ট কবি দম্পতি। নবনীতার সাহিত্যপ্রতিভা তাই উত্তরাধিকারসূত্রেই প্রাপ্ত। সেইসঙ্গে ছিল তাঁদের বাড়িতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, শিশির ভাদুড়ির মতো সেইযুগের আরও অনেক বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকের নিত্য যাতায়াত। ফলে ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার কালপর্বে যে বিশেষ সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ তিনি পেয়েছিলেন, তা যেন পরবর্তীকালের 'সাহিত্যিক নবনীতা'-বৃক্ষের মূলে জলসেচন করেছিল।

নবনীতার স্কুলজীবনের পাঠ গোখেল মেমোরিয়াল গার্লসে। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ থেকে

১৯৫৮ সালে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর পাড়ি দেন বিদেশে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬১-তে তুলনামূলক সাহিত্যে পুনরায় ডিস্টিংশনসহ মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩-তে মাত্র ২৫ বছর বয়সে পিএইচ.ডি. সম্পূর্ণ করেন। এরপর পোস্টডক্টরাল গবেষণা শেষ করেন বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এছাড়া দশটি ভাষা ছিল তাঁর আয়ত্তে। বাংলা, ইংরেজি ছাড়াও সংস্কৃত, হিন্দি, অসমিয়া, ওড়িয়া, জার্মান, ফরাসি, গ্রিক এবং হিব্রু ভাষায় তাঁর দখল ছিল।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সঙ্গে ১৯৫৮ সালে নবনীতা প্রেমজ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু এই বন্ধন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৭৬ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। তাঁদের দুই মেয়ে – অন্তরা এবং নন্দনা।

নবনীতা দেবসেন জীবনে বিভিন্ন সময়ে তাঁর অসামান্য সাহিত্যপ্রতিভার জন্য বহু সংখ্যক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। নিচে সেগুলির কয়েকটি উল্লেখ করা হলো – গৌরীদেবী স্মৃতি পুরস্কার, মহাদেবী বর্মা পুরস্কার (১৯৯২), আমেরিকার রকফেলার (Rockefeller) ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সেলি (Celli) অ্যাওয়ার্ড (১৯৯৩), বিহারের ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত শরৎ পুরস্কার (১৯৯৪), প্রসাদ পুরস্কার, সাহিত্য অ্যাকাডেমি (১৯৯৯, ২০২৩), রবীন্দ্র পুরস্কার, কবির সম্মান, সংস্কৃতি অ্যাওয়ার্ড, কমল কুমারী ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড (২০০৪), মিস্টিক কলিঙ্গ লিটারেরি অ্যাওয়ার্ড (২০১৭), শিশুসাহিত্যের জন্য দ্য বিগ লিট্‌ল বুক অ্যাওয়ার্ড (২০১৭) এবং ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মশ্রী সম্মান (২০০০)।

নবনীতা দেবসেন ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপিকা। একসময় তিনি বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্বেও ছিলেন। তবে তাঁর কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগে অধ্যাপনাতেই সীমায়িত হয়নি। তিনি জীবনভর বহু গুরুত্বপূর্ণ

আলোচনাসভা, শিক্ষা সংগঠন, সাহিত্যমঞ্চ প্রভৃতির আসন অলংকৃত করেছেন – অভিভাষণ দিয়েছেন দেশের ও বিদেশের খ্যাতনামা বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। নিচে এসবের কিছু কিছু উল্লেখ করা হলো –

- আমন্ত্রিত অধ্যাপক ও আমন্ত্রিত লেখিকা হিসেবে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে রয়েছে আমেরিকার হার্ভার্ড, কর্নেল, কলম্বিয়া, শিকাগো, জার্মানির হামবোল্ট, কানাডার টরন্টো, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন, নিউ সাউথ ওয়েলস্ এবং মেক্সিকোর এল্ কলেজিও ডি মেক্সিকো। 'এপিক পোয়েট্রি' বিষয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাধাকৃষ্ণন স্মারক বক্তৃতা (১৯৯৬-৯৭) দিয়েছেন।
- বিভিন্ন জায়গার আন্তর্জাতিক শিল্পী সদনে লেখক (resident-writer) হিসাবে স্থান পেয়েছেন। ইউনাইটেড স্টেটসের ম্যাকডোয়েল কলোনি, ইয়াড্ডো, ইতালির বেলাজিও এবং ইজরায়েলের মিশকেনট শাহ্নানিম্ (Mishkenot Sha'ananim) এগুলির অন্যতম।
- দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দিল্লির সেন্টার অফ উইমেন্স ডেভেলপমেন্ট স্টাডিসে যথাক্রমে ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্টস্ কমিশন সিনিয়র ফেলো এবং জে. পি. নায়েক ডিস্টিঙ্গুইশড ফেলো হিসাবে যোগদান করেন।
- আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইজরায়েল, জাপানের মতো বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।
- সোশাল নেটওয়ার্ক ফর অ্যাসিস্টেন্স টু পিওপ্ল (SNAP)-এর সদস্যপদ গ্রহণ করেন।
- বিভিন্ন সময় যেসব সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহী সমিতির গুরুত্বপূর্ণ সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য – ইন্টারন্যাশানাল কম্প্যারেটিভ লিটারেচার অ্যাসোসিয়েশন, ইন্টারন্যাশানাল অ্যাসোসিয়েশন অফ সেমিওটিক অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল স্টাডিস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ (উপসভাপতি), ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কম্প্যারেটিভ লিটারেচার

অ্যাসোসিয়েশন (প্রতিষ্ঠাতা সচিব, পরে উপসভাপতি), গ্রেট ব্রিটেনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, সাহিত্য অ্যাকাডেমি (বাংলা ভাষার জন্য উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য), জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পরিষদ (বাংলা ভাষার জন্য উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য)।

শেষজীবনে দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ২০১৯ সালের ৭ই নভেম্বর একাশি বছর বয়সে নবনীতা দেবসেন তাঁর কলকাতার নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

নবনীতার দীর্ঘ জীবনপথে চলার নিত্যসঙ্গী ছিল রবীন্দ্রসাহিত্য। সুখ-দুঃখ ভরা জীবনে রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রকাব্য তাঁকে দিয়েছে চলার শক্তি, বাঁচার রসদ আর সৃষ্টির প্রণোদনা। জন্মলগ্ন থেকেই বলা যায় তিনি রবীন্দ্রছায়াবৃতা। কারণ তাঁর যখন মাত্র তিন দিন বয়স, তখন রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একটি চিঠি লিখে 'নবনীতা' নামটি আশীর্বাদী পাঠিয়েছিলেন। নবনীতার নিজের কথায়, "এই নাম আমার না চাহিতে পাওয়া ধন"[২]। যে-বাড়িতে তিনি বড়ো হয়েছেন, সেখানে একটাই ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। জীবনের প্রথম বেলায় মায়ের মুখের ঘুমপাড়ানি গানে রবীন্দ্রসংগীত শোনা থেকে আরম্ভ ক'রে আত্মীয়মহলে, ঘরোয়া অনুষ্ঠানে, সাহিত্যসভায়, কলেজের বন্ধুসমাবেশে, প্রেমের ভাঙনে, নতুন প্রেমের আহ্লাদে, সম্পর্কের গাঢ়তায়, সম্পর্কের বিচ্ছেদে, দুঃসময়ে, একাকিত্বে রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র গান তাঁর জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ছিল। রবীন্দ্রসংগীতের নিত্যস্পর্শে তাঁর অন্তর্জগৎ যে কতখানি ঋদ্ধ হয়েছে, তা আমরা বুঝতে পারি, যখন তিনি "আমার রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক ব্যক্তিগত নিবন্ধে বলেন –

> এমন একটা সময় ছিল, আমি যখন বিদেশ-বিভুঁইয়ে একটু শান্তভাবেই পাগল হয়ে যাচ্ছি। ... এমনি সময়ে আমার দুই বন্ধু অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় আর ডক্টর অমিয় দেব দুজনে মিলে এসে তারাপদর নিজের মিউজিক সিস্টেমটা আর একরাশ গানের টেপ আমার ঘরের মাঝখানে বসিয়ে রেখে দিয়ে গেলেন। ... সারাদিন সারারাত আমি গান শুনি। একটানা, নিশ্ছিদ্র। যতক্ষণ বাড়িতে থাকি গানের আড়ালে লুকিয়ে থাকি। আরাম হয়। চেনা শব্দ, চেনা সুর, ক্রমশ 'অনাত্মীয়' আলোবাতাসে বদল আনল।

> আজন্মের পরিচিত গানগুলি আমার চারিদিকে একটা শক্তপোক্ত আপন-করা বেড়া বুনে দিতে লাগল, সুরক্ষা-বলয়। শব্দ আর সুরের জাদুতে আমি যেন একটি রেশমি গুটিপোকা হয়ে গেলুম। গুটির মধ্যে আমি আর নগ্ন নই, একা নই, আমার হাতটি শক্ত করে ধরে আছেন রবীন্দ্রনাথ। আস্তে আস্তে আমার মাথা ঠান্ডা হতে থাকল।[৩]

এছাড়া নবনীতার পিএইচ.ডি.-র গবেষণার বিষয়ও রবীন্দ্রনাথকে ঘিরেই। পাশ্চাত্যে কবির জনপ্রিয়তা অস্তমিত হয়ে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান করেছেন তিনি। সুতরাং, রবীন্দ্রনাথ যাঁর অন্তরে শোনিতধারার ন্যায় নিত্যবহমান, তাঁর কলমেও যে অনিবার্যভাবে এই অনুভূতি সঞ্চারিত হবে, সে তো বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান গবেষণায় আমরা তার বহুসংখ্যক নিদর্শনের হদিশ পাব।

"ভালোমন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে"[৪] – রবীন্দ্রনাথের এই বাণীকে নবনীতা তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র করেছিলেন। সবসময় সদর্থক মনোভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। জীবনের নেতিবাচক দিক থেকে চোখ সরিয়ে অস্তিবাচক দিককে বেছে নিতেই ভালোবাসতেন। তাঁর প্রতিটি গল্প উপন্যাসেও এই সদর্থক মনোভঙ্গির প্রতিফলন দেখা যায়।

বিদেশে ছাত্রাবস্থায় নবনীতা সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন আমেরিকায় নারীমুক্তি আন্দোলন, ফ্রি স্পিচ আন্দোলনের ঢেউ। ফ্রি স্পিচ মুভমেন্টে তিনি নিজে যোগদান করেছিলেন। বেটি ফ্রিডানের 'দ্য ফেমিনিন মিস্টিক', জার্মেন গ্রিয়ারের লেখা 'ফিমেল ইউনাখ' কিংবা মজ ম্যাগাজিনের গ্লোরিয়া স্টাইনেমের হাত ধরে পশ্চিমে যে নারীমুক্তি আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল, তা তাঁকে নিঃসন্দেহে ভিতর থেকে নাড়া দিয়েছিল। গ্লোরিয়া স্টাইনেম ও ফ্লোরেন্স হাও-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় যেমন হয়েছিল, তেমনি টিলি ওলসেনের সঙ্গে একই রাইটার্স কলোনিতে থাকার সুযোগও তাঁর কম প্রাপ্তি নয়। তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিগত প্রভেদের কারণে উভয় পরিবেশে নারীজীবনের সমস্যা ও বঞ্চনারও রকমভেদ আছে। তাঁর নিজের কথায়,

আমাদের উচিত কী জানো? একটা জোরালো ভারতীয় নারীবাদের তত্ত্ব তৈরি করা। দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের জীবনে মেয়েদের সমস্যাগুলো পশ্চিমের চেয়ে অনেকটাই আলাদা।[৫]

তাঁর এই জাতীয় চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাসে গল্পে আর অবশ্যই বিভিন্ন প্রবন্ধে। তাঁর প্রায় সমস্ত গল্প-উপন্যাসের কেন্দ্রে থাকে মেয়েরা। নারীর সমস্যাসঙ্কুল জীবন, আপনশক্তির জোরে সেই সমস্যার পাশ থেকে নিজেকে উদ্ধার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বিচিত্র কাহিনি তিনি তাঁর পাঠককুলকে উপহার দিয়েছেন। শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লেখা গল্পেই নয়, তাঁর সৃষ্ট রূপকথাগুলিও নায়িকাপ্রধান। হৃদয় ও বুদ্ধির জোরেই তাঁর সাহিত্যের মেয়েরা জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছে।

তবে নবনীতার নারীবাদী চিন্তাশৈলী কেবল পাশ্চাত্যের নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রভাবপুষ্ট বললে ভুল হবে। তাঁর এই জাতীয় চিন্তাধারার প্রাথমিক রসদ সম্ভবত তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের জীবন ও সাহিত্যচর্চা থেকে। তাঁর মা রাধারাণী দেবীর মাত্র ১৩ বছর বয়সে এলাহাবাদে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সাথে বিয়ে হয়। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে এশিয়াটিক ফ্লুতে সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। এরপর শাশুড়ির উৎসাহে রাধারাণী দেবী বিদ্যাচর্চা শুরু করেন, যা সেই যুগের পক্ষে নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ঘটনা। অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে এবং স্বনামে তাঁর বিভিন্ন কবিতা প্রকাশিত হয়। সেসব কবিতার তীক্ষ্ণতা সেযুগের পাঠককে শুধু বিস্মিতই করেনি, অনেকেই ভেবেছিলেন কোনো পুরুষ কবি নারীর ছদ্মনামে লিখছেন। রাধারাণী দেবীর বলিষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টির মতোই তাঁর জীবনের আঙিনাতেও সাহসী পদক্ষেপ দেখা যায় যখন তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে কবি নরেন্দ্র দেবকে বিয়ে করতে মনস্থির করেন। ১৯৩১ সালে নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় একজন বিধবা নারীর দ্বিতীয় বিবাহ সমাজে যেমন বিস্ময়কর, তেমনি তার থেকেও বেশি অভাবনীয় হয় যখন খবরের কাগজে শিরোনাম বেরোয় – ‘রাধারাণী-নরেন্দ্র দেব বিবাহ : কন্যার আত্মসম্প্রদান’। এছাড়া বিশ

শতকের দ্বিতীয় দশকে কংগ্রেসের অধিবেশনের বিতর্কসভায় 'ডিভোর্স উচিত কিনা' বিষয়ে অনুরূপা দেবীর বিপক্ষ বক্তব্যকে খণ্ডন করে রাধারাণী দেবী নিজের জোরাল বক্তব্য সর্বসমক্ষে পেশ করেন। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে নবনীতার সমকালের থেকে অনেকখানি এগিয়ে থাকা নারীপ্রগতিমূলক সাহিত্যচিন্তাশৈলীর গোড়াপত্তন ঠিক কোথায় হয়েছিল। তবে সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে,

> স্বাধীনতাপ্রিয় নবনীতার আপসহীন যাপনে অবশ্য স্বেচ্ছাচারের বিকার ছিল না। আত্মসংযমী প্রকৃতির উদারতায় তাঁর নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনন্যতা লক্ষণীয়। সে শিক্ষাও তাঁর মায়ের কাছেই পেয়েছিলেন।[৬]

নারীবাদ শুধুমাত্র নবনীতার কলমের ডগাতেই থেমে থাকেনি। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি 'সই' নামক একটি মেয়েদের সাহিত্য আন্দোলনের পথপ্রদর্শক। ১৯৯৯ সালের ৩০শে নভেম্বর, মা রাধারাণী দেবীর জন্মদিনে তিনি তৈরি করেন পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র লেখিকাগোষ্ঠী 'সই', যা কেবলমাত্র মেয়েদের সাহিত্যচর্চার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম। তৈরি হয় 'সই-সাবুদ' পত্রিকা, 'সই-প্রকাশনী'। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মেয়েদের পাবলিশিং হাউসগুলোকে ডেকে জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করেন। পূর্ব ভারতের বিভিন্ন লেখিকাদেরকে নিয়ে কবিতাপাঠ, সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা, ওয়ার্কশপ করানো, বইমেলা – এইসমস্ত আয়োজনের মধ্য দিয়ে নবনীতা ভারতীয় মেয়েদের কলমে সৃষ্ট সাহিত্যশিল্পকে সব স্তরের পাঠকের ধরাছোঁয়ার মধ্যে এনে দিয়েছিলেন। এর ফলে মেয়েদের লেখালেখি নিয়ে পাঠক আগের থেকে অনেক বেশি আগ্রহী হয়েছেন। অথচ মেয়েদের লেখাকে পুরুষের লেখার সমপরিমাণ গুরুত্ব প্রদানের আগ্রহ আগে কেবলমাত্র হাতে গোনা কয়েকজন স্বনামধন্যা লেখিকার জন্যই তোলা থাকত। 'সই' সাহিত্য সংস্থা মেয়েদের লেখাকে আরও বেশি করে মূলধারার সাহিত্যের অঙ্গীভূত করে দিয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে 'সই'-এর বইমেলা মহিলা সাহিত্যিকদের লেখা নতুন নতুন বই ও সম্পাদিত সংকলন নিয়ে হাজির হয়েছে পাঠকের দরবারে। এছাড়া ২০১৩ সাল থেকে 'সই'

সভামুখ্য নবনীতার উদ্যোগেই ভারতীয় মহিলা লেখকদের জন্য সংবর্ধনাজ্ঞাপক ‘সই-সম্মান’ প্রদানের প্রচলন শুরু হয়। ওই বছর এই সম্মান পেয়েছিলেন বিশিষ্ট ভারতীয় লেখিকা শশী দেশপান্ডে ও ঊর্মিলা পাওয়ার। প্রতিভা বসু কিংবা মহাশ্বেতা দেবীর মতো অগ্রজ লেখিকাকেও ‘সই-সম্মান’ জানানো হয়েছে।

কোনোভাবেই পুরুষবিদ্বেষ নয়, সাহিত্যিক নবনীতার চেষ্টা ছিল কেবল মেয়েদের স্থানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে আসা। পুরুষের তৈরি একটা ভ্রান্তিপূর্ণ সিস্টেমের বিরোধিতা ক’রে নারীর ক্ষমতা, নারীর প্রতি সম্মান তথা নারীবাদী ভাবনাকে তিনি সমাজের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন।

নবনীতা দেবসেনের সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস

১] আমি, অনুপম [১৯৭৮], ২] প্রবাসে দৈবের বশে [১৯৮৫], ৩) অন্য দ্বীপ [১৯৮৬] ৪) স্বভূমি [১৯৮৬] ৫) শীত সাহসিক হেমন্তলোক [১৯৮৮] ৬) একটা দুপুর [১৯৯৬] ৭) বামা-বোধিনী [১৯৯৭] ৮) দেশান্তর [১৯৯৮] ৯) ঠিকানা [১৯৯৯] ১০) মায়া রয়ে গেল [২০০০] ১১) শনি-রবি [২০০১] ১২) পাড়ি [২০০২] ১৩) উড়াল [২০০৩] ১৪) তিতলি [২০০৪] ১৫) অ্যালবাট্রস [২০০৪] ১৬) একটি ইতিবাচক প্রেমকাহিনী [২০০৫] ১৭) দ্বিরাগমন [২০০৬] ১৮) রামধন মিত্তির লেন [২০০৬] ১৯) ইহজন্ম [২০০৭] ২০) ঘূর্ণি [২০০৮] ২১) অভিজ্ঞান [২০০৯] ২২) ফিনিক্স [২০১১] ২৩) হৃদকমল [২০১৫]

গল্পগ্রন্থ

১) মঁসিয়ো হুলোর হলিডে [১৯৮০] ২) গল্পগুজব [১৯৮২] ৩) ভালোবাসা কারে কয় [১৯৯২] ৪) নাট্যারম্ভ [১৯৯২] ৫) বসনমামা এবং অন্যান্য [১৯৯৪] ৬) সীতা থেকে শুরু [১৯৯৪] ৭) খগেনবাবুর পৃথিবী [১৯৯৭] ৮) জরা হট্‌কে এবং অন্যান্য [২০০০] ৯) সপ্তকাণ্ড [২০০১] ১০) রাগ-অনুরাগ ও অন্যান্য গল্প [২০০৩]

কবিতা

১) প্রথম প্রত্যয় [১৯৫৯] ২) স্বাগত দেবদূত [১৯৭১] ৩) তুমি মনস্থির করো [২০০৯]

নাটক

১) মেদেয়া এবং তিনটি একাঙ্ক নাটক [১৯৯৪] ২) অভিজ্ঞান্ দুষ্মন্তম্ [২০১০]

ভ্রমণকাহিনি

১) করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে [১৯৭৮] ২) ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে [১৯৮৩] ৩) হে পূর্ণ তব চরণের কাছে [১৯৮৪] ৪) তিন ভুবনের পারে [১৯৯০] ৫) উত্তমাশা অন্তরীপ [২০০৯] ৬) যাবই যাব পেরু [২০১৫]

আত্মজনকথা

১) স্বজনসকাশে [২০১৫]

রম্যরচনা

১) নটী নবনীতা [১৯৮৪] ২) শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর [১৯৯৫] ৩) বারান্দা [২০০০] ৪) ঘুলঘুলি [২০০০] ৫) নবনীতার নোটবই [২০১১] ৬) ভালো-বাসার বারান্দা – ১ম খণ্ড [২০১০], ২য় [২০১৫], ৩য় [২০১৬], ৪র্থ [২০১৯], ৫ম [২০১৯]

কিশোরসাহিত্য

১) সমুদ্রের সন্ন্যাসিনী [১৯৭৯] ২) স্বপ্ন কেনার সদাগর [১৯৯৪] ৩) কায়াক [১৯৯৬] ৪) পলাশপুরের পিকনিক [১৯৯৭] ৫) ইচ্ছামতী [১৯৯৯] ৬) বুদ্ধিবেচার সওদাগর [১৯৯৯] ৭) চাকুম-চুকুম [২০০০] ৮) সাত কন্যের দেশ [২০০০] ৯) মনকেমনের গল্প [২০০২] ১০) রুক্মিণীর রাজ্যপাট এবং অন্যান্য [২০০৫] ১১) ছোট্ট বুবুল আর পরীরা [২০০৮] ১২) তিন্নি আর মাসির গপ্পোগাছা [২০০৮] ১৩) মৌয়ের বন্ধুরা [২০০৮] ১৪) মায়া অরণ্যে মণি-মানিক [২০১০]

প্রবন্ধ

১) ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য প্রবন্ধ [১৯৭৭] ২) বীরশৈব সন্তকবি ও বীরশৈব সাধনা [১৯৮৭] ৩) চন্দ্রমল্লিকা ও প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ [২০১৫]

অনুবাদ

১) অষ্টমী [আট এশীয় নারীর কবিতা] [২০০৬] ২) উপমহাদেশের গল্প [২০১৩] ৩) শতেক বচন [কন্নড় বীরশৈব কবিতা] [২০১৫] ৪) হলদে ওয়ালপেপার এবং অন্যান্য [শার্লট পারকিনস গিলম্যানের গল্প] [২০১৫]

এছাড়াও আছে তাঁর 'নারী তুমি অর্ধেক আকাশ', 'অপরাজিতা রচনাবলী', 'সই বারোয়ারী গদ্য-পদ্য'-র মতো আরও অনেক সম্পাদিত গ্রন্থ, আছে 'নব-নীতা', 'এক ডজন রূপকথা', 'স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প', 'গল্পসমগ্র', 'ভ্রমণসমগ্র', 'নবনীতা দেব সেন রচনাবলি' ইত্যাদির মতো অনেকানেক সংকলন, অমনিবাস, সংগ্রহ, সমগ্র ও রচনাবলি জাতীয় গ্রন্থ।

তথ্যসূত্র

১। Nabaneeta Dev Sen, "MEET THE WRITER: 'I wanted to write about sexuality, deception, loss, but I could not': Writer Nabaneeta Dev Sen", Interview by Ritu Menon, *Scroll.in*, accessed December 8, 2022, https://scroll.in/article/943817/i-wanted-to-write-about-sexuality-deception-loss-but-i-could-not-writer-nabaneeta-dev-sen.

২। নবনীতা দেবসেন, "জীবনে অনেক পেয়েছি", সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সুদেষ্ণা বসু, *নানারঙের নবনীতা* (কলকাতা: পত্রভারতী, জানুয়ারি ২০২০), ৩৯২।

৩। নবনীতা দেবসেন, "আমার রবীন্দ্রনাথ," *অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ ১: নবনীতা দেবসেন,* সম্পা. রাজীব সিংহ (কলকাতা: প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০২৪), ১০৭–১০৮।

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বোঝাপড়া," *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্থ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ), ১৮৩।

৫। দেবসেন, সাক্ষাৎকার, ৩৯৪।

৬। স্বপনকুমার মণ্ডল, "নবনীতা দেবসেন: নারী ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বিস্তার," *আনন্দবাজার অনলাইন,* শেষবার দেখার তারিখ: ১৬.০৯.২০২২, https://www.anandabazar.com/amp/editorial/nabaneeta-dev-sen-shown-the-versatility-of-her-personality-1.1095168.

প্রথম অধ্যায়

নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার বৈচিত্র্য অনুসন্ধান

১. নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার বৈচিত্র্য অনুসন্ধান

১.১. ভূমিকা

> An ‘Image’ is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time.[১]

চিত্রকল্প হল আমাদের উপলব্ধির মাধ্যম। শিল্পের শৈল্পিক মূল্যকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে চিত্রকল্পের ব্যবহার। চিত্রকল্পের ব্যবহার পাঠকের কাছে সাহিত্যশিল্পের আবেদনকে আরও বেশি স্পষ্ট এবং সুগভীর ক’রে তোলে।

প্রত্যেকটি চিত্রকল্পই কোনো-না-কোনোভাবে ইন্দ্রিয়বেদ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা দৃশ্যগ্রাহ্য। এমনকি চিত্রকল্প যেখানে সরাসরি ইন্দ্রিয়সম্পৃক্ত নয়, সেখানেও ভিতরে ভিতরে দৃশ্যের অনুভূতিই কাজ করে। উপমা-অলংকার-বিশেষণের মাধ্যমে যেমন একটি চিত্রকল্প গড়ে তোলা যায়, তেমনি একটি নিরলংকৃত বর্ণনাও দক্ষ লেখনীর গুণে চিত্রকল্প হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। তবে এই চিত্রকল্প প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যধর্মী হোক কিংবা পরোক্ষভাবেই হোক, তা নির্মাণের ক্ষেত্রে স্মৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। সংবেদন সৃষ্টিকারী নতুন কোনো বিষয়কে অনুভব করতে সাহায্য করে সমজাতীয় কোনো ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্মৃতি। আর এই স্মৃতির সূত্রকে অবলম্বন করেই নির্মিত হয় নতুন-নতুন চিত্রকল্প। বস্তুত, এমন কোনো মানসিক প্রক্রিয়া নেই, যেখানে স্মৃতির কোনো ভূমিকা নেই।[২] কাজেই চিত্রকল্প নির্মিতিও তার ব্যতিক্রম নয়। চিত্রকল্প নির্মিতি কিংবা চিত্রকল্পকে অনুভবের ক্ষেত্রে স্মৃতি কীভাবে সক্রিয় হয়, তা সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

চিত্রকল্প আসলে শব্দ দ্বারা নির্মিত ছবি।[৩] তবে এখানে একটি কথা স্মরণীয় - চিত্রকল্প মাত্রই এক প্রকার ছবি তৈরি করে ঠিকই, কিন্তু সব চিত্রকল্প ছবি হলেও সব ছবি চিত্রকল্প নয়।

যেসব ছবি চিত্রকল্প, সেখানে চিত্রের গুণ অপেক্ষাও যে বৈশিষ্ট্যটি প্রকট হয়, তাকে আই. এ. রিচার্ডসের (I. A. Richards) ভাষায় বলা যায় –

> What gives an image efficacy is less its vividness as an image than its character as a mental event peculiarly connected with sensation.[৪]

সাহিত্যের অন্তর্গত চিত্র, প্রতীক এবং ধারণাগত রূপকের সঙ্গে চিত্রকল্পের যোগাযোগ কতখানি, সে-সম্পর্কিত আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র: প্রসঙ্গ উপযোগী শব্দের পর শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে যখন কোনো বর্ণনা দেওয়া হয়, তখন পাঠকের মনে একটি ছবি দৃশ্যমান হয়। এই জাতীয় চিত্র কষ্টকল্পিত নয়। কেবল ওই বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থ অনুসরণ করলেই মনের মধ্যে ছবি আপনি ফুটে ওঠে। একেই সাধারণত বর্ণনাধর্মী চিত্রকল্প বলা হয়। যেমন – জীবনানন্দের 'বিড়াল' কবিতায়[৫] আসলে একটি বর্ণনার দ্বারা বিড়ালটির কার্যকলাপের সামগ্রিক চিত্র ধরা দেয়।

প্রতীক: প্রতীক হল সাহিত্যের (এমনকি অন্যান্য ক্ষেত্রেও) এমন এক উপকরণ, যার আক্ষরিক অর্থের গভীরে ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা থাকে।

> … the term "symbol" is applied only to a word or phrase that signifies an object or event which in its turn signifies something, or suggests a range of reference, beyond itself.[৬]

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে দুই ব্যক্তি পরস্পরকে দেখে যখন হাত জোড় করেন, তখন এই হাত জোড় করা হল পারস্পরিক সৌজন্য প্রদর্শনের প্রতীক। চিত্রকল্প সম্পর্কে আলোচনাকালে লুইস (C. Day Lewis) চিত্রকল্পকে প্রতীকের বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলছেন। তাঁর ভাষায়,

> An intense image is the opposite of a symbol. A symbol is denotative; it stands for one thing only, as the figure I represents one unit. Images in poetry are seldom purely

symbolic, for they are affected by the emotional vibrations of their context so that each reader's response to them is apt to be modified by his personal experience. [৭]

তবে প্রতীকের কার্যকারিতা সম্পর্কে কবি শঙ্খ ঘোষের অভিমত –

আমাদের একটা মুশকিল ছিল এই যে প্রতীক আমাদের বলে দিত : এটা নয়, ওটা। ...কিন্তু আজ প্রতীক আসতে পারে কেবল এই ভাবে : এটা এবং ওটা। বর্ণনীয় বিষয় বা ছবি বা চরিত্রের একটি কণাও ছাড়তে চাই না আমি। তাকে সম্পূর্ণ স্বভাবে রেখেও যদি বিষয়ান্তর বা চিত্রান্তরের দ্যুতি দিতে পারে প্রতীক, সেটা তবে গ্রাহ্য হবে নিশ্চয়। [৮]

চিত্রকল্প এবং প্রতীক নিশ্চয়ই দুটো আলাদা প্রযুক্তি। কিন্তু বর্তমান অধ্যায়ে আমরা যথাস্থানে দেখতে পাব যে প্রতীকও নবনীতার কলমে চিত্রকল্প নির্মিতিতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে [দ্র. ১.৩.২.৩.-এর (খ)]।

ধারণাগত রূপক: আমরা যখন আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত কোনো বিমূর্ত বিষয়কে কোনো মূর্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝি, তখন তৈরি হয় ধারণাগত রূপক (conceptual metaphor)। যেমন - 'জীবন হল পরিভ্রমণ'। এখানে 'জীবন' হল একটি বিমূর্ত বিষয়, যাকে বোঝানো হচ্ছে 'পরিভ্রমণ'-এর মতো একটি মূর্ত বিষয়ের সাহায্যে। Lewis-এর মতে, প্রতিটি চিত্রকল্প শেষ পর্যন্ত 'to some degree metaphorical'[৯]। সুতরাং বলা যায়, সব চিত্রকল্পেই মেটাফরের গুণ নিহিত থাকলেও, সব মেটাফর চিত্রকল্প নয়। তাই নবনীতার সাহিত্যের অন্তর্গত যেসব মেটাফর চিত্রকল্প নয়, সেগুলির মধ্য থেকে দুয়েকটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায় ও নবম অধ্যায়ে।

চিত্র, প্রতীক এবং ধারণাগত রূপক – এগুলির পরিণামে পাঠকের মনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে সামগ্রিক আবেশ সৃষ্টি হয়, বলা যেতে পারে, সেই আবেশ চিত্রকল্পের জন্ম দেয়।

বর্তমান অধ্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন চিত্রকল্প সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেনের গল্প উপন্যাসে শিল্পসুষমা বৃদ্ধির পাশাপাশি আর কী জাতীয় ভূমিকা পালন করছে, তা অনুসন্ধান করা।

১.২. পদ্ধতি

নবনীতার গল্প ও উপন্যাসে ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলিকে নিম্নলিখিত তিনটি মাত্রায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে –

চিত্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্র

চিত্রকল্পের প্রকার

চিত্রকল্পে ধৃত বিবিধ ধারণা

এভাবে বোঝা সম্ভব যে চিত্রকল্প বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসের কাঠামোয় কীভাবে বিন্যস্ত হয়ে আছে।

১.২.১. চিত্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্র

চিত্রকল্পের ক্ষেত্র বলতে কী বলতে চেয়েছি, তা বুঝতে সুবিধা হবে যদি আমরা সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত ধারণা রেজিস্টারের ক্ষেত্র (field of Register) বিষয়টি স্মরণ করি। রেজিস্টারের ক্ষেত্র যেমন হতে পারে খেলাধুলো, রান্না শেখানো, চিকিৎসা ইত্যাদি, তেমনি চিত্রকল্পের ক্ষেত্রও অনুরূপ। ক্ষেত্র বলতে এক কথায় বলা যায় চিত্রকল্প নির্মাণের বিষয়গত স্থান।

১.২.২. চিত্রকল্পের প্রকার

চিত্রকল্পের প্রকার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, তা ভেন ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখানো হয়েছে (দ্র. চিত্র ১)। ড. সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর 'মূর্তিতে কি দিবে ধরা' প্রবন্ধে[১০] চিত্রকল্পের বিভাজন সম্পর্কে যেরূপ ধারণা দিয়েছেন, চিত্রে (উক্ত ভেন ডায়াগ্রামে) অঙ্কিত চিত্রকল্পের প্রকারভেদ তদনুসারী। চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন প্রকার চিত্রকল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক। চিত্র থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে উক্ত চার প্রকার চিত্রকল্প পৃথকভাবে যেমন অবস্থান করতে পারে, তেমনি অনায়াসে একে অন্যের সঙ্গে জুড়ে থাকতেও পারে। একাধিক উপশ্রেণিসহ চিত্রকল্পের যে চারটি প্রধান শ্রেণি রয়েছে, সেগুলি ড. চক্রবর্তীর চিন্তাধারা অনুসরণ করেই নিচে পরপর উল্লেখ করা হয়েছে। এদের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি বর্তমান অধ্যায়ের 'বিশ্লেষণ ও আলোচনা' [দ্র. ১.৩.] অংশে নবনীতা দেবসেনের সাহিত্য থেকে বিবিধ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে বিস্তৃতাকারে প্রতিষ্ঠা করা হবে। চিত্রকল্পের শ্রেণি বা প্রকারগুলি নিম্নরূপ –

(ক) তুলনাত্মক চিত্রকল্প (Metaphorical image): এর বিভাজন নিম্নরূপ-

i. সরল ইন্দ্রিয়বেদ্য চিত্রকল্প
ii. ইন্দ্রিয় বিপর্যয়ী চিত্রকল্প
iii. দুটি বিষয়ের ভাবসাদৃশ্য-প্রধান (রূপসাদৃশ্য নয়) চিত্রকল্প

(খ) ইঙ্গিতময় চিত্রকল্প (Suggestive image): এই জাতীয় চিত্রকল্পের বোধগম্যতা নির্ভর করে পাঠকের নিজস্ব পাঠ-অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, শিল্পবোধ, সংস্কৃতি ও জীবন-অভিজ্ঞতার ওপর। এর বিভাজন নিম্নরূপ-

i. আর্কিটাইপ ইমেজ বা প্রত্ন-চিত্রকল্প

ii. শব্দপ্রয়োগের কৌশলে ধ্বনিসাম্য সৃষ্টি এবং তা থেকে প্রাপ্ত চিত্রকল্প

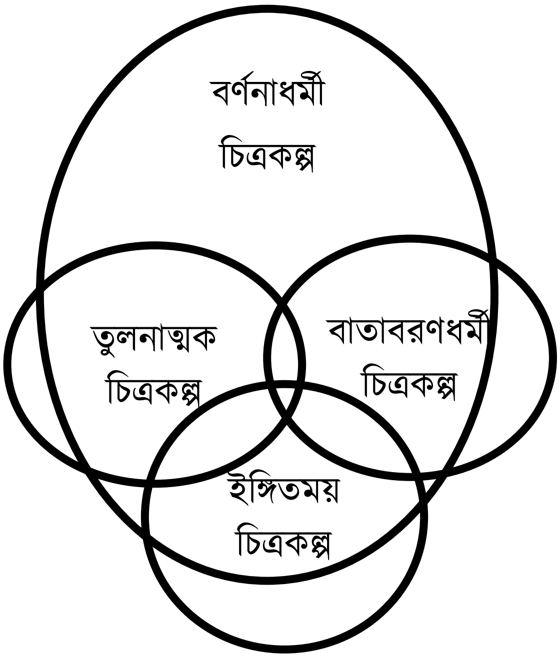

চিত্র ১: চিত্রকল্পের প্রকার ও তাদের আন্তঃসম্পর্ক

(গ) বাতাবরণ সৃষ্টিকারী চিত্রকল্প (Atmosphere creating image): এটি কাহিনির অন্তর্গত কোনও বাতাবরণকে ঘন করে অব্যক্ত হৃদয়াভাবকে পরিস্ফুট করে।

(ঘ) বর্ণনাধর্মী চিত্রকল্প (Descriptive image): এক্ষেত্রে কোনোরকম তুলনা বা ইঙ্গিত থাকে না। শুধু বর্ণনার গুণে পাঠক-মনে ছবি তৈরি হয়।

১.২.৩. চিত্রকল্পে ধৃত বিবিধ ধারণা

পাঠের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রসঙ্গ, গল্প বা উপন্যাসের সার্বিক মেজাজ এবং চরিত্রায়ণে চিত্রকল্পগুলির কীরূপ প্রভাব, তার ভিত্তিতে চিত্রকল্প বিশ্লেষণ করা হবে।

১.৩. বিশ্লেষণ ও আলোচনা

১.৩.১. চিত্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্র

আমরা প্রথমেই পরপর দেখে নিই সাধারণত কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে নবনীতা দেবসেনের লেখায় চিত্রকল্প ধরা দিয়েছে –

(ক) নারী চরিত্র নির্মাণ

(খ) কৌতুক চরিত্র নির্মাণ

(গ) মহাকাব্যিক চরিত্রের বিনির্মাণ

(ঘ) সময়ের ছবি নির্মাণ

(ঙ) পোষ্য প্রাণীর চরিত্র বর্ণনা

(চ) বিবিধ পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি

(ছ) শরীরী প্রেম-অপ্রেম

১.৩.২. চিত্রকল্পের প্রকার

এবার উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে প্রাপ্ত চিত্রকল্পগুলির প্রকার নির্ণয় করা হল।

১.৩.২.১. নারী চরিত্র নির্মাণে ব্যবহৃত চিত্রকল্পের প্রকার

নবনীতা দেবসেনের রচনায় যত নারী চরিত্র এসেছে, তাদের অধিকাংশই সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাসেই মেয়েরা স্বনির্ভর, আত্মবিশ্বাসী, স্বাধীনচেতা এবং নিজেকে রক্ষার পাশাপাশি অন্যকে রক্ষা করতে, অন্যের দায়িত্ব নিতে সক্ষম। তাঁর *সীতা থেকে শুরু*, *ফিনিক্স*, *দ্বিরাগমন*, *আলবাট্রস*, *অভিজ্ঞান*, *ঘূর্ণি*-র মতো কাহিনিতে নারী চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে এমন কিছু চিত্রকল্প ফুটে ওঠে, যেগুলি নারীর এইরূপ চারিত্রিক

বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে থাকে। নারীর এইসকল বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে দীর্ঘকালব্যাপী প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ফলে তৈরি হওয়া নারীর ওপর আধিপত্য কায়েমের ধারণাকে প্রশ্ন করে।

(ক) *ফিনিক্স* উপন্যাসে মধ্যবয়স্ক বিপাশা একজন মা হওয়া সত্ত্বেও প্রথাগত মাতৃত্বের বোধ তাঁর মধ্যে নেই। দুটি শক্তির জোরে তিনি বাঁচেন – মেধা আর যৌবন। মাতৃত্ববিরোধী ইমেজের বহুল ব্যবহার এই উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায় –

> ওর কাছে তো মা মানে আরাম নয়, মা মানে বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হয়ে ফেরা নয়, রোহিণীর জীবনে মা মানে কথা কাটাকাটি, মা মানে সংগ্রাম।[১১]

যখন বলা হল মা মানে সংগ্রাম কিংবা কথা কাটাকাটি, তখন আসলে দু'ধরনের ব্যক্তির মধ্যে ভাবসাদৃশ্যের বোধ তৈরি করা হল। একজন হল মা এবং অপরজন হল এমন এক ব্যক্তি, যার সঙ্গে কথা কাটাকাটি ও সংগ্রাম করতে হয়। কিন্তু মায়ের সঙ্গে এমন ব্যক্তির ভাবসাদৃশ্যের বোধ অনেকটাই কল্পনা-নির্ভর। কারণ, মায়ের প্রথাগত ইমেজের বিরোধী বোধের জন্ম দেয় এই চিত্রকল্প। এটি তুলনাত্মক চিত্রকল্প। প্রাসঙ্গিক বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও পাঠকের সংশ্লিষ্ট বোধগত প্রক্রিয়া আছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে [দ্র. ২.৩]।

(খ) লেখিকা বিপাশার আত্মসুখের উদ্‌যাপনকে তুলে ধরেছেন চিত্রকল্পের মাধ্যমে–

> হঠাৎই খেয়াল হল, এই গ্লাসটা এখনও রয়ে গিয়েছে, সেই চেকোস্লোভাকিয়াতে উপহার পাওয়া ক্রিস্টাল গ্লাসের সেটের একটা। বেচকার দেওয়া। য়োহান, মিরকো, এভিচকো, এভিচকা। অনেক দূরের স্বপ্নের মতো মনে হয় ব্রাটিস্লাভা, বাগান আর অরণ্যে ঘেরা বুদমেরিৎসে প্রাসাদ, সেখানে একদল টার্কির সঙ্গে ঘুরছে, মাঝে মাঝে পেখমও মেলছে একটা ভারতবর্ষের ময়ূর।[১২]

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে 'পেখম মেলা ভারতবর্ষের ময়ূর' আসলে স্বাধীনমনস্ক বিপাশাকেই বোঝায়। এই যে তুলনাত্মক চিত্রকল্প, এখানে কেবল ভাবসাদৃশ্যই নেই। সেইসঙ্গে এটি ইঙ্গিতধর্মী চিত্রকল্পও বটে। কীভাবে এর ইঙ্গিতধর্মিতা আমরা টের পাই? আমরা জানি, ময়ূর ভারতবর্ষের জাতীয় পাখি এবং অত্যন্ত সুদর্শন পাখি। ময়ূর যখন পেখম মেলে চলে,

তখন সেই চলার মধ্য দিয়ে ঘোষিত হতে থাকে যে সে আর পাঁচটা পাখি অপেক্ষা সৌন্দর্যের দিক থেকে এবং ভারতীয়দের কাছে গুরুত্বের দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্যদিকে টার্কি বললে আমাদের ধারণায় আসে উত্তর আমেরিকার এক বড়সড় চেহারার পাখির কথা। টার্কি ময়ূরের তুলনায় অনেক সহজে বশ্যতা স্বীকার করে বা পোষ মানে। টার্কির সৌন্দর্যও হার মানে ময়ূরের কাছে। টার্কি ও ময়ূর সম্বন্ধীয় আমাদের এই জ্ঞান ওপরের চিত্রকল্পকে বুঝে নিতে সাহায্য করে। বিপাশার যৌবন-সৌন্দর্য, স্বাধীন মনোভাব এবং তাঁকে ঘিরে পুরুষের উন্মাদনার ছবিটা আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয় চিত্রকল্পের ছোঁয়ায়। নবনীতার সাহিত্যে বিপাশার মতো মেয়েরা পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, বরং পুরুষকেই নিয়ন্ত্রণ করে। একথার সপক্ষে বারবার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে সন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে।

(গ) নবনীতা দেবসেনের একের পর এক রূপকথা শুধু যে ছোটদের মন জয় করে তাই নয়, বড়রাও অনায়াসে ঘুরে আসতে পারেন সেইসব রূপকথার বিচিত্র ছবির মেলা থেকে। রূপকথার টুকরো-টুকরো ছবি আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে নারী কেবল দুঃখ ভোগ করতে এবং সেই দুঃখের বিনিময়ে পুরুষের জয় ঘোষণা করতেই জন্মায় না। নারীর নিজস্ব কার্যকুশলতা, তার বুদ্ধিদীপ্ত আচরণ তাকে স্বাতন্ত্র্যমন্ডিত করে। নবনীতা দেবসেনের কলমে নারী পুরুষের মুখাপেক্ষী নয়, বরং বিপদের মুহূর্তে সে নিজেই সক্রিয় – বাহুবলে নয়, বুদ্ধিবলে। এইসব কাহিনিতে তাই নারীই হয়েছে যেন গল্পের নায়ক। বর্ণনাধর্মী চিত্রকল্পের বহুল ব্যবহার লক্ষিত হয়। যেমন 'চাষি বউয়ের মেয়ে' গল্পে দেখা যায় –

> মিষ্টি পা টিপে টিপে ঠিক পিছন থেকে গিয়ে দুই হাতে শাবল ধরে জোরসে মেরে দিল সাপের মাথাতে এক বাড়ি ! মাথা চ্যাপ্টা হয়ে গেল। তখন কুডুল দিয়ে দুষ্টু সাপের মাথাটা কেটে বাদ দিয়ে তার পেটটা চিরে ফেলে মিষ্টি দেখে পাশাপাশি শুয়ে আছে তার বাবা, বড়দা, মেজদা, ছোড়দা। চারজনেই অজ্ঞান, অচৈতন্য।[১৩]

১.৩.২.২. কৌতুক চরিত্র নির্মাণে ব্যবহৃত চিত্রকল্পের প্রকার

নবনীতা দেবসেনের আখ্যানে যে আবহ বারবার ফিরে আসে তা হল কৌতুকাবহ। বিশেষত গল্পসাহিত্যে কৌতুক সৃষ্টি লেখিকার অন্যতম জোরালো প্রবণতা। তাঁর কলমের বিশিষ্টতা হল তিনি দুঃখের কাহিনিকেও কৌতুকের আচ্ছাদনে মুড়ে পরিবেশন করেন। এর ফলে সহৃদয় পাঠকের মনে দুঃখের অনুভূতি গাঢ়তর হয়। এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যবাহী গল্প হল তাঁর ‘জরা হট্‌কে জরা বঁচ্‌কে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান্‌!’। এই গল্পটির প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে [দ্র. ৩.৩.৯.]। তবে বর্তমান অধ্যায়ের সাপেক্ষে যেটা বলার তা হল, এই ধরনের কাহিনির মধ্যে এমন কিছু চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়, যেগুলি পাঠকের উদ্দেশে নিখাঁদ আনন্দ প্রদানের জন্যই সৃষ্ট। সেইসব চরিত্র নির্মিতিতে সাধারণত যেসব চিত্রকল্প ধরা দিয়েছে, সেগুলি এবার এক এক করে দেখে নেওয়া যাক।

(ক) ‘মেসোমশায়ের কন্যাদায়’ গল্পের মেসোমশাই তাঁর বিবাহ-সাজে সজ্জিত মেয়েকে জোর করে হরলিক্স আর দই খাইয়েছেন। মেয়ের ঠোঁটের দামি প্রসাধনের সাজ সম্পূর্ণ মুছে গেছে। উপরন্তু খাওয়াতে গিয়ে বেনারসীতে দই পড়ে যাওয়ায় মেসোমশাই সেটা আবার এক মগ জল দিয়ে ধুয়েছেন। মাসিমা ঘটনাস্থলে ছিলেন না। কিছুক্ষণ পরেই মাসিমার কাছে তিনি ধরা পড়ে যান এবং মাসিমা রণং দেহি মূর্তি ধরেন। তখন সদা দাপুটে মেসোমশায়ের পরাজয়ের ছবি ফুটে ওঠে নিম্নরূপে –

> চিবুক উঁচু করে প্যান্টের দু পকেটে দুই হাত গুঁজে, মস্তান ভঙ্গিতে একটু ব্যাঁকা হয়ে দাঁড়ান মেসোমশাই। চেহারার মধ্যেই ডিফায়্যান্ট ভাবটা সুস্পষ্ট। যেন ফাঁসির মঞ্চে সূর্য সেন।[১৪]

এই চিত্রকল্পকে সম্পূর্ণ অনুভব করতে হলে পাঠকের ‘ফাঁসির মঞ্চে সূর্য সেন’ সংক্রান্ত জ্ঞান থাকা জরুরি। ইঙ্গিতময় চিত্রকল্প এটি। সেইসঙ্গে তুলনাত্মক চিত্রকল্প তো বটেই। কারণ বিপ্লবী সূর্য সেনের সঙ্গে গল্পের মেসোমশায়ের ভাবসাদৃশ্য তৈরি করা হয়েছে। বিপ্লবী সূর্য

সেনের বীরত্বপূর্ণ আচরণ তাঁর মৃত্যুকালেও অটুট ছিল। কারণ ব্রিটিশের হাতে ধরা পড়ে গেলেও তিনি জানতেন যে তিনি যা করেছেন তা সত্যের জন্য, দেশের জন্য। এর মধ্যে কোনো অন্যায় নেই। গল্পের মেসোমশাই জানেন যে যতই তাঁর মেয়ের বিয়ের সাজ নষ্ট হোক না কেন, তিনি তাঁর ক্ষুধার্ত মেয়েটাকে খাইয়ে এসেছেন। যদিও মেয়ের খিদে পাওয়া মেসোমশায়ের কল্পনা। তাঁর কথায়, "আপন গর্ভধারিণী জননী যারে দেখেনা, হিউজ নেগলেক্ট করে, তারে দেখবো তো বাপেই!"[১৫]। এভাবে বিপ্লবী সূর্য সেনের সঙ্গে মেসোমশায়ের ভাবসাদৃশ্য তৈরি হয়। চিত্রে (দ্র. চিত্র ২), দুটি বৃত্তের যে সাধারণ অংশটি রয়েছে, সেই অংশটিকে রেখাঙ্কিত করা হয়েছে। এই অংশেই প্রাপ্ত চিত্রকল্পের অবস্থান।

চিত্র ২: 'মেশোমশায়ের কন্যাদায়' গল্পে কৌতুক চরিত্র নির্মাণে চিত্রকল্পের প্রকার

(খ) 'স্পটলেস স্পটেড ডিয়ার' গল্পে পাই তুলনাত্মক চিত্রকল্প। বসনমামা এতদিন যে প্রাণীটিকে হরিণশিশু ভেবেছিলেন, হঠাৎ জানতে পারেন সেটি আসলে একটি ছাগলছানা। মর্মাহত বসনমামা মৃগশিশুর (যা আসলে ছাগল) জন্য যে মধুর শিশি এনেছিলেন, তা ধীরে ধীরে পকেটে ভরতে থাকেন। ঠিক এই মুহূর্তে তাঁর মুখের চেহারা বিবৃত হয়েছে নিচের চিত্রকল্পে –

> ওষুধ কিনে ছুটে ছুটে হাসপাতালে এসে রোগীর মৃত্যু সংবাদ পেলে লোককে যেমন দেখায়, তাঁকেও তেমনি দেখাল।[১৬]

এভাবেই দুঃখজনক ভাবনা দিয়ে কৌতুকের চিত্রকল্প তৈরি করেন নবনীতা। অনুরূপভাবে তাঁর বিভিন্ন হাসির গল্পে ইমেজের মাধ্যমে উঠে এসেছে নানা ভাবের নানা রঙের এক একটি কমিক চরিত্র। মেসোমশাই, বসনমামা, মণিদা, মণিদার শ্বশুরমশাই, রঞ্জন, বিনোদবাবু প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য।

এখানে যে কথাটা বলার, তা হল, খুব বেশি গাম্ভীর্য বা সিরিয়াসনেস দাবি করে না, এমন বিষয়ের সঙ্গে কোনও প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ কিংবা কোনও দুঃখজনক বিষয়ের সাদৃশ্য তৈরি ক'রে গল্পকার কৌতুকের পরিমাণকে আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ, গল্পকার নবনীতা যেমন কখনও কখনও দুঃখের বিষয়কে কৌতুকে মুড়ে দুঃখের বোধকে তীব্রতর করে দেন, তেমনি আবার কখনও কখনও কৌতুকের বিষয়কে দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে লগ্ন ক'রে কৌতুকের মাত্রা বৃদ্ধি করেন।

১.৩.২.৩. মহাকাব্যিক চরিত্রের বিনির্মাণে ব্যবহৃত চিত্রকল্পের প্রকার

(ক) 'সীতা থেকে শুরু'র 'পৌরানিকী' অংশে ধরা দিয়েছে মহাকাব্যের চিরপরিচিত কাহিনির ফাঁকে কিছু বিকল্প সম্ভাবনার রং। 'মূল রামায়ণ' গল্পে দেখা যায়, যুদ্ধে কালক্ষেপ ও রক্তক্ষয়ের বিনিময়ে নয়, বরং হনুমানের পিঠে চড়ে খুব সহজে সীতা অশোকবন থেকে রামের কাছে চলে আসেন। কিন্তু বাল্মীকি এতে খুবই আপত্তি করেন, কারণ এরকম হলে তাঁর রামায়ণ লেখা হবে না এবং রামেরও বীরত্ব প্রতিষ্ঠা হবে না। একথা জেনে রামও চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় সীতার নতস্বভাব ও আনুগত্যের চিরাচরিত ইমেজকে সমূলে উৎপাটন করে দিয়ে গল্পকার সীতা চরিত্রের বিনির্মাণ করেছেন। তাঁর কথায় –

> সীতাদেবী তো রামচন্দ্রের মতো ভালোমানুষ নন – তিনি আগুনের মতো ফোঁস করে উঠলেন[১৭]

‘আগুনের মতো ফোঁস করে ওঠা’র উপমায় একটা তাৎক্ষণিক ছবি ফুটে উঠলেও, চিত্রকল্পের প্রসার দেখা যায় নিচের উদ্ধৃতাংশে –

> ধনুকের মতো ভুরু দুটিকে খড়্গের মতো বক্র করে সীতা বললেন – “ভণ্ডুলের কী আছে আর্যদেব? ওই উইপোকামুনির কথা ছাড়ুন তো আপনি নাথ! সব ঠিক করে দিচ্ছি – ... মহেন্দ্র পর্বত আর অশোকবন তো এইখান থেকে এইখানে! উঠলুম আর নাবলুম! চোখের পলকে পৌঁছে যাবো। চলো তো বৎস হনুমান! আরেকবারটি তোমার পিঠে চড়ে বসি! আলসে চেড়িগুলো নিশ্চয়ই এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি! তাড়াতাড়ি যাবেন কিন্তু প্রভু! অকারণ দেরি কোরো না যেন, দেবর লক্ষ্মণ! চলো বৎস ফিরে যাই। হুঁঃ।” বলে সীতা বাল্মীকির দিকে অবজ্ঞার চাউনি দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।[১৮]

বর্ণনাধর্মী চিত্রকল্প, যা সীতাকে দেবীত্বের আসন থেকে সরিয়ে মনুষ্যসুলভ রাগ-দুঃখ-ঘৃণার অনুভূতিতে মোড়া রক্তমাংসের মানুষরূপে চিত্রিত করে। এমনকি সীতা মুনিঋষির অন্যায়ের বিপক্ষে সরব হতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

(খ) ‘সীতা থেকে শুরু’র অন্তর্গত ‘সীতার পাতাল প্রবেশ’ শীর্ষক কাহিনিতে সীতার সতীত্ব পরীক্ষার মানদণ্ড হিসেবে অগ্নিপরীক্ষা ও পাতাল প্রবেশের চিরাচরিত কাহিনিকে নবনীতা বাস্তবিক চেহারা দিয়েছেন। স্ত্রীর মুখের কঠোর সত্য ভাষণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিপালক রাজা রামের কাছে তীব্র অসহনীয় হয়ে ওঠে। গল্পের রাম নিজেই তাই সীতার হত্যাকারী হয়ে ওঠেন –

> রামচন্দ্রের বাঁদিকে একটি ক্ষুদ্র বোতাম ছিল। বিশ্বকর্মার অপূর্ব সৃষ্টি। তিনি বোতামটি টিপে দিলেন, স্বর্ণসিংহাসন সমেত সীতা রসাতলে নেমে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে উপরের মর্মরবেদী আবার যেমন-কে-তেমন জুড়ে গেল। সভাস্থ সকলে একবাক্যে চীৎকার করে উঠলো – “জয় সীতালক্ষ্মী সীতামায়ের জয়! জয় ইক্ষ্বাকুবংশের জয়!”[১৯]

রামের নরশ্রেষ্ঠ-ইমেজ মুহূর্তে ভেঙে যায়। ‘বোতাম টিপে দেওয়া’ হল বুদ্ধিদীপ্ত উপায়ে অনায়াসে কাজ হাসিল করার একটা প্রতীক। বিশ্বকর্মার উল্লেখ প্রযুক্তিগত সূক্ষ্মতাকে ইঙ্গিত করে। প্রযুক্তির প্যাঁচ বরাবরই সাধারণ জনগণের বোধের বাইরে থাকে। বোতাম টিপে দিয়ে

রাম এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো করে একদিকে বিনা পরিশ্রমে প্রতিবাদী ‘প্রগলভ’ নারীকে কৌশলে দাবিয়ে দিলেন এবং অন্যদিকে বংশমর্যাদা বৃদ্ধির দ্বারা প্রজাপ্রিয় হয়ে উঠলেন।

রাম এখানে কূটবুদ্ধিসম্পন্ন অসৎ ব্যক্তির মতো আচরণ করেন। ভক্তের ভগবানরূপে পূজিত রামচন্দ্র শেষ পর্যন্ত শয়তানের ভূমিকায় আসীন হন, যখন দেখা যায় বোতাম টিপে সীতাকে রসাতলে ফেলে দেওয়ার পর –

> রাম মৃদু হাসলেন দুজন পার্ষদের দিকে তাকিয়ে। তারপরেই বুক চাপড়ে কেঁদে উঠলেন – “দে, দে, বসুধা, আমার সীতাকে ফিরিয়ে দে, নইলে তোর চারভাগই আমি জল করে ফেলবো – একভাগ স্থল আর রাখতে দেব না-”[২০]

এই কান্না যে কতখানি মেকী তা আর বুঝতে বাকি থাকে না। সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা ‘বোতাম টেপা’-র প্রতীকী ব্যবহার এবং বর্ণনার গুণে একটি মহাকাব্যিক চরিত্রের বিনির্মিত ইমেজ দেখতে পেলাম। এই বিনির্মাণের অবকাশ রচনা করেছে রামচন্দ্রের সঙ্গে পুরুষশাসিত সমাজের ধ্বজাধারী কোনো এক স্ত্রী-হন্তা স্বামীর ভাবসাদৃশ্যের কল্পনা। এই চিত্রকল্পের প্রকার কেমন, তা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল [দ্র. চিত্র ৩]। দুটি বৃত্তের যে সাধারণ অংশটি রয়েছে, সেই অংশটিকে রেখাঙ্কিত করা হয়েছে। এই অংশেই প্রাপ্ত চিত্রকল্পের অবস্থান।

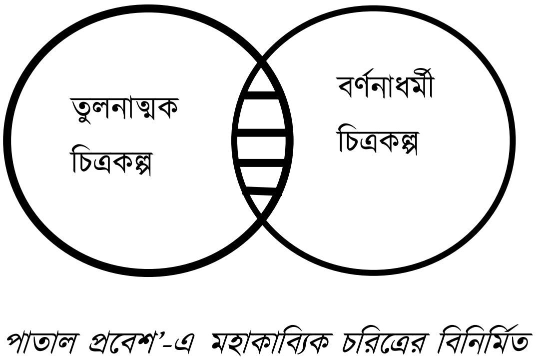

চিত্র ৩ : ‘সীতার পাতাল প্রবেশ’-এ মহাকাব্যিক চরিত্রের বিনির্মিত চিত্রকল্পের প্রকার

এইরকম চিত্রকল্প আসলে রামের প্রকৃত চারিত্রিক ত্রুটিকে পাঠকের সামনে তুলে ধরে। রামায়ণের সীতার পাতাল প্রবেশ তাঁর লোকান্তরের ইঙ্গিতবাহী এবং এর জন্য আর কেউ নয়, রামচন্দ্রই দায়ী। রাজা রামচন্দ্র ইচ্ছা করলেই সীতার সতীত্ব পরীক্ষার বিনিময়ে নিজের বংশগৌরব বৃদ্ধির ঠুনকো মূল্যবোধকে এক লহমায় নস্যাৎ করে দিতে পারতেন। কিন্তু কেবলমাত্র প্রজাসন্তুষ্টিকেই মূল্য দিতে চেয়েছেন তিনি। স্ত্রীর সম্মান রক্ষার কথা ভাবেননি। সতীত্ব পরীক্ষার নামে অসম্মানের মুখে ঠেলে দেওয়া আসলে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়ারই নামান্তর।

১.৩.২.৪. সময়ের ছবি নির্মাণে ব্যবহৃত চিত্রকল্পের প্রকার

(ক) গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের মুক্তিকামী আন্দোলনে যারা যোগ দিয়েছিল, সেইসব স্বপ্নদর্শী একঝাঁক ঝকঝকে উজ্জ্বল ছেলেমেয়ে নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিবেদন করেছিল বঞ্চিত-পীড়িত মানুষের জন্য। এইসব অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের আন্দোলনের স্পৃহা, আন্দোলনের ভাষাই কার্যত ওই সময়ের ছবিকে প্রকাশ করে –

> মাও-সে-তুং -এর জয়ধ্বনি দিয়ে, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য দুষ্কৃতের বিনাশ করে সমাজে ধর্মসংস্থাপনের ভার নিজেরাই নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল তারা।[২১]

আমাদের মনে পড়বে গীতার শ্লোক :

> যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
> অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।[২২]
> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতম্।
> ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।[২৩]

ইঙ্গিতময় চিত্রকল্প এটি। পরোক্ষে ব্যবহার করা হয়েছে বীরশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের আর্কেটাইপ। সেইসঙ্গে এই অংশটি পাঠকের নিজস্ব পাঠ-অভিজ্ঞতা দাবি করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এরকম আন্তর্বয়ানের প্রয়োগ করেও নবনীতা তাঁর গল্প-উপন্যাসে চিত্রকল্প তৈরি করেছেন। সন্দর্ভের

তৃতীয় অধ্যায়ে চিত্রকল্প নির্মিতিতে আন্তর্বয়ানের প্রয়োগ বিষয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হয়েছে [দ্র. ৩.৩.২]।

(খ) ‘আমি অনুপম’ উপন্যাসে ফুটে ওঠে বর্ণনাধর্মী দৃশ্য ও শ্রুতিগ্রাহ্য চিত্রকল্প –

> অন্ধকার আরো ঘন হয়ে এলো। ঘেরা মাঠের সাজানো ঝোপঝাড়ে ছোট ছোট রঙিন বৈদ্যুতিক জোনাকি জ্বলছে নিবছে। অন্ধকার চিরে কোথায় একটা পাখির একহারা অসময়ের কান্না শোনা গেলো—-ক্লী—ব ... ক্লী—ব ... ক্লী—ব।[২৪]

এই ‘ক্লী—ব ... ক্লী—ব ... ক্লী—ব’ ধ্বনি আসলে অনুপমের মতো বুদ্ধিজীবী শ্রেণি তথা সমকালীন সময়ের ক্লীবত্বকেই প্রতীকায়িত করে। এই বর্ণনা এক প্রকার বাতাবরণও তৈরি করে বৈকি। সে-বাতাবরণ চরম অস্বস্তি আর অবচেতন মনে সঞ্চিত হতে থাকা অপরাধবোধের বাতাবরণ।

সুতরাং সময়ের ছবি নির্মাণে ব্যবহৃত চিত্রকল্পের এই দ্বিতীয় উদাহরণে ইন্দ্রিয়বেদ্য তুলনাত্মক, বাতাবরণ সৃষ্টিকারী এবং বর্ণনাধর্মী – তিন প্রকারের চিত্রকল্পের গুণই বিদ্যমান। এক্ষেত্রে চিত্রকল্পের প্রকৃতি চিত্রে দেখানো হয়েছে (দ্র. চিত্র ৪)। তিনটি বৃত্তের যে সাধারণ অংশটি রয়েছে, সেই অংশটিকে রেখাঙ্কিত করা হয়েছে। এই অংশেই প্রাপ্ত চিত্রকল্পের অবস্থান।

চিত্র ৪: ‘আমি অনুপম’ উপন্যাসে সময়ের চিত্রকল্পের প্রকার

১.৩.২.৫. পোষ্য প্রাণীর চরিত্র বর্ণনায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পের প্রকার

বিড়াল, খরগোশ প্রভৃতি পোষ্য প্রাণী যেসব গল্পের কেন্দ্রে, সেইসব গল্পের বেশিরভাগেই দেখা যায় চিত্রকল্পের মাধ্যমে কোনো সিরিয়াস বিষয়ের সঙ্গে গল্পের বর্ণিতব্য কোনো হালকা বিষয়ের তুলনা করা হয়েছে। এর ফলে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্য তৈরি হয়, যা আসলে বর্ণিতব্য বিষয়টিকে অনেক বেশি কৌতুকপূর্ণ করে তোলে। যেমন –

(ক) ‘প্রাণবিন্দুবাবুর খরগোশ’ গল্প থেকে তুলনাত্মক চিত্রকল্পের একটি নিদর্শন দেখে নেওয়া যাক -

> খরগোশ, বিশেষ করে অবিবাহিত খরগোশ ...ডেজার্ট আইল্যান্ডে বেড়ে ওঠার মতো, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মতো, সে ইনোসেন্ট থাকে।[২৫]

বলা বাহুল্য, ডেজার্ট আইল্যান্ডে বেড়ে ওঠা মানুষের একাকিত্বের অনুভূতি এবং ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মুনিত্ব সম্পর্কে ধারণা না-থাকলে “অবিবাহিত খরগোশ”-এর ইনোসেন্স বুঝতে পারা মুশকিল। কারণ, ইমেজের বিষয় এখানে যতটা না সাবয়ব, তার চেয়ে অনেক বেশি অনুভবসাপেক্ষ। যে ধরনের সাদৃশ্য তৈরি হয়েছে, খরগোশ এবং ডেজার্ট আইল্যান্ডবাসী অথবা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মধ্যে, তা রূপসাদৃশ্য নয়, বরং ভাবসাদৃশ্যকে প্রকট করে তোলে। খরগোশের সঙ্গে মানুষের এইরকম সাদৃশ্যের বোধ নিখাদ হাস্যরসের উদ্রেক করে।

(খ) ‘প্রাণবিন্দুবাবুর খরগোশ’ গল্পেই খরগোশটিকে দেখা যায় বর্ণনাধর্মী চিত্রকল্পে–

> সে সদা-সর্বদাই নড়ছে। তার সূক্ষ্ম নাক নড়ছে, লেজ নড়ছে, চক্ষুতারকাদুটি নড়ছে, খুদে খুদে পায়ের সরু সরু আঙুলগুলো নড়ছে, তার সর্বাঙ্গ সর্বক্ষণ নড়নশীল।[২৬]

(গ) ‘মঁসিয়ো হুলোর হলিডে’ গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে একটি বেড়াল। লেখিকা সেই বেড়ালটির চাল-চলন যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তা তাঁর লেখনীর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে –

> কী সর্বনাশ! মেসোমশাই যে। মেসোমশাই সিমলিপালের সেই পোষা বাঘিনী খৈরীর ঠিক উলটো। সাইজে বলো, সেকসে বলো, স্বভাবে বলো। রং মিশমিশে কালো। আসুরিক বলশালী। সম্পূর্ণ বন্য উদ্দাম, স্বেচ্ছাচারী। সাইজে লেজসমেত পৌনে তিন ফুট মতো হবেন। ইয়া কেঁদো! চলাফেরা করেন, ওহ্ যেন আলেকজাণ্ডার! সে কী স্টাইল! দেখলেই মনে হয় পিছনে একগাদা সৈন্যসামন্ত আসছে, দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন।[২৭]

এটি মূলত বর্ণনাধর্মী চিত্রকল্প, সে-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। উপরন্তু দেখা যাচ্ছে, এই বর্ণনাধর্মী চিত্রকল্পের মধ্যেই ধরা আছে –

- গ্রিসের প্রবল পরাক্রমশালী দিগ্বিজয়ী রাজা আলেকজাণ্ডারের আর্কিটাইপ।
- বাঙালি ঘরের একজন মেসোমশায়ের ইমেজ। এই চিত্রকল্পের বোধগম্যতা নির্ভর করছে পাঠকের বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার ওপর। পারিবারিক পরিসরে একজন মেসোমশায়ের অভিভাবকত্ব, তাঁর গাম্ভীর্য, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের কাছে তাঁর শ্রদ্ধাস্পদ মূর্তি ইত্যাদি ছবি ফুটে ওঠে পাঠকের মনে।
- ‘সিমলিপালের সেই পোষা বাঘিনী খৈরী’-র উল্লেখ। এর বোধগম্যতা নির্ভর করছে পাঠকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ওপর। অর্থাৎ, সিমলিপালের পোষা বাঘিনী খৈরীর বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে, তবেই চিত্রকল্পটি ভালোভাবে বোঝা যাবে।

সুতরাং, একটি বর্ণনাধর্মী চিত্রকল্পের মধ্যেই ধরা দিয়েছে আরও তিনটি ইঙ্গিত। নির্মিত চিত্রকল্পের শ্রেণিগত অবস্থান চিত্রে দেখানো হয়েছে [দ্র. চিত্র ৫]। দুটি বৃত্তের যে সাধারণ অংশটি রয়েছে, সেটিকে রেখাঙ্কিত করা হয়েছে। এই অংশেই প্রাপ্ত চিত্রকল্পের শ্রেণিগত অবস্থান।

চিত্র ৫: 'মঁসিয়ো হুলোর হলিডে' গল্পে পোষ্য প্রাণীর প্রকৃতি বর্ণনায় চিত্রকল্পের প্রকার

(ঘ) 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের 'মাতৃয়ার্কি' পর্বের 'স্কেচ: ছয়' গল্পে পাওয়া যায় –

> দেখি লেজ ফুলিয়ে তার সুন্দরী হলুদ রঙের সেই গার্লফ্রেন্ডের গা ঘেঁষে বসে আছে লেটুস। মুখ তুলে আমাদের ডাকে সাড়া দিল – "ম্যাও"।[২৮]

এই বর্ণনাধর্মী চিত্রকল্প নির্ভেজাল হাস্যরস উপহার দেয় ঠিকই, কিন্তু এর কিছু পরেই আসে স্যাটায়ারধর্মী বাক্য –

> রূপসী প্রণয়িণীকে অনায়াসে টিনের চালে একলা ফেলে রেখে লেটুস এক লাফে ঘরে এসে তার ডিনারের প্লেটে মন দিয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে মা বললেন – এটাও ফ্যাক্ট অফ লাইফ, বাবারা। দেখো শেখো। এটা নেক্সট স্টেপ।[২৯]

এটি ঠিক প্রথাগত অর্থে চিত্রকল্প না-হলেও, লেটুস নামের হুলো বেড়াল এখানে স্বার্থপর ও মানবিকতাবোধশূন্য পুরুষের ক্রিয়াকলাপকে ইঙ্গিত করে।

১.৩.২.৬. *বিবিধ পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে ব্যবহৃত চিত্রকল্পের প্রকার*

পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রসঙ্গভেদে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তা হতে পারে কখনো প্রাকৃতিক, কখনো মনুষ্যসৃষ্ট, আবার কখনো তা উদ্ভূত হতে পারে সম্পূর্ণ মানসিক স্তরে। এইসব ক্ষেত্রে চিত্রকল্পের বৈচিত্র্য কতখানি, তা দেখে নেওয়া যাক।

১.৩.২.৬.১. পারিপার্শ্বিকতার ছবি নির্মাণে চিত্রকল্প

'চাঁদ গড়ার কারিগর' গল্পে দেখা যায়, গন্ধ আর শব্দের একেকটা তীব্র অনুভূতি পরপর সাজিয়ে শহর কলকাতার ছবি নির্মাণ করেছেন গল্পকার নবনীতা।

> কখনও বা ফুলের দোকান পার হচ্ছ, তাজা টাটকা ফুলের তীব্র সৌরভে গলি ভরা, কখনও হয়ত বইপাড়া দিয়ে যাচ্ছ, টাটকা আঠার গন্ধ, নতুন বইয়ের গন্ধ, তাজা কাগজের গন্ধ – কখনও কাপড়ের পাড়ায়, কাপড়ের গাঁঠরি নামাচ্ছে, ওঃ নতুন কাপড়ের গ— ওঃ ইনক্রেডিবল সিটি। কেউ তার জানলা দরজায় খসখস টাঙিয়ে তাতে জলঝড়া দিচ্ছে, তার সুবাস, কখনও মন্দির পার হয়ে যাচ্ছ, হঠাৎ নাকে আসবে ধূপধুনোর মিষ্টি পবিত্র গন্ধ, চন্দন সুরভি-শঙ্খঘন্টার শব্দ – শব্দই তো কত ধরনের – উঃ। রাতে একরকম, দিনে একরকম, ট্রামের একরকম, বাসের একরকম, রিকশার একরকম ... এরই মধ্যে কোকিল কুহু কুহু করছে, গরু মহিষ হাম্বা হাম্বা করছে, কুকুরের ভৌ ভৌ, বেড়ালের ম্যাঁও, কাকের কা-কা, চড়াইপাখির কিচির-মিচির ... কলতলায় মানুষ ঝগড়া করছে, এ-বাড়িতে হোলনাইট বাচ্চা কাঁদছে, ও-বাড়িতে হোল-ডে গিন্নি চ্যাঁচাচ্ছে ... ওখানে ক্লাসিকাল গানে কলা সাধতে বসেছে কেউ, এখানে ইংরিজি গান বাজিয়ে হাঁকতে হাঁকতে যাচ্ছে ফেরিওয়ালা – মোটমাট ভীষণভাবে বাঁচা হচ্ছে চারিদিকে...[৩০]

গন্ধ আর শব্দের উৎসব যেন আদ্যন্ত একটা চিত্রকল্প গঠন করেছে – জীবন্ত শহর-কলকাতার চিত্রকল্প। এটি ইন্দ্রিয়বেদ্য চিত্রকল্প।

১.৩.২.৬.২. প্রাকৃতিক ছবি নির্মাণে চিত্রকল্প

'মুখর নৈঃশব্দ্য' গল্পে ফুটে ওঠে বাহ্য প্রকৃতি আর অন্তঃপ্রকৃতির সম্মিলিত বোধের চিত্রকল্প,

> কী ভীষণ শব্দ করে বাজ পড়ছে, বিদ্যুৎ-এর জিব লকলকিয়ে উঠছে, থেকে থেকেই চেটে নিচ্ছে আকাশের রস। আকাশ ঝেঁপে ভরসন্ধে ঘনিয়ে এসেছে ঠিক দুপুরবেলায়। যখনই এমন ধড়াস করে দামাল ঝড় এসে পড়ে, বৃষ্টির সঙ্গে ঝুটোপুটি করতে করতে ঘর-দোর ভিজিয়ে দিয়ে যায়, তোমার জন্যে তখন মন কেমন করে।[৩১]

ক্রমান্বয়ে সৃষ্ট শ্রুতি, দৃশ্য ও স্পর্শগ্রাহ্য চিত্রকল্প মিলিতভাবে তৈরি করে 'মন-কেমন'-এর অনুভূতি। ইন্দ্রিয়বেদ্য চিত্রকল্প এটি।

১.৩.২.৬.৩. চরিত্রের মানসিক পরিস্থিতি প্রকাশে চিত্রকল্প

'আমি অনুপম' উপন্যাসে অনুপম তাঁর ছাত্রকে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ব্যবস্থা করে এসে প্রতিনিয়ত অপরাধবোধে দগ্ধ হতে থাকেন। নিজের চরিত্রের ফাঁকফোঁকরগুলো তাঁর কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে। বিবেকের দংশনমুহূর্তে তিনি যখন খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ালেন, তখন উপন্যাসে যে চিত্রকল্প ধরা দিল, তা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিস্ফুটনের থেকেও অনেক বেশি মাত্রায় অনুপমের মনের গহনলোকের সন্ধান দিতে চাইল –

> অনুপমের হঠাৎ কেমন গরম বোধ হল। অথচ দিব্যি ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে, ঝোড়ো ঝোড়ো ধুলোটে গন্ধ বাতাসে। গাড়ি থামিয়ে অনুপম নেমে পড়লেন। বিশাল সাদা আকাশে এমন ফ্যাটফেটে জ্যোৎস্নায় গদগদ চাঁদপারা মুখখানা এখনও ভাসিয়ে রেখেছে পূর্ণিমা। অথচ আর একদিকে খেলতে শুরু করেছে কালো মেঘের ঢেউয়ের পরে ঢেউ। ফরসা কপালের চারদিকে চূর্ণকুন্তলের মতো উড়ছে এখনও – এক সময়ে ওই মেঘ সব আলো নিশ্চিহ্ন করে দেবে। ... গ্রহগ্রহান্তরে পরিব্যাপ্ত এই ত্রিভুবন পরিকীর্ণ সংগতির মধ্যে শুধু তিনিই মূর্ত অসংগতি। কী দৈন্য? কী তুচ্ছতা।[৩২]

উপন্যাসটি পড়লে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই চাঁদ আর তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে আসা কালো মেঘের ঢেউ আসলে সত্তরের দশকের রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে যোগ দেওয়া অনুপমের একেকটি তরতাজা প্রাণরসে ভরপুর ছাত্রের ভয়াবহ পুলিশি অত্যাচারের কবলে পড়াকে ইঙ্গিত করতে চায়। আর সেই পথ প্রশস্ত করে এসেছেন অনুপম স্বয়ং। চিত্রকল্পটি ইন্দ্রিয়বেদ্য, ভাবসাদৃশ্যময়, অর্থাৎ তুলনাত্মক এবং বর্ণনাধর্মী তো বটেই।

১.৩.২.৬.৪. নৈঃশব্দ্যের বাতাবরণ সৃষ্টিতে চিত্রকল্প

'টাওয়ার অব সাইলেন্স' কাহিনির একেবারে শেষ বাক্যে তৈরি হয় নৈঃশব্দ্যের বাতাবরণ। দেখা যাক, কীভাবে এই শব্দহীনতার আবহ নির্মিত হয়েছে।

প্রায় সমগ্র কাহিনি জুড়ে চলতে থাকে পত্রিকা অফিসের মহিলা সম্পাদক এবং মধ্যবয়সী রাহুল সিংহের টেলিফোনে কথোপকথন। কবিতা লিখতে শেখার আবেদন নিয়ে রাহুল ফোন করলেও ক্রমশ তার একের পর এক কথা থেকে সম্পাদক বোঝেন যে রাহুল একইসঙ্গে লিঙ্গপরিচয়হীনতাবোধ এবং সামাজিক পরিচয়হীনতাবোধের শিকার। রাহুলের কথানুযায়ী, তিনি "ঘরে রেবেকা, অফিসে রাহুল", তাঁর বাবা আসল বাবা নন, তাঁর আসল বাবা বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, তাঁর ধমনীতে বইছে "ব্লু ব্লাড" ইত্যাদি।

কাহিনির দীর্ঘ সময় ধরে ক্রমশ গড়ে উঠেছিল যেন কথার পাহাড়। সেই পাহাড় মুহূর্তে উধাও হয়ে যায় যখন ফোনের ওপাশ থেকে রাহুলের মা কথা বলেন। জানা যায়, সদ্য গাড়ি চালাতে শেখা রাহুলের ভুলেই তাঁর বাবা তাঁরই গাড়িতে চাপা পড়ে মারা গিয়েছিলেন। বুঝতে আর দেরি হয় না যে এই ধাক্কা রাহুল আজও সামলাতে পারেননি – তিনি মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। সম্পাদকের এই উপলব্ধি এবং অবাক বিস্ময় ধরা দিয়েছে তাঁর শেষ বাক্যে –

রাহুলের মায়ের বাকি কথাগুলো আমার শ্রবণরন্ধ্রে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা নৈঃশব্দ্যের মিনারের মধ্যে হারিয়ে গেল।[৩৩]

উদ্ধৃত বাক্যটি ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে এখানে শব্দ থেকে শব্দহীনতার অভিমুখে একটা যাত্রা আছে। এই যাত্রার পরিণামে শব্দ রূপান্তরিত হয়েছে শব্দহীনতায়। আর সেই যাত্রাপথে রূপান্তরের প্রক্রিয়াতেই লুকিয়ে আছে শিল্পের সৌন্দর্য। সে-শিল্প নির্মাণ করে একটা বাতাবরণ তথা বাতাবরণ সৃষ্টিকারী চিত্রকল্প। ক্যারোলিন স্পার্জ্যনের ইমেজ সংক্রান্ত ভাবনা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য –

The image thus gives quality, creates atmosphere and conveys emotion in a way no precise description, however clear and accurate, can possibly do.[৩৪]

১.৩.২.৭. শরীরী প্রেমে-অপ্রেমে ব্যবহৃত চিত্রকল্পের প্রকার

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্পই বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে শরীরী প্রেম কিংবা অপ্রেমের প্রকাশক। *ফিনিক্স* উপন্যাসে যেমন দেখা যায় -

অনভিজ্ঞ কিশোরের মতো বিপাশার বুকের মধ্যে মাথা ঘষছে সমীর। বিপাশার য়োহানের কথা মনে পড়ল একবার। সমীরের চুলের ভিতর থেকে অচেনা গন্ধ আসছে – কিছুটা বর্ষার কাপড়ের মতো স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ। বিপাশার চোখ খোলা, দৃষ্টি দূরগামী।[৩৫]

বর্ষার কাপড়ের স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ আর যাই হোক কোনো প্রেমের অনুভূতি দেয় না। তীব্র ঘৃণা যদি না-ও হয়, তা এক প্রকার অ-প্রেম তো বটেই। বিপাশার গন্ধের অনুভূতির সঙ্গেই লগ্ন হয়ে আছে খোলা চোখের দূরগামী দৃষ্টির অনুভূতি। দৈহিক নৈকট্যের মুহূর্তে দৃষ্টির দূরগামিতা পুনর্বার বিপাশার অপ্রেমের বোধকেই সূচিত করে।

নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে সৃষ্ট চিত্রকল্পের শ্রেণি বিচারের জন্য আরও অনেকানেক উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু তাতে কেবলই অধ্যায়ের কলেবর বৃদ্ধি করা হবে। কোন্ কোন্ প্রকারের চিত্রকল্প নবনীতার লেখায় ধরা দেয়, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ওপরের দৃষ্টান্তগুলি যথেষ্ট ব'লে মনে হয়।

১.৩.৩. চিত্রকল্পে ধৃত বিবিধ ধারণা

নবনীতা দেবসেনের গল্প-উপন্যাসে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন প্রসঙ্গ, গল্প বা উপন্যাসের সার্বিক মেজাজ এবং চরিত্রায়ণে চিত্রকল্পগুলির কীরূপ প্রভাব, এবার তার ভিত্তিতে চিত্রকল্পগুলি বুঝতে চেষ্টা করব। অর্থাৎ, একেকটি চিত্রকল্পের ভিতরকার ভাববস্তু ঠিক কেমন ধাঁচের, সেইটিই এবার অনুসন্ধান করা হবে।

১.৩.৩.১. চিত্রকল্পের মাধ্যমে বিবিধ সীমালঙ্ঘন (transgression)

'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এই গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে একটা যাত্রা আছে, যে যাত্রাপথের প্রথম বিন্দুতে আছেন সীতা এবং তারপর অন্যান্য। এই যাত্রা আসলে ভারতীয় পুরুষ সমাজে নারীর জীবনপথের যাত্রা। 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের বিভিন্ন গল্পের প্রতিটি নারীর জীবনেই তিনি বারবার সীমালঙ্ঘনের ছবি এঁকেছেন। এই সীমালঙ্ঘন আসলে যুগের পর যুগ ধরে মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ছোট-বড় বিভিন্ন সামাজিক নিয়মের সীমালঙ্ঘন। তবে শুধুই নারীর সামাজিক সীমালঙ্ঘনের বিষয় নয়, সেই সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী পাঠকমনে স্থায়ী ছাপ ফেলে যাওয়া বহুচর্চিত কিছু চরিত্রের ইমেজেও কতকটা ভিন্ন রং ধরিয়েছেন নবনীতা। কাজেই এগুলোও লেখিকার পক্ষ থেকে এক প্রকার সীমালঙ্ঘন – প্রচলিত ইমেজের সীমালঙ্ঘন।

গল্পগ্রন্থটির 'পৌরাণিকী' অংশে যেসব মহাকাব্যিক কাহিনি অবলম্বন করে গল্পগুলি গড়ে উঠেছে, সেইসব কাহিনির শুরু এবং শেষ মূলের অনুসারী। কিন্তু কাহিনির মাঝের অংশে লেখিকা মূল কাহিনি থেকে স'রে গেছেন। আর সেখানেই মহাকাব্যিক চরিত্রগুলির বিনির্মাণ হয়েছে। মহাকাব্যিক চরিত্রের বিনির্মাণের ক্ষেত্রে যেসব চিত্রকল্প তৈরি হয়েছে, সেখানে অধিকাংশ সময় শব্দপ্রয়োগের অভিনবত্ব চিত্রকল্প তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। নিচে কিছু কিছু নিদর্শন তুলে ধরা হল, যেগুলিতে আমরা সীমালঙ্ঘনের চিত্রকল্প খুঁজে পাই।

(ক) 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'মূল-রামায়ণ' গল্পে সীতাকে উদ্ধারের জন্য একলাফে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে –

> ... "হেঁইও" বলে তো হনুমান শূন্যে ভেসে গেলেন। সেই সুমহান দৃশ্য দেখে দেব-দানব-গন্ধর্ব-কিন্নর-মুনি-ঋষি সকলে "কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ!" বলে হাততালি দিয়ে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। অঙ্গদ ও অন্যান্য বানরবৃন্দ তখন মহানন্দে ফুল কুড়োতে শুরু করলেন।[৩৬]

আরবী শব্দ উচ্চারণ করতে করতে দেব-দানব-গন্ধর্ব-কিন্নর-মুনি-ঋষি হাততালি দিচ্ছেন, এই দৃশ্যের কল্পনা এঁদের প্রথাগত ইমেজকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়ে নতুন এক ধরনের ইমেজ নির্মাণ করে। এঁদের প্রথাগত দেবতাসুলভ গাম্ভীর্য, স্থৈর্য্য ও সংযত ভাবের প্রকাশ দেখতেই পাঠক চিরাভ্যস্ত। কিন্তু নবনির্মিত ইমেজ কার্যত এক লহমায় এই শ্রেণিটিকে সাধারণ স্তরে নামিয়ে আনে। ফলে আমরা লক্ষ করব যে কাহিনির গোড়া থেকেই দেবতার দেবত্ব বা তাঁকে বিরাট করে দেখার প্রবণতাকে ক্রমশ ভাঙতে চাওয়া হয়। আবার অন্যদিকে, অঙ্গদ ও অন্যান্য বানরের বীরত্বের প্রথাগত ইমেজের সাথে তাদের ফুল কুড়ানোর ছবিটি একেবারেই বেমানান। এর ফলে এদেরকেও অতি সাধারণ স্তরে আনা হল।

(খ) 'মূল-রামায়ণ' গল্পে হনুমান যেমন একলাফে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় পৌঁছেছে, তেমনি আবার সীতাকে সঙ্গে করে একলাফে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কা থেকে ফিরেও এসেছে, যাতে যুদ্ধে অযথা কালক্ষেপ না হয়। আমরা সেই অংশের ছবিটা লক্ষ করব –

সীতা "তবে চলো বৎস" ব'লে হনুমানের পিঠে বসেছেন। লঙ্কা ছেড়ে যাওয়ার জন্য সীতা প্রস্তুত। তখন,

> হনুমানও যোগবলে পুনরায় রকেটাকৃতি হয়ে "হেঁইওঃ" বলে টেক-অফ করলেন। হনুমানের সেই অমানুষিক উল্লম্ফনে যে প্রচণ্ড বায়বীয় সংঘর্ষ হলো আকাশে বাতাসে, সেই এলোমেলো বায়ুচাপের ফলে স্বর্ণলঙ্কায় অকস্মাৎ আগুন ধরে গেল[৩৭]

এই চিত্রকল্পে দুবার দু'ধরনের সীমালঙ্ঘন আমরা দেখতে পাচ্ছি –

i. পুরুষের চাপিয়ে দেওয়া সতীত্বের মেকি সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে থাকেননি সীতা। সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধির অনুসরণ ক'রে সীতা লঙ্কা থেকে উদ্ধার পাওয়ার সহজ পথকেই বেছে নিয়েছেন। হনুমানকে 'পর পুরুষ' নয়, বরং সন্তানসম দৃষ্টিতে দেখে তার পিঠে উঠে লঙ্কা ছেড়ে রামের কাছে ফিরে গেছেন অনায়াসে।

ii. হনুমানের রকেটাকৃতি হয়ে টেক-অফ করার ফলে উদ্ভুত বায়বীয় সংঘর্ষকেই স্বর্ণলঙ্কায় আগুন ধরে যাওয়ার কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা বাল্মীকি রামায়ণে বর্ণিত স্বর্ণলঙ্কায় আগুন ধরার পরিচিত তথ্যের সীমা লঙ্ঘন ক'রে নতুন তথ্যের সরবরাহ করছে।

(গ) 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'সীতার পাতাল প্রবেশ' গল্পে দেখা গেছে সীতার পাতালে প্রবেশ করার ব্যাপারটি আদৌ সীতার ইচ্ছাধীন ছিল না। একটু আগে আমরা দেখেছি [দ্র. ১.৩.২.৩-এর (খ)], রামই একটি ক্ষুদ্র বোতাম টিপে সীতাকে সিংহাসনসহ পাতালে নামিয়ে দিয়েছেন। তার কারণ, গল্পে এই ঘটনার ঠিক আগেই সীতার বক্তব্যে আমরা পুরুষশাসিত সমাজে দাঁড়িয়ে পুরুষের অন্যায়কার্যের বিরুদ্ধে এক নারীর বাকস্বাধীনতার প্রথা-

মাফিক 'সীমা' লঙ্ঘনের স্পর্ধা দেখতে পাই । বিনা অপরাধে স্বামী-সংসার-রাজবধূসুখ বঞ্চিত আশ্রমবাসী সীতা স্বামীকে একজন প্রবঞ্চক, জনপ্রিয়তালোলুপ, তঞ্চক, দুর্বল চরিত্র, অধার্মিক, নির্দয় বলে প্রতিপন্ন করেছেন। এই সময় সীতার যে মুখচ্ছবি আমরা দেখি, তা এরকম –

> সীতার চক্ষে একঝলক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বললো। সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাফলের মতো চকচকে গালে একবিন্দু অশ্রুও গড়িয়ে পড়লো।[৩৮]

ক্রোধ, অপমানের জ্বালা আর নিদারুণ কষ্টের সম্মিলিত অনুভূতির প্রকাশ। সীতার মধ্য দিয়ে এমন এক নারীর চালচিত্র আমরা পেয়েছি, যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দাঁড়িয়ে সর্বময় কর্তৃত্বের বিচারের নামে নারীর অপমান ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছে। এছাড়া ১.৩.২.৩-এর (ক) অংশে ব্যাখ্যাত চিত্রকল্পেও আমরা সীতার যুক্তিবাদী, প্রতিবাদী মূর্তি দেখেছিলাম। এই সবকিছু আসলে সামাজিক পরিমণ্ডলে একজন নারীর এতদিনকার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে যাওয়ার বার্তা দেয়।

(ঘ) 'সীতার পাতাল প্রবেশ' গল্পে রামকে যেভাবে চিত্রিত হতে দেখি, তাতে রাম কার্যত একজন খলনায়কে পরিণত হয়েছেন। লেখিকা গল্পে স্পষ্টতই বলেছেন,

> প্রেম যখন প্রতিহিংসায় পরিণত হয় তখন তার চেহারা অতি বীভৎস।[৩৯]

প্রতিহিংসার সেই বীভৎসতাই আমরা প্রত্যক্ষ করি চিত্রকল্প [দ্র. ১.৩.২.৩-এর (খ)]-এর মধ্য দিয়ে। হিন্দুজনমানসে চিরবন্দিত, শ্রদ্ধেয়, পূজিত রামমূর্তি এক লহমায় ভেঙে পড়ে। এ নিঃসন্দেহে লেখিকার স্পর্ধার পরিচায়ক। তিনিই সনাতন ধর্মের ভাবাবেগের সীমা লঙ্ঘন করে ধর্মীয় চরিত্রের বিনির্মাণ করেছেন। কিন্তু কেন তিনি এরকমটা করলেন? আসলে পুরুষ কর্তৃক স্বীয় পত্নীকে অসম্মানের ইতিহাস সুপ্রাচীন। রামায়ণ প্রণয়নের যুগেও তা অতি মাত্রায় বিদ্যমান। অধিকাংশ পাঠক যতই ভক্তহৃদয়ের দৃষ্টি নিয়ে রামায়ণ পাঠ করুন না কেন, সেই

পাঠের খাঁজে খাঁজে মিশে থাকা এক সামাজিক ইতিহাসকে প্রকট করে নবনীতার কলমের চিত্রকল্প।

(ঙ) 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'অভিজ্ঞানদুষ্মন্তম্' গল্পে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে না-চেনার ভান ক'রে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেননি। তখন অন্য দুই নারী শলভা ও লোলাপাঙ্গী দুষ্মন্তকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যারপরনাই পর্যুদস্ত করেছে। একজন রাজাকে দুই নারী যেভাবে নাকাল করেছে, সে-দৃশ্য নিঃসন্দেহে প্রচলিত সমাজরীতির সীমালঙ্ঘনের চিত্রকল্পজাত। তারা কৌশলে ষণ্ডাগুণ্ডা দিয়ে রাজা দুষ্মন্তকে মার খাইয়েছে –

> ... অন্ধকার থেকে দুটো ষণ্ডাগুণ্ডা, গুঁফো, নেংটিপরা পহেলবান বেরিয়ে এসে মহারাজকে "হেঁইও" বলে মাটিতে ঠেশে ধরেছে -। শুধু কি তাই? "মার শালাকো। মার শালাকো।" বলে চেঁচিয়ে পাড়া ফাটিয়ে ফেলেছে। একজন তাঁর হাত মুচড়ে বৈদূর্যমণিটি কেড়ে নিয়েছে, এবং চেঁচাচ্ছে "মিল গিয়া মিল গিয়া একঠো চোরাই মাল মিল গিয়া"। অন্যজন ততক্ষণে রাজামশাইয়ের বুকে উঠে বসেছে এবং তাঁর দাড়ি টানতে টানতে পরিষ্কার যবন ভাষায় বলছে – "কী হে বাছাধন। বের করো এবারে বাকি মালকড়ি সব? ..." [৪০]

পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কৌশলে রাজাকে তাঁর কৃত অন্যায়ের শাস্তি স্বরূপ প্রহার করে সমুচিত শিক্ষা দিচ্ছে, এমন চিত্রকল্পের নির্মাণ প্রথাগত সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের দৃষ্টান্ত।

(চ) সীমালঙ্ঘনের ছবি দেখা যায় 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের 'মাতৃয়ার্কি' অংশেও। একটি পরিবার বলতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যা আশা করে তা হল, স্বামী, স্ত্রী এবং তাদের সন্তান – পরিবারে এই তিন ধরনের সদস্য থাকবে এবং সেই সঙ্গে আরও কেউ-কেউ থাকতে পারে কিংবা নাও থাকতে পারে। কিন্তু নবনীতা এই সামাজিক প্রত্যাশার চেনা গণ্ডীর বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পারিবারিক চিত্র এঁকেছেন। তাঁর অঙ্কিত পারিবারিক চিত্রে কোনো পুরুষ নেই। সেখানে দেখা যায়, একজন অশীতিপর বৃদ্ধা, তাঁর একটি মধ্যবয়সী অধ্যাপক মেয়ে এবং

স্কুল-কলেজে পড়া দুটি নাতনী – প্রথমজন বিধবা, দ্বিতীয়জন বিবাহবিচ্ছিন্না, তারপর দুজন অবিবাহিতা। আর আছে দুয়েকটি পোষ্য। পুরুষবিহীন সংসারে তাঁদের প্রাত্যহিকতার বিচিত্র ছবি ধরা আছে 'মাতৃয়ার্কি' পর্বের গল্পগুলিতে। যেমন – মা-মেয়ের হালকা বাদানুবাদের দৃশ্য, দামী শাল চুরি যাওয়ায় মেয়ের খেদ প্রকাশ ও মায়ের তাকে সবকিছু 'পজিটিভলি' ভাবতে শেখানো, দুই নাতনী ও তাদের মায়ের সিনেমা দেখতে যাওয়া কিংবা চিনা রেস্টোরেন্টে নৈশভোজে যাওয়া, বাইরে থেকে ফুচকা খেয়ে আসায় "মা হয়ে পদে পদে এরকম অবিমৃষ্যকারিতার শিকার হলে সন্তানরাই বা কী শিখবে" ব'লে বৃদ্ধা মায়ের শাসন ইত্যাদি।

সুতরাং, পুরুষহীন হলে একটি পরিবার কোনোমতে টিকে থাকে – সমাজের এই প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির সীমা লঙ্ঘন ক'রে নবনীতা এমন একটি পুরুষহীন পরিবারের ছবি দেখিয়েছেন, যেখানে একের পর এক বর্ণনাধর্মী চিত্রকল্পে দেখা যায় পরিবারের সদস্যরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে, তারা প্রত্যেকেই আর পাঁচটা পুরুষযুক্ত পরিবারের মতোই সাংসারিক নানাবিধ সমস্যা ও সমস্যার সমাধান, দুঃখ-হাসি-আনন্দ নিয়েই রীতিমতো বেঁচে আছে। অনুরূপ ছবি তাঁর আরও অনেক গল্পে পাওয়া যায়। যেমন – 'নাট্যারম্ভ' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর', 'খগেনবাবুর পৃথিবী এবং অন্যান্য' গল্পগ্রন্থের 'নিমন্ত্রণরক্ষা' প্রভৃতি।

লেখিকার নিজের কথায়,

> … here was not only a microcosm, but also a so-called dysfunctional family which functions extremely well. It's not dysfunctional, it's just a family without men.[৪১]

এইরকম পুরুষবিহীন পরিবারের গল্পগুলো পাঠক কীভাবে উপলব্ধি করেন, সেই সংক্রান্ত বিশ্লেষণ আছে সন্দর্ভের অষ্টম অধ্যায়ে [দ্র. ৮.৩]।

(ছ) নবনীতার উপন্যাসে মেয়েরা ভীষণভাবে স্বাধীনচেতা। তারা প্রত্যেকেই নিজের-নিজের শর্তে বাঁচে। কেউই পুরুষের মুখাপেক্ষী নয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ প্রেক্ষাপটে এই মেয়েরাও

সীমালঙ্ঘনের একেকটি চিত্রকল্প তৈরি করে। যেমন – ‘স্বভূমি’ উপন্যাসের আলো, ‘ফিনিক্স’ উপন্যাসের বিপাশা, ‘প্রোপাইটার’ গল্পের শুভমিতা, ‘হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ’ গল্পের কিম্বার্লি মেসন, ‘নাট্যারম্ভ’ গল্পের কারুবাকী ও তার মা শমিতা দাশগুপ্ত, ‘পরভৃৎ’ গল্পের সরমা, ‘অ্যালবাট্রস’ উপন্যাসে পদ্মিনী সিং, ‘ঘূর্ণি’ উপন্যাসের রিমঝিম প্রভৃতি। এদের মধ্য থেকে নিচে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল –

‘ফিনিক্স’ উপন্যাসের পরিণত, মধ্য বয়সী বিপাশা অ্যান্ডারসন দুটি শক্তির জোরে বাঁচেন – মেধা আর যৌবন। যৌবনের শক্তিতে তিনি আজও পুরুষের কাছে আকাঙ্ক্ষিত এবং মেধার শক্তিতে সারা পৃথিবীর কাছে সমাদৃত। সন্তানের জন্ম দিলেও মাতৃত্বের কোনো টান অনুভব করেন না বিপাশা। বলা যায়, বিপাশার মতো চরিত্র বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

> সর্বদা তাঁর প্রণয়ীরা তাঁর চেয়ে ছোট, শুধু বয়সে নয়, সমস্ত দিক থেকেই। তারা তাঁর দিকে মুগ্ধ-ভক্তের চোখ তুলে তাকায় পূর্ণ মনোযোগে। সেটাই তাদের ইউএসপি। বিপাশার সেটা চাই।[৪২]
>
> … … … …
>
> কড়া রোস্টেড কফির তাজা গন্ধ, তিক্ত কষা পুরুষালি স্বাদ, তাঁর পছন্দ।[৪৩]

উদ্ধৃত শেষ বাক্যটিতে যে গন্ধ ও স্বাদের ইন্দ্রিয়বিপর্যয়ী চিত্রকল্প ধরা দেয়, তা আসলে বিপাশার নিজস্ব রুচি, তীব্র প্যাশন তথা সার্বিক চরিত্রবৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করে।

১.৩.৩.২. *চিত্রকল্পে ধৃত পুরুষতান্ত্রিক অবদমন* **(patriarchal oppression)**-*এর স্বরূপ*

(ক) ‘সীতার পাতাল প্রবেশ’ গল্পের অপমানিত সীতা আদৌ পাতালে প্রবেশ করার কথা উচ্চারণ করেননি, বরং সভাস্থল ত্যাগ ক’রে তিনি বাল্মীকির সঙ্গে আশ্রমে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাম তাঁকে শেষ পর্যন্ত বাঁচতে দেননি, মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছেন। স্ত্রীলোকের

প্রগলভতা, তার মুখের কঠোর সত্য ভাষণ সহ্য করতে পারেননি রাম। গল্পে এই অংশের দৃশ্যগ্রাহ্য ছবিটি আমরা দেখব,

> সীতার বাক্য শেষ হলো না।
>
> রামচন্দ্রের বাঁদিকে একটি ক্ষুদ্র বোতাম ছিল। বিশ্বকর্মার অপূর্ব সৃষ্টি। তিনি বোতামটি টিপে দিলেন, স্বর্ণসিংহাসন সমেত সীতা রসাতলে নেমে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে উপরের মর্মরবেদী আবার যেমন-কে-তেমন জুড়ে গেল।[৪৪]

এই দৃশ্য দেখার পর সভার সকলে একবাক্যে চিৎকার করে জয়ধ্বনি দিল –

> জয় সতীলক্ষ্মী সীতামায়ের জয়। জয় ইক্ষ্বাকুবংশের জয়।[৪৫]

এভাবে সীতার সতীত্ব পরীক্ষার নামে তাঁকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়ার বিনিময়ে রাজা রামের বংশগৌরব বৃদ্ধি হয়। আর অন্যদিকে –

> স্বর্ণসিংহাসন সমেত সীতাদেবী কিছু টের পাবার আগেই প্রাসাদনিম্নস্থ সুড়ঙ্গ দিয়ে সরযূর তীব্র ঘূর্ণ্যমান স্রোতে মিশে গেলেন।[৪৬]

(খ) ‘মূল-রামায়ণ’ গল্পে দেখা যায়, বাল্মীকিকে উচিত কথা বলার মাশুল সীতাকে জীবনভর গুনে যেতে হয়। এই গল্পে সীতা হনুমানের পিঠে চ’ড়ে সুদূর লঙ্কা থেকে এক লহমায় রামের কাছে চ’লে আসতে পারলেও, তাঁকে বাল্মীকির কথায় আবার ফিরে যেতে হয় অশোকবনে। কারণ, সীতা এত অনায়াসে ফিরে আসলে বাল্মীকি আদিকাব্য রচনা করতে পারবেন না, রামের বীরত্ব ঘোষিত হবে না এবং হনুমানের পিঠে আরোহন ক’রে আসার জন্য সীতার সতীত্বের চিরসুখ্যাতি নস্যাৎ হবে। গল্পটি যেহেতু বাল্মীকি-রামায়ণের সম্ভাব্য বিকল্প কাহিনি, তাই বাল্মীকি সীতাকে তুচ্ছ কারণে পুনরায় লঙ্কায় প্রত্যাগমনের নির্দেশ দেন এবং সীতা বিরোধিতা করেন। সীতা এখানে যুক্তিবাদী, প্রতিবাদী, দৃঢ়চেতা ও স্পষ্টবাদী, যা

পুরুষশাসিত সমাজে বড্ড বেমানান। তাই বাল্মীকির উক্তিতে পুরুষতন্ত্রের ক্রূর চেহারা তার দাঁত নখ বের ক'রে দেখা দেয় –

> বাল্মীকি দাঁতে দাঁত চেপে সব দেখলেন। আর মনে মনে বললেন – "বড্ডো তেজী মেয়েমানুষ, না? আচ্ছাঃ, আমিও মহাকবি বাল্মীকি। দেখে নেবো। স্বামীর কোলে বসে বসে মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনা? হবে। হবে। - তোমার কী হাল করি, তুমি দেখো। একেবারে আমার সেই ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর অবস্থা করে ছেড়ে দেবো। কলম যার হাতে, ভবিষ্যৎ তার হাতে!"[৪৭]

বাল্মীকির দাঁতে দাঁত চাপার দৃশ্য যেমন আমরা দেখতে পাই, তেমনি তাঁর কথায় রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরও আমরা শুনতে পাই। এরপরেই আসে গল্পের শেষ বাক্য –

> তারপর তো সবাই জানি সীতার কী কী হয়েছিলো।[৪৮]

বাল্মীকি তাঁর কলমের আঁচড়ে হনুমানকে দিয়ে এক লাফে সমুদ্র পাড়ি দেওয়ালেন, অথচ সীতাকে সেই সহজ উপায়ে ফেরত আনেননি। সীতার সহস্র অশ্রুবিন্দুর বিনিময়ে রামের বিজয়কেতন উড়েছে। তবু শেষ পর্যন্ত কখনোই আর রাম-সীতার মিলন চিরস্থায়ী হতে পারেনি। তাঁরা যতবার মিলিত হতে চেয়েছেন, ততবার বিচ্ছেদ এসেছে। বলা বাহুল্য, বাল্মীকি চরিত্রের এই নবনির্মিত চিত্রকল্প তাঁর সনাতন ইমেজের প্রতিস্পর্ধী।

(গ) 'রাজকুমারী কামবল্লী' গল্পে পাই পুরুষতান্ত্রিকতার আরও সূক্ষ্ম স্তরের চিত্রকল্প। সেখানে দেখা যায়, পুরুষশাষিত সমাজে প্রতিপালিত নারীর অন্তর্জগতে পর্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক অবদমনের চেহারা নিতান্ত স্বাভাবিক ব'লে পরিগণিত হয় (internalized patriarchal oppression)। অপমানিত, প্রতারিত, আহত শূর্পণখার ক্ষতস্থানে শুশ্রূষা ক'রে সীতা তাকে প্রবোধ দিতে দিতে বলেন –

> প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, এ তো এই নারী-জীবনের অঙ্গ, ভগ্নী কামবল্লী, এতে ভেঙে পড়তে নেই।[৪৯]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শিক্ষায় প্রতিপালিত নারীর অস্তিত্বের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকে এই মানসিকতা। পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের শিকার 'রাজকুমারী কামবল্লী' গল্পের সীতার মতো মেয়েরা।

বাল্মীকি, রাম, সীতা ও শূর্পণখা চরিত্রের বিনির্মাণ এবং পাঠকের সংশ্লিষ্ট বোধের প্রকৃতি নিয়ে সবিশেষ বিশ্লেষণ আছে সন্দর্ভের নবম অধ্যায়ে [দ্র. ৯.৩.২]।

(ঘ) পুরুষশাসিত সমাজে নারী যে কতখানি পুরুষের হাতের পুতুল, তার ছবি ফুটে ওঠে 'অমরত্বের ফাঁদে' গল্পে। সেখানে রাম যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণকে মৃতপ্রায় অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখে বিলাপ করতে করতে বলেন –

> হায় জানকী, তোমার জন্যই আজ আমাদের পরিবারের এই দুরবস্থা। তুমি বাইরের মেয়ে, পর। তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে আজ আমি ঘরের ছেলেকে হারালাম। বউ গেলে নতুন বউ হয়, এটা কোনো ব্যাপারই নয়, কিন্তু পিতার স্বর্গলাভের পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গেলে নতুন ভ্রাতা তো আর পাওয়া যায় না।[৫০]

কথাগুলো সীতা স্বকর্ণে শুনেও রামের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের বশে প্রাথমিকভাবে রাবণের ছলচাতুরী মনে করেন। পরে ক্রমশ যখন প্রকৃত সত্যোপলব্ধি হয়, তখন তিনি আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন। ঠিক তখনই নারদমুনির আবির্ভাব হয়। সীতার প্রতি তাঁর উপদেশ -

> এখনই মরবেন কেন? ... পুরুষমানুষ মাত্রেই পত্নীর আড়ালে-আবডালে অমন কত কথাই বলে থাকে। সে সবই যদি আজ জগতের পত্নীদের শ্রুতিগোচর হতো তবে সংসারে একটিও দম্পতি একত্রে বসবাস করতো না। আপনি ওসবে কর্ণপাত করবেন না। তাছাড়া, শোকের বশে তো মানুষ কতোই ভুল বকে।[৫১]

পুরুষের যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতিকে এভাবেই লঘু ক'রে দেখতে শেখায় এই সমাজ। আর এভাবেই নারীকে তার দৈহিক মৃত্যু থেকে রক্ষা ক'রে প্রতিদিনের মৃত্যুসম মানসিক যন্ত্রণার স্থায়িত্বকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। গল্পে নারদের যে ইমেজ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তার মাধ্যমে লেখিকা তাঁকেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আরেক ধ্বজাধারী হিসাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন।

১.৩.৩.৩. *চিত্রকল্পে ধৃত নারীর অস্তিত্ব-সমস্যা* ***(existential problem)***

এই জাতীয় চিত্রকল্প বিশেষভাবে দেখা গেছে 'সীতা থেকে শুরু'-র প্রথম পর্ব 'পৌরাণিকী'-তে। বিচ্ছিন্নতা, বাসস্থানের অভাব, নতুন পরিবেশে অভিযোজন, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি অস্তিত্ব-সমস্যা তৈরি করে। নবনীতার গল্পের মহাকাব্যিক নারীচরিত্রগুলি নিজেদের অস্তিত্ব-সমস্যার অবুঝ নীরব বলিমাত্র নয়। তারা এই সমস্যাকে নিজেরাই চিহ্নিত করতে পারে। এর ফলে সীতা, শূর্পণখা, অম্বা, লোলাপাঙ্গী প্রভৃতি চরিত্র – কখনো আগ্রাসী, কখনো নতস্বভাবযুক্ত হলেও আদর্শবাদী, কখনো আবার আগ্রাসী ও আদর্শবাদী উভয়ই, আবার কখনো একেবারেই নিষ্ক্রিয় ও নতস্বভাবযুক্ত।

আমরা বর্তমান অধ্যায়ে একটিমাত্র উদাহরণ দেখব, যেখানে সীতা উপরোক্ত চার শ্রেণির মধ্য দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত। অর্থাৎ, সীতা নতস্বভাবযুক্ত হলেও আদর্শবাদী। 'রাজকুমারী কামবল্লী' গল্পে শূর্পণখা রাম ও লক্ষ্মণের দ্বারা প্রতারিত হয়ে সীতাকে ভগ্নী-জ্ঞানে তাদের মন্দ স্বভাব সম্পর্কে সচেতন করে গেলেও সীতা তার কথা ততটা বিশ্বাস করেননি। কিন্তু পরমুহূর্তেই সীতার বুঝতে বাকি থাকে না যে শূর্পণখার কথা কতখানি সত্য এবং তাঁর চির-ভরসার আশ্রয়স্থল দুটির (স্বামী ও দেবর) ভিত আসলে কতখানি দুর্বল। সীতা আড়াল থেকে শুনতে পান যে তাঁর স্বামী রাম আর দেবর লক্ষ্মণ সদ্য অঙ্গহীনা নারীর যৌবনযন্ত্রণা ও তার চিকিৎসা বিষয়ে যুবকোচিত হাস্যপরিহাসে মেতে উঠেছেন। এই সময়ে সীতার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, তার ছবিটি নিম্নরূপ –

> বাইরে থেকে দুই রাজপুত্রের রঙ্গরসিকতায় প্রাকৃতরুচির পরিচয় পেয়ে সীতার কর্ণস্থল লাল হয়ে উঠলো। মর্মাহত সীতা কুটিরদ্বারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর ওষ্ঠাধর ঈষৎ ফাঁক হলো এবং কম্পিত হতে লাগলো, ভ্রূ কুঞ্চিত হতে লাগলো। সহসা অসহায় বোধ করে সীতা কামবল্লীর শেষ কথাগুলি স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন।[৫২]

এই যে একটি দৃশ্যধর্মী চিত্রকল্প ফুটে উঠল, এখান থেকে স্পষ্ট যে সীতা তাঁর স্বভাববশত বিনয়ী ও নত হলেও, নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন। প্রথার বিরোধিতা করতে না-পারলেও, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিষয়ে, নারীর প্রকৃত সম্মান বিষয়ে তাঁর একটা আদর্শ আছে।

১.৩.৩.৪. চিত্রকল্পে ধৃত সংস্কৃতিগত সন্নিধান **(Cultural Juxtaposition)**

নবনীতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পটভূমিতে বেশ কিছু উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণ করেছেন। এইসব উপন্যাসে আমরা অভিবাসী ভারতীয় পরিবারের ছবি পাই। ফলে অনেক সময় পাশ্চাত্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির তুলনামূলক ছবি ফুটে ওঠে।

'স্বভূমি' উপন্যাসে হেমনলিনী মুখোপাধ্যায় বছরের বেশ কয়েক মাস আমেরিকায় ছেলেমেয়ের কাছে থাকেন আর বাকি কয়েক মাস কলকাতায়। সংস্কৃতিগত সন্নিধানের ছবি মেলে হেমনলিনীর কথায় –

> রান্নাঘর বলতে আজন্মই জেনেছি – ঘুপচি অন্ধকার, অ্যালামাটি রং করা, ঝুলকালি লাগা নিচু ছাদের, গরমে ভ্যাপসা, আরশোলা ভরতি একটা বিশ্রী ঘর। ছেলেমেয়েদের রান্নাঘরে গিয়ে দেখি মার্বেল পাথরের মেঝে, স্টেনলেসের লম্বা লম্বা টেবিল, স্টেনলেসের ডবল বেসিন, তাক, রঙিন পালিশ করা ঝকঝকে নতুন সব সানমাইকার তাক, আর কাবার্ড, কতরকমের ইলেক্ট্রিক যন্ত্রপাতি ... একটা মিনি-টেবিলফ্যান ঘুরছে সবসময়।[৫৩]

বিদেশী সংস্কৃতির আরও ছবি পাওয়া যায় নবনীতার 'দ্বিরাগমন', 'ফিনিক্স', 'দেশান্তর', 'অ্যালবাট্রস'-এর মতো উপন্যাসগুলিতে এবং 'হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ', 'সেদিন দুজনে', 'দেশে যাওয়া'-র মতো নানা স্বাদের গল্পে। সন্দর্ভের দশম অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে [দ্র. ১০.৩.২]।

১.৩.৩.৫. চিত্রকল্পে ধৃত প্রজন্মগত ব্যবধান (generation gap)

নবনীতার একাধিক গল্প-উপন্যাসে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চাল-চলন, পছন্দ-অপছন্দের পার্থক্য দেখানো হয়েছে। প্রজন্ম পালটালে যে রুচির বদল হওয়া খুব স্বাভাবিক, তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু নবনীতা এই বিষয়টিকেই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বারবার তাঁর বিভিন্ন লেখায় তুলে ধরেন। এমনকি চিত্রকল্পেও তা কখনও কখনও ধরা দেয়। যেমন –

'স্বভূমি' উপন্যাসে প্রৌঢ়ত্বের দিকে পা-বাড়ানো ফ্রেডরিক নিকলসন দুই ভিন্ন প্রজন্মের ছাত্রদের মানসিকতার প্রভেদ নিয়ে কথা বলেন –

> ইউনাইটেড স্টেটসের একটা নব যৌবন এসেছিল ষাটের দশকে, যখন আমরা ছাত্র। ... লুইজিয়ানার গ্রামের ছেলে, আর ভারতবর্ষের শহুরে মেয়ে একসঙ্গে দিনের-পর-দিন সিট্-ইন্ ডেমনস্ট্রেশন করেছি ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে। আর এখন? ইউনাইটেড স্টেটসের ছাত্ররা আর দাড়ি রাখে না। বোতাম-খোলা শার্ট পরে না। চটি পায়ে হাঁটে না। তারা ছোট করে চুল ছাঁটে, রোজ দাড়ি কামায়, জুতো-মোজা পরে শার্টের বোতাম এঁটে ভাল মাইনের চাকরির সন্ধান করে বেড়ায়। এ একটা নতুন প্রজন্ম – এঁরা কেবল নিজেরা ভালভাবে থাকার কথা ভাবে।[৫৪]

'নাট্যারম্ভ' গল্পে দেখা যায়, বন্দনা অবাক হয়ে যান তাঁর ছেলে প্রেমিকাকে "তুই" ক'রে কথা বলছে ব'লে। মনে মনে নিজেদের প্রজন্মটাকে তুলনা ক'রে নেন। তাঁদের সময় "তুই" বলা মানে ছিল বন্ধুত্ব আর "তুমি" মানেই সংশয়জনক অবস্থা। প্রজন্মগত ব্যবধান 'নাট্যারম্ভ' গল্পের আরেক প্রৌঢ়া শমিতা দাশগুপ্তের কথাতেও স্পষ্ট –

> আজকাল তো বউদেরই দিন। আমাদেরই হয়েছে মুশকিল। শাশুড়িকেও ভয় পেয়েছি, আবার বউকেও ভয় পেতে হবে। আমরা মাঝের জেনারেশন তো চেপ্টে গেছি।[৫৫]

১.৩.৩.৬. *কৌতুকময় (absolute fun) চিত্রকল্প*

চিত্রকল্পের শ্রেণি নির্ণয়কালে কৌতুক চরিত্রের কথা বলা হয়েছে। এখন আমরা কোনো বিশেষ চরিত্র নিয়ে আলোচনা করব না। বরং, বোঝার চেষ্টা করব কীভাবে একটা চিত্রকল্প আদ্যন্ত কৌতুকময় হতে পারে। প্রকারের বিচারে এগুলি অধিকাংশ সময়ই বর্ণনাধর্মী। বিভিন্ন গল্পে লেখিকা নিজেকে নিয়েও কৌতুককর চিত্রকল্প তৈরি করেন। যেমন –

(ক) 'নিমন্ত্রণরক্ষা' গল্পে লেখিকা দুর্গাপুর স্টেশনের প্লাটফর্মে তাঁর সাহিত্যের একজন ভক্তকে পেয়ে মনে মনে অতিশয় আপ্লুত হলেও, মনের ভাব বাইরে গোপন রাখার ছবিটি ফুটে ওঠে নিম্নরূপে –

> আমি "এ আর এমন কি – এমন ফ্যান তো আকচার মেল-ট্রলিতে বসেই থাকে" – এমনি মুখে দূরে সিগনাল পোস্টের দিকে চেয়ে থাকি। উদাস-উদাস। লেখক-লেখক ভাব করে।[৫৬]

(খ) 'নিমন্ত্রণরক্ষা' গল্পেরই আরেকটি দৃশ্যগ্রাহ্য চিত্রকল্প এই প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে। লেখিকা, তাঁর ভাই এবং দুই মেয়ের প্রচণ্ড ভিড় বাস থেকে নামার দৃশ্য –

> বাস থামল। সবাই মিলে আমাকে ব্যাগ আর ছাতা সমেত নামিয়ে দিলে। টুম্পা, পিকো, দীপু সকলেই দেখি টুপটাপ বাস থেকে খসে পড়ল। ... প্রত্যেকের চুল উস্কোখুস্কো, আমার চশমা ব্যাঁকা, দীপুর প্যান্টে গোঁজা শার্ট বেরিয়ে পড়েছে – টুম্পার চুলের রিবন খুলে এসেছে। ফ্রকের হাতা বাঁ কাঁধ থেকে ঝুলছে একধারে। পিঠের বোতাম খোলা।[৫৭]

(গ) 'মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর' গল্পে দেখা যায়, নবনীতা প্রথমবার মোপেড চালাতে শুরু করেছেন মেয়ের প্রশিক্ষণে। মোপেড চালাতে শুরু করার পর তাঁর চারপাশে কার কী প্রতিক্রিয়া এবং সেই অনুযায়ী তাদের মিলিত চিৎকারে যে শ্রুতিগ্রাহ্য ইমেজের কোলাজ তৈরি হয়, তা লেখিকার ভাষায়–

> চেঁচাচ্ছি আমরা অবশ্য সকলেই, কিন্তু ঠিক ঐকতানে নয়। যে যার স্বকীয়তা বজায় রেখে। একেই কি বলে হার্মনি?[৫৮]

এদের মধ্যে কারোর কণ্ঠে উৎসাহ, কারোর কণ্ঠে হুশিয়ারি, কারোর-বা উদ্বেগ, কারোর আবার হতচকিত ভাব, আবার কেউ শুধুই নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকায়। আর মোপেড চালক নবনীতার কণ্ঠে একরাশ আতঙ্ক। সেই সঙ্গে মিশে যাচ্ছে মোপেডের 'ভটর ভটর ভ্যাট ভ্যাট' আওয়াজ। এই দীর্ঘ উত্তেজনাকর পরিস্থিতির অবসান হয় দৃশ্যের চিত্রকল্পে –

> পাখির মতো উড়ে গিয়ে আমার মোপেড সেই ঐশ্বরিক বালুকাবেলায় সজোরে ঢুকে পড়লো। মোপেডসুদ্ধু আমি বালির মধ্যে নিঃশব্দে পড়ে গেলুম। ... বালিতে শুয়ে শুয়ে মাথার ওপর চেয়ে দেখলুম, চাঁদের মুখখানা হাসি হাসি। নক্ষত্রের শ'য়ে শ'য়ে চোখ টিপুনি। কী গো? কেমন হলো? লাগলো কেমন? বেশ ভাই![৫৯]

তারপর "কপিলদেব ক্যাচ লুফে আউট করে দেবার পরে ইমরান খান যেভাবে আস্তে হেঁটে" প্যাভিলিয়নে ফিরতেন, সেরকম মাথা ঝুঁকিয়ে স্টাইলিশভাবে পা ফেলার চেষ্টা করতে করতে পায়ের অসহ্য যন্ত্রণা আড়াল ক'রে বাড়ি ফেরেন। এরকম আরও অনেকানেক কৌতুকময় চিত্রকল্প ধরা থাকে নবনীতার বহু গল্পে। তবে উপন্যাসে আমরা তেমন একটা কৌতুকধর্মী চিত্রকল্প পাই না, সেখানে সর্বত্রই সিরিয়াস বিষয়ের চিত্রকল্প। নিজেকে নিয়ে লেখা গল্পের এইসব কৌতুকময় চিত্রকল্পও আসলে পুরুষবিহীন সংসারে নারীর ভীষণভাবে বাঁচাকেই চিত্রিত করেছে। নারীস্বাধীনতা, নারীর আত্মপ্রত্যয়কে, অর্থাৎ এক কথায় নারীবাদী ভাবাদর্শকেই সমর্থন করে এইসব চিত্রকল্প।

১.৪. উপসংহার

নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে চিত্রকল্প প্রয়োগের সাতটি পৃথক ক্ষেত্র পাওয়া গেল – নারী চরিত্র নির্মাণ, কৌতুক চরিত্র নির্মাণ, মহাকাব্যিক চরিত্রের বিনির্মাণ, সময়ের ছবি নির্মাণ, পোষ্য

প্রাণীর চরিত্র বর্ণনা, বিবিধ পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টি এবং শরীরী প্রেম-অপ্রেম। যদিও তাঁর বিস্তৃত সাহিত্যের এলাকায় আরও কিছু কিছু ক্ষেত্র থাকাও অসম্ভব নয়, তবু উল্লিখিত সাতটি ক্ষেত্রই প্রধান বলে মনে হয়।

সাতটি ক্ষেত্রে ধরা দিয়েছে বিভিন্ন প্রকারের চিত্রকল্প। কোথাও পেয়েছি ইঙ্গিতধর্মী চিত্রকল্প, কোথাও তুলনাত্মক চিত্রকল্প, আবার কোথাও রয়েছে বর্ণনাধর্মী চিত্রকল্প। বাতাবরণ সৃষ্টিকারী চিত্রকল্পও নিতান্ত কম নয়।

একাধিক প্রকারের চিত্রকল্প যখন পরস্পর সংলগ্নভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেছে, তখন আমরা সেই দুই বা ততোধিক প্রকারের পারস্পরিক সম্পর্কের চেহারা দেখেছি ভেন ডায়াগ্রামের মাধ্যমে। বলার অপেক্ষা থাকে না যে চিত্রকল্পের ক্ষেত্র অনুসারে তার শ্রেণি চয়নের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি হয়নি। তেমন নিয়ম তৈরি করা সম্ভবও নয়। দক্ষ লেখনীর গুণে লেখার স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অবাধ গতিতে একেকটি চিত্রকল্প গড়ে উঠেছে। চিত্রকল্পগুলির যেসব শ্রেণিগত অবস্থান ভেন ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখানো হয়েছে, সেগুলি আসলে ওভাবেই পাঠকের বোধের জগতে গৃহীত হয়। পাঠকের চিত্রকল্প সংক্রান্ত বোধের বিষয়টির সবিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে রয়েছে।

নবনীতার সাহিত্যে চিত্রকল্পে নিহিত বিবিধ ধারণার অনুসন্ধান করতে গিয়ে মোটামুটি ছয় রকম ধারণার উপস্থিতি পাওয়া গেছে – সীমালঙ্ঘন, পুরুষতান্ত্রিক অবদমন, নারীর অস্তিত্ব-সমস্যা, সংস্কৃতিগত প্রভেদ, প্রজন্মগত ব্যবধান এবং কৌতুকময়তা।

বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা বুঝেছি যে নবনীতা দেবসেনের গল্প ও উপন্যাসে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের চিত্রকল্প শুধু যে শিল্পসুষমা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে তাই নয়, সেই সঙ্গে প্রতিটি চিত্রকল্প গল্প-উপন্যাসের সার্বিক মেজাজকে প্রকাশ করছে। যে গল্প কৌতুকপূর্ণ, সেখানে বিভিন্ন

প্রসঙ্গে কৌতুকধর্মী চিত্রকল্প দেখা গেছে, তা সে হতে পারে বর্ণনাধর্মী চিত্রকল্প কিংবা তুলনাত্মক চিত্রকল্প। আবার সিরিয়াস গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে চিত্রকল্পের আবেদন অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী। চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রেও চিত্রকল্পের প্রভাব চোখে পড়ার মতো। অনেকসময় একেকটি অভিনব চিত্রকল্পের মাধ্যমে নবনীতা পাঠককে একেকটি সাহসী ও স্বাধীনচেতা নারী চরিত্র উপহার দিয়েছেন। এছাড়া, অন্যান্য চরিত্র সৃষ্টিতেও চিত্রকল্প বিশেষ অবদান রেখেছে।

প্রতিটি চিত্রকল্প শেষ পর্যন্ত 'to some degree metaphorical'[৬০] হলেও, এমন অনেক চিত্রকল্প আছে, যেগুলিকে কেবলমাত্র চিত্রকল্প হিসেবে না-দেখে সুনির্দিষ্টভাবে মেটাফর হিসেবে বিবেচনা করাই ঠিক হবে। যেহেতু সন্দর্ভের নবম অধ্যায়ে বোধগত শৈলীবিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে, তাই ধারণাগত রূপক বা কন্সেপ্চুয়াল মেটাফরকে বর্তমান অধ্যায়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

চিত্রকল্পের মাধ্যমে ধৃত বিবিধ ধারণা শেষ পর্যন্ত লেখিকার কোন্ ভাবাদর্শকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়, আমরা সেটিও খানিক বোঝার চেষ্টা করব সন্দর্ভের দশম অধ্যায়ে (দ্র. ১০.৩.৪)।

১.৫. তথ্যসূত্র

১। F. S. Flint and Ezra Pound, "Imagism," in *The Modern Tradition*, ed. Richard Ellmann and Charles Feidelson Jr. (New York: Oxford University Press, 1965), 143.

২। I. A. Richards, *Principles of Literary Criticism* (London and New York: Routledge, 2001), 97.

৩। C. Day Lewis, *The Poetic Image* (London: Jonathan Cape, 1947), 18.

৪। Richards, *Principles of Literary Criticism*, 109.

৫। জীবনানন্দ দাশ, "বিড়াল," *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলকাতা: ভারবি, ২০১৪), ৬২।

৬। M. H. Abrams and G. G. Harpham, *A Glossary of Literary Terms* (Delhi: Cengage Learning, 2012), 393–94.

৭। Lewis, *The Poetic Image*, 40.

৮। শঙ্খ ঘোষ, *শব্দ আর সত্য* (কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮২), ৫৬।

৯। Lewis, *The Poetic Image*, 18.

১০। সুমিতা চক্রবর্তী, "মূর্তিতে কি দিবে ধরা," *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা*, বর্ষ ১৯৮৮-৮৯, সত্যবতী গিরি ও অন্যান্য সম্পাদিত, (কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা ৩, মার্চ ১৯৮৯), ২৪-৩৬।

১১। নবনীতা দেবসেন, *ফিনিক্স*, ২য় সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৫), ৯০।

১২। দেবসেন, *ফিনিক্স*, ২৬।

১৩। নবনীতা দেবসেন, "চাষি বউয়ের মেয়ে," *রূপকথা সমগ্র* (কলকাতা: পত্রভারতী, নভেম্বর ২০১১), ১৮২।

১৪। নবনীতা দেবসেন, "মেসোমশায়ের কন্যাদায়," *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২০০।

১৫। দেবসেন, "মেসোমশায়ের কন্যাদায়," ২০০।

১৬। নবনীতা দেবসেন, "স্পটলেস স্পটেড ডিয়ার," *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ১৩১।

১৭। নবনীতা দেবসেন, "মূল রামায়ণ," *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২১৭।

১৮। দেবসেন, "মূল রামায়ণ," ২১৮।

১৯। নবনীতা দেবসেন, "সীতার পাতাল প্রবেশ," *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২৪৬।

২০। দেবসেন, "সীতার পাতাল প্রবেশ," ২৪৬।

২১। দেবসেন, *ফিনিক্স*, ৪২।

২২। বেদব্যাস, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী অনূদিত, ৮ম সংস্করণ (শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী প্রকাশিত, নদীয়া: ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, ২০০৬), পৃ. ২৬৯।

২৩। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ২৭১।

২৪। নবনীতা দেবসেন, "আমি অনুপম," *দশটি উপন্যাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., জানুয়ারি ২০০৩), ৩৪।

২৫। নবনীতা দেবসেন, "প্রাণবিন্দুবাবুর খরগোশ," *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৯), ২৬।

২৬। দেবসেন, "প্রাণবিন্দুবাবুর খরগোশ," ২৭।

২৭। নবনীতা দেবসেন, “মঁসিয়ো হুলোর হলিডে,” *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৯), ১১।

২৮। নবনীতা দেবসেন, “স্কেচ ছয়,” *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২৮০।

২৯। দেবসেন, “স্কেচ ছয়,” ২৮১।

৩০। নবনীতা দেবসেন, “চাঁদ গড়ার কারিগর,” *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ৪৬।

৩১। নবনীতা দেবসেন, “মুখর নৈঃশব্দ্য,” *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ৩২২।

৩২। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৪৭।

৩৩। নবনীতা দেবসেন, “টাওয়ার অফ সাইলেন্স,” *দ্বিরাগমন*, ৩য় সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, জুন ২০১৭), ৮৩।

৩৪। চক্রবর্তী, “মূর্তিতে কি দিবে ধরা,” ৩৫।

৩৫। দেবসেন, *ফিনিক্স*, ৮১।

৩৬। দেবসেন, “মূল রামায়ণ,” ২১২।

৩৭। দেবসেন, “মূল রামায়ণ,” ২১৫।

৩৮। দেবসেন, “সীতার পাতাল প্রবেশ,” ২৪৪।

৩৯। দেবসেন, “সীতার পাতাল প্রবেশ,” ২৪৫।

৪০। নবনীতা দেবসেন, “অভিজ্ঞানদুষ্মন্তম্‌,” *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২৬০।

৪১। Nabaneeta Dev Sen, “MEET THE WRITER: ‘I wanted to write about sexuality, deception, loss, but I could not’: Writer Nabaneeta Dev Sen”, Interview by Ritu Menon, *Scroll.in*, accessed December 8, 2022, https://scroll.in/article/943817/i-wanted-to-write-about-sexuality-deception-loss-but-i-could-not-writer-nabaneeta-dev-sen.

৪২। দেবসেন, *ফিনিক্স*, ৩২।

৪৩। দেবসেন, *ফিনিক্স*, ৩৭।

৪৪। দেবসেন, “সীতার পাতাল প্রবেশ,” ২৪৬।

৪৫। দেবসেন, “সীতার পাতাল প্রবেশ,” ২৪৬।

৪৬। দেবসেন, “সীতার পাতাল প্রবেশ,” ২৪৬।

৪৭। দেবসেন, “মূল রামায়ণ,” ২১৮।

৪৮। দেবসেন, “মূল রামায়ণ,” ২১৮।

৪৯। নবনীতা দেবসেন, “রাজকুমারী কামবল্লী,” *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২২৮।

৫০। নবনীতা দেবসেন, “অমরত্বের ফাঁদে,” *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২৩২।

৫১। দেবসেন, “অমরত্বের ফাঁদে,” ২৩৫।

৫২। দেবসেন, “রাজকুমারী কামবল্লী,” ২২৯।

৫৩। নবনীতা দেবসেন, "স্বভূমি," *দশটি উপন্যাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., জানুয়ারি ২০০৩), ১০৮।

৫৪। দেবসেন, "স্বভূমি," ১১৮।

৫৫। নবনীতা দেবসেন, “নাট্যারম্ভ,” *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ১০০।

৫৬। নবনীতা দেবসেন, “নিমন্ত্রণরক্ষা,” *গল্পসমগ্র ৩*, ৪র্থ সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০২০), ২১।

৫৭। দেবসেন, “নিমন্ত্রণরক্ষা,” ২৭।

৫৮। নবনীতা দেবসেন, “মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর,” *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ১৫।

৫৯। দেবসেন, “মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর,” ১৮।

৬০। Lewis, *The Poetic Image*, 18.

দ্বিতীয় অধ্যায়

পাঠকের বোধে চিত্রকল্পের প্রবেশ ও প্রভাব

২. পাঠকের বোধে চিত্রকল্পের প্রবেশ ও প্রভাব

২.১. ভূমিকা

সাহিত্যিক যখন কোনও রচনা নির্মাণ করেন, সমালোচক-গবেষক যখন সেই রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খ উদ্ঘাটন করে দেখান কিংবা কোনও সাধারণ পাঠক যখন সেই রচনা পাঠ ক'রে হৃদয়ে অনুভব করেন, তখন এই তিন পক্ষের ক্ষেত্রেই তাঁদের নিজ-নিজ মন হয়ে ওঠে সাহিত্যচর্চার এলাকা। মনই যেকোনও সাহিত্য নির্মিতি এবং অনুধাবনের উৎসস্থল। সাহিত্যিকের নিজস্ব বোধগত সামর্থ্য (cognitive competence)-এর ছাপ দেখা যায় তাঁর সাহিত্য নির্মিতিতে। অন্যদিকে সেই নির্মিত সাহিত্য অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে পাঠকের বোধগত প্রক্রিয়া (cognitive process)-এর মাধ্যমে। আমরা তাই বর্তমান অধ্যায়ে অনুসন্ধান করব –

- নবনীতা দেবসেনের গল্প-উপন্যাসে ছড়িয়ে থাকা বিচিত্র চিত্রকল্প, যেগুলি আগের অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেইসব চিত্রকল্প পাঠকের বোধগত কাঠামোয় কীভাবে অংশ নিচ্ছে।
- চিত্রকল্প সৃষ্টির মাধ্যমে নবনীতা পাঠকের বোধের জগতে কীভাবে সাড়া ফেলতে চেয়েছেন।

এই দুই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য বোধগত শৈলীবিজ্ঞান (cognitive stylistics) আমাদের আদর্শ সহায়ক। কারণ বোধগত শৈলীবিজ্ঞানের প্রধান কাজই হল, পাঠক ঠিক কী প্রক্রিয়ায় কোনও একটি পাঠকে বুঝতে পারেন, তা যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতিতে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখানো। এই বিশ্লেষণের জন্য দু'টি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় – লেখার ভাষিক বৈশিষ্ট্য (linguistic features) এবং লেখার প্রসঙ্গ (context)। আমাদের মনে হতে পারে যে এই দু'টি বিষয়ের জন্য তো শৈলীবিজ্ঞানের পদ্ধতিই রয়েছে। কারণ যেকোনও ভালো শৈলীবিজ্ঞানী একটি পাঠের কেবল ভাষিক বৈশিষ্ট্য বিচার করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন না, সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট

প্রসঙ্গের নিরিখে ওইসব ভাষিক বৈশিষ্ট্য কতখানি উপযুক্ত হয়েছে এবং তা শেষ পর্যন্ত পাঠের সাহিত্যিক মূল্য বৃদ্ধির কতখানি সহায়ক হয়েছে, তাও খতিয়ে দেখেন। তাহলে বোধগত শৈলীবিজ্ঞান আলাদা কোথায়? ভাষাতাত্ত্বিক Elena Semino এবং Jonathan Culpeper-এর বক্তব্য উদ্ধৃত ক'রে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় –

> What is new about cognitive stylistics is the way in which linguistic analysis is systematically based on theories that relate linguistic choices to cognitive structures and processes. This provides more systematic and explicit accounts of the relationship between texts on the one hand and responses and interpretations on the other.[১]

আমরা তাই বর্তমান অধ্যায়ে বোধগত শৈলীর দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগিয়ে উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

২.২. পদ্ধতি

- ছকবদ্ধতা (schematicity)
- রূপক (metaphor)

২.২.১. ছকবদ্ধতা (schematicity)

ছক (schema) বলতে বোঝায়, কোনো ব্যক্তিবিষয় সম্পর্কে ঘটনা বা অন্য যেকোনো ,বস্তু , সুসংবদ্ধ নেপথ্য জ্ঞান। জ্ঞান তৈরি হয় বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও তথ্যের ভিত্তিতে। মানুষ তার চারপাশের জগৎ থেকে অভিজ্ঞতা আহরণ করে বিভিন্ন ভাব বা বস্তুর সাথে পুনরাবর্তনমূলক মূর্তকরণ (embodiment) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাসমূহ মানুষের বোধের স্তরে এক ধরনের ছকভিত্তিক দৃশ্যমানতার আবহ তৈরি করে। তথ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের এরূপ বিবিধ

ছক মনের মধ্যে এমন একটা সিস্টেমের জন্ম দেয়, যা ভবিষ্যতে সমজাতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার প্রাককালে ছয় রকমভাবে জ্ঞানের ছক বা স্কিমা বাইরের বিবিধ পরিবেশ পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। এগুলি হল – জ্ঞান পুনর্গঠন (knowledge restructuring), ছক সংরক্ষণ (schema preservation), ছক দৃঢ়ীকরণ (schema reinforcement), ছক বৃদ্ধি (schema accretion), ছক ভাঙন (schema disruption) এবং ছক নবীকরণ (schema refreshment)।

- knowledge restructuring – the creation of new schemas based on old templates.
- schema preservation – where incoming facts fit existing schematic knowledge and have been encountered previously.
- schema reinforcement – where incoming facts are new but strengthen and confirm schematic knowledge.
- schema accretion – where new facts are added to an existing schema, enlarging its scope and explanatory range.
- schema disruption – where conceptual deviance offers a potential challenge.
- schema refreshment – where a schema is revised and its membership elements and relations are recast (tuning, defamiliarisation in literature).[২]

২.২.২. রূপক (Metaphor)

আমরা যখন আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত কোনো বিমূর্ত বিষয়কে কোনো মূর্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝি, তখন তৈরি হয় ধারণাগত রূপক (conceptual metaphor)।

> Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, is fundamentally metaphorical in nature[৩]

ধারণাগত রূপক তত্ত্ব (Conceptual Metaphor Theory/CMT) অনুসারে রূপকের দু'ধরনের এলাকার কথা বলা হয়েছে। একটি হল উৎসক্ষেত্র (source domain) এবং অন্যটি হল লক্ষ্যক্ষেত্র (target domain)[৪]। উৎসক্ষেত্রকে খুব সহজে চেনা যায়। এটি অভিজ্ঞতালব্ধ

মূর্ত বিষয়। অন্যদিকে, লক্ষ্যক্ষেত্র আসলে বিমূর্ত বিষয়, তাকে অনুভব করতে হয় উৎসক্ষেত্রের অর্থের সাহায্যে। যদি বলা হয়, 'জীবন হল পরিভ্রমণ', তবে 'পরিভ্রমণ' হল রূপকের উৎসক্ষেত্র, যার অর্থ আমরা সহজেই বুঝতে পারি। কারণ এটি অভিজ্ঞতালব্ধ মূর্ত বিষয়। কিন্তু 'জীবন' হল বিমূর্ত বিষয়। 'পরিভ্রমণ'-এর অভিজ্ঞতালব্ধ অর্থের সাহায্যে 'জীবন'-এর অর্থ বুঝতে হয়। এটি তাই রূপকের লক্ষ্যক্ষেত্র। এই দুই ক্ষেত্রের ছক (schema)-এর বিন্যাস নিম্নরূপ –

SCHEMA / FRAME OF JOURNEY		**SCHEMA / FRAME OF LIFE**
• Journey	=	• Life
• Traveler	=	• Person leading a life
• Destination	=	• Purpose of life
• Obstacles	=	• Difficulties
• Distance covered	=	• Progress made
• Way of the journey	=	• Manner of living
• Choices about the path	=	• Choices in life etc [৫]

আমরা 'পরিভ্রমণ'-এর ছকের সাহায্যে 'জীবন'-এর ছক তৈরি করি। এভাবে 'জীবন'-এর অর্থ বুঝতে সুবিধা হয়। অর্থ বোঝার এই প্রক্রিয়াটি হল ধারণাগত রূপক। ধারণাগত রূপকগুলিই বিভিন্ন ভাষিক রূপে দৈনন্দিন কথাবার্তায় বা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়। তখন এগুলিকে বলা হয় ভাষিক রূপক (linguistic metaphor)। যেমন –

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে; [৬]

এই ভাষিক রূপকের মধ্য দিয়ে যে ধারণাগত রূপক ধরা দেয়, তা হচ্ছে 'জীবন হল পরিভ্রমণ'।

২.৩. বিশ্লেষণ ও আলোচনা

আমরা জানি, মেটাফর তৈরিতে ছক (schema) সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। মেটাফরের উৎসক্ষেত্রের ছক লক্ষ্যক্ষেত্রের অর্থ বুঝতে সাহায্য করে (দ্র. ২.২.২)। চিত্রকল্প অনুধাবনের ক্ষেত্রেও ছকের কার্যকারিতা সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ, 'Every poetic image, therefore, is to some degree metaphorical'[৭]। চিত্রকল্প আমাদের ইন্দ্রিয়সম্পৃক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি জাগায়। অর্থাৎ, ছক সক্রিয় হয়। প্রথম অধ্যায় থেকেই একটি উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হল –

ফিনিক্স উপন্যাসে পাই মাতৃত্বের প্রথাগত ইমেজের পরিপন্থী ইমেজ (দ্র. ১.৩.২.১-এর 'ক' অংশ) -

> ওর কাছে তো মা মানে আরাম নয়, মা মানে বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হয়ে ফেরা নয়, রোহিণীর জীবনে মা মানে কথা কাটাকাটি, মা মানে সংগ্রাম।[৮]

এবার দেখে নেওয়া যাক, এক্ষেত্রে পাঠকের সংশ্লিষ্ট ছকের বিন্যাস সাধারণত কেমন হয়-

মা সংক্রান্ত ছক		**? (শত্রু বা শত্রুসম) সংক্রান্ত ছক**
• আরাম	≠	• কথা কাটাকাটি
• বিশ্রাম নিয়ে সুস্থ হয়ে ফেরা	≠	• সংগ্রাম

সুতরাং, উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে পাঠক মায়ের চিত্রকল্পের তাৎপর্য বুঝতে পারেন তাঁর ছক নবীকরণের মধ্য দিয়ে। কারণ, এই চিত্রকল্প আসলে মায়ের প্রথাগত ইমেজের বিপরিচিতিকরণ (defamiliarisation) ঘটায়। পাঠকের এতকালের নির্মিত মা সংক্রান্ত ছককে একটু অদল-বদল করে সাজিয়ে নিতে হয়। এর ফলে পাঠকের মা সম্পর্কিত ধারণা হয় নিম্নরূপ –

কোনো একজন মা যেমন প্রথাগত মায়ের মতো হতে পারেন, তেমনি আবার অন্য একজন মা 'ফিনিক্স' উপন্যাসে পাওয়া মায়ের মতোও হতে পারেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমাদের মনে হতে পারে এখানে পাঠকের ছক ভাঙন কেন হবে না। সেটি হবে না, কারণ উদ্ধৃতাংশে বলা হয়েছে ‘রোহিণীর জীবনে মা মানে...’। অর্থাৎ, মা সংক্রান্ত শত্রুসম অভিজ্ঞতা কোনো একজন ব্যক্তির (এখানে রোহিনী) হতে পারে কিন্তু এই অভিজ্ঞতা সর্বজনীন নয়। তাই চিত্রকল্প থেকে প্রাপ্ত তথ্য পাঠকের মা সংক্রান্ত ধারণার এমন বিরাট কিছু বিচ্যুতি ঘটাতে পারে না, যার ফলে মায়ের ইমেজ সংক্রান্ত এতকালের জ্ঞানকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়ে ছকের ভাঙন হয়ে যাবে।

প্রথম অধ্যায়ে আই. এ. রিচার্ডসের উক্তি প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরা হয়েছিল [দ্র. ১.১]। তাঁর কথায়, চিত্রকল্প কেবলমাত্র ছবি নয়, তা আসলে এমন এক মানসিক ব্যাপার, যা আমাদের ‘sensation’-এর সঙ্গে যুক্ত। এই সংবেদন (sensation) তৈরি হয় আমাদের প্রতিদিনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, যা আমাদের জ্ঞান-সংগঠনকে সমৃদ্ধ করে। আমরা জানি, স্কিমা বা ছক তৈরি হয় তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এখন শব্দ নির্মিত কোনো ছবি অর্থাৎ চিত্রকল্প পাঠকের ছককে প্রধানত তিনভাবে প্রভাবিত করতে পারে –

২.৩.১. চিত্রকল্পের প্রভাবে পাঠকের ছক সংরক্ষণ

চিত্রকল্প যখন পাঠকের ছকে সঞ্চিত থাকা সংবেদন বা ইন্দ্রিয়ানুভূতির পুরনো অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে উস্কে দেয়, তখন পুরনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতা মিলে যায়। এক্ষেত্রে ছক সংরক্ষণ হয়। যেমন –

> কখনও বা ফুলের দোকান পার হচ্ছ, তাজা টাটকা ফুলের তীব্র সৌরভে গলি ভরা, কখনও হয়ত বইপাড়া দিয়ে যাচ্ছ, টাটকা আঠার গন্ধ, নতুন বইয়ের গন্ধ, তাজা কাগজের গন্ধ – কখনও কাপড়ের পাড়ায়, কাপড়ের গাঁঠরি নামাচ্ছে, ওঃ নতুন কাপড়ের গ— ওঃ ইনক্রেডিবল সিটি। কেউ তার জানলা

দরজায় খসখস টাঙিয়ে তাতে জলঝড়া দিচ্ছে, তার সুবাস, কখনও মন্দির পার হয়ে যাচ্ছ, হঠাৎ নাকে আসবে ধূপধুনোর মিষ্টি পবিত্র গন্ধ, চন্দন সুরভি-শঙ্খঘন্টার শব্দ ...[৯]

এই চিত্রকল্পটি প্রথম অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত পারিপার্শ্বিকতার ছবি নির্মাণে ব্যবহৃত চিত্রকল্প [দ্র. ১.৩.২.৬.১]।

২.৩.২. চিত্রকল্পের প্রভাবে পাঠকের ছক দৃঢ়ীকরণ

এক্ষেত্রে চিত্রকল্প এমন কিছু তথ্য সরবরাহ করতে পারে, যা খানিকটা বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও তা আসলে ছকে থাকা পুরনো জ্ঞানকেই সুনিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে ছক দৃঢ়ীকরণ হয়। ছক সংরক্ষণের যে দৃষ্টান্তটি ওপরে দেওয়া হয়েছে, সেটিই পাঠকভেদে ছক মজবুত করতে পারে। কারণ, এমন কিছু কিছু পাঠক আছেন, যাঁদের আলাদা আলাদাভাবে আঠার গন্ধ, বইয়ের গন্ধের অনুভূতি আছে। কিন্তু তাঁরা হয়তো বইপাড়ায় যাননি। ঠিক বইপাড়া দিয়ে যাওয়ার সময়ের এমন গন্ধের অভিজ্ঞতা হয়তো তাঁদের নেই। কিন্তু সেক্ষেত্রেও চিত্রকল্পের অন্তর্নিহিত রসের উপলব্ধিতে ঘাটতি হবে না। বরং এরকম পাঠকের আলাদা আলাদাভাবে লব্ধ গন্ধের স্মৃতিকে উসকে দিয়ে চিত্রকল্প পুরনো জ্ঞানকেই মজবুত করবে।

২.৩.৩. চিত্রকল্পের প্রভাবে পাঠকের ছক নবীকরণ

চিত্রকল্পের মাধ্যমে পাঠকের ছক নবীকরণ হওয়াও সম্ভব। অর্থাৎ, চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে পাঠককে তাঁর সংশ্লিষ্ট পুরনো জ্ঞানকে একটু অদলবদল ক'রে সাজিয়ে নিতে হয়। ওপরে একটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। এর আরও দৃষ্টান্ত আমরা অল্প পরেই দেখব।

এছাড়া চিত্রকল্প বিশেষে এবং পাঠকভেদে ছক বৃদ্ধিও কখনো কখনো হয়। এর দৃষ্টান্তও আমরা একটু পরেই দেখব।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে নবনীতা দেবসেনের গল্প উপন্যাসের একেকটি চিত্রকল্পে প্রধানত সীমালঙ্ঘন, পুরুষতান্ত্রিক অবদমন, নারীর অস্তিত্ব-সমস্যা, সংস্কৃতিগত সন্নিধান ইত্যাদির ধারণা সম্বলিত একেকটি ছবি ফুটে ওঠে। তার ফলে পাঠকের ছক (schema) যেভাবে প্রভাবিত হতে পারে, তা নিচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করা হল।

সীমালঙ্ঘন, পুরুষতান্ত্রিক অবদমন এবং নারীর অস্তিত্ব-সমস্যার চিত্রকল্প যখন রাম, সীতা, লক্ষ্মণ কিংবা শূর্পণখাকে ঘিরে গড়ে ওঠে, তখন কার্যত পাঠক নতুনভাবে এইসব চরিত্রগুলোকে চেনেন। ফলে এসব ক্ষেত্রে পাঠকের ছক নবীকরণ হয়। যেমন –

> রামচন্দ্রের বাঁদিকে একটি ক্ষুদ্র বোতাম ছিল। বিশ্বকর্মার অপূর্ব সৃষ্টি। তিনি বোতামটি টিপে দিলেন, স্বর্ণসিংহাসন সমেত সীতা রসাতলে নেমে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে উপরের মর্মরবেদী আবার যেমন-কে-তেমন জুড়ে গেল। সভাস্থ সকলে একবাক্যে চীৎকার করে উঠলো – “জয় সীতালক্ষ্মী সীতামায়ের জয়! জয় ইক্ষ্বাকুবংশের জয়!” ... রাম মৃদু হাসলেন দুজন পার্ষদের দিকে তাকিয়ে। তারপরেই বুক চাপড়ে কেঁদে উঠলেন – “দে, দে, বসুধা, আমার সীতাকে ফিরিয়ে দে, নইলে তোর চারভাগই আমি জল করে ফেলবো – একভাগ স্থল আর রাখতে দেব না-” [১০]

সংশ্লিষ্ট বিপরিচিতিকরণ (defamiliarisation)-এর বিস্তৃত বিশ্লেষণ পঞ্চম অধ্যায়ে করা হয়েছে। এখানে কেবল একটি কথা বলা প্রয়োজন। এইধরনের চিত্রকল্প আমাদের মহাকাব্যিক চরিত্র রাম সম্পর্কিত এতদিনের জ্ঞানকে আচমকা খানিক ধাক্কা দেয়। ভক্তবৎসল রামের ইমেজকে বদলে দিতে চায় এই চিত্রকল্প। পাঠকের ধারণায় রামের বিপরিচিতিকরণ হয়।

সংস্কৃতিগত সন্নিধান, প্রজন্মগত ব্যবধান এবং কৌতুকময় চিত্রকল্পের ক্ষেত্রে অধিকাংশ পাঠকের ছক সংরক্ষণ এবং ছক দৃঢ়ীকরণ হয়। কোনও কোনও পাঠকের অবশ্য ছক বৃদ্ধিও হতে পারে। কোনও কোনও পাঠকের ছক বৃদ্ধি হতে পারে এমন একটি সংস্কৃতিগত সন্নিধানের চিত্রকল্পের দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হল –

রান্নাঘর বলতে আজন্মই জেনেছি – ঘুপচি অন্ধকার, অ্যালামাটি রং করা, ঝুলকালি লাগা নিচু ছাদের, গরমে ভ্যাপসা, আরশোলা ভরতি একটা বিশ্রী ঘর। ছেলেমেয়েদের রান্নাঘরে গিয়ে দেখি মার্বেল পাথরের মেঝে, স্টেনলেসের লম্বা লম্বা টেবিল, স্টেনলেসের ডবল বেসিন, তাক, রঙিন পালিশ করা ঝকঝকে নতুন সব সানমাইকার তাক, আর কাবার্ড, কতরকমের ইলেক্ট্রিক যন্ত্রপাতি ... একটা মিনি-টেবিলফ্যান ঘুরছে সবসময়।[১১]

রান্নাঘর কেমন হয়, সেই সংক্রান্ত জ্ঞান-ছক সব পাঠকের সমান না হলেও আশ্চর্যজনক নয়। যদি কোনও পাঠক ওপরে বর্ণিত দ্বিতীয় ধরনের রান্নাঘরের সঙ্গেই আজন্ম পরিচিত হন, তাহলে প্রথম ধরনের রান্নাঘরের ছবি তাঁর রান্নাঘর সংক্রান্ত ছক বৃদ্ধি করবে। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে মেট্রো শহরের উচ্চবিত্ত পরিবারের কোনও পাঠকের পক্ষে চিত্রকল্পটির মাধ্যমে এই জাতীয় ছক বৃদ্ধি স্বাভাবিক।

প্রথম অধ্যায়ে যে বিভিন্ন ধরনের চিত্রকল্প দেখানো হয়েছে, সেই সবকটিই উপরোক্ত কোনো-না-কোনো প্রক্রিয়ায় পাঠকের জ্ঞানের ছককে প্রভাবিত করে।

পরিশেষে বলা যায়, নবনীতা দেবসেনের কলমে সৃষ্ট চিত্রকল্প যখন পাঠকের ছক নবীকরণ করেছে, তখন সেই চিত্রকল্প অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠকের এতদিনের ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হয়েছে। চিত্রকল্প যখন ছক সংরক্ষণ কিংবা ছক দৃঢ় করেছে, তখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠক তাঁর পুরনো অভিজ্ঞতাকে একবার ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেন। আর যদি কোনও চিত্রকল্প কোনও পাঠকের ছক বৃদ্ধি করে থাকে, তাহলে সেই চিত্রকল্প সেই পাঠকের কাছে জ্ঞানের উৎস হিসেবে কাজ করেছে।

২.৪. তথ্যসূত্র

১। Elena Semino and Jonathan Culpeper, eds., *Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis* (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002), ix.

২। Peter Stockwell, *Cognitive Poetics: An Introduction* (London and New York: Routledge, 2002), 79.

৩। George Lakoff and Mark Johnson, *Metaphors We Live By* (Chicago: University of Chicago Press, 1980), 3.

৪। Andrew Ortony, ed., *Metaphor and Thought*, 2nd ed. (New York: Cambridge University Press, 1993), 202–251.

৫। Bidisha Som, "Lec 7: Metaphor," *NPTEL IIT Guwahati*, video, 48:08, posted January 18, 2022, at 20:40, https://youtu.be/i2bb4NMcBUk?si=zkMc-xpxmA_fdiRj.

৬। জীবনানন্দ দাশ, "বনলতা সেন," অন্তর্গত *আধুনিক বাংলা কবিতা,* সম্পা. বুদ্ধদেব বসু (কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৩), ৬৪।

৭। C. Day Lewis, *The Poetic Image* (London: Jonathan Cape, 1947), 18.

৮। নবনীতা দেবসেন, *ফিনিক্স,* ২য় সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৫), ৯০।

৯। নবনীতা দেবসেন, "চাঁদ গড়ার কারিগর," *গল্পসমগ্র ২,* ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ৪৬।

১০। নবনীতা দেবসেন, "সীতার পাতাল প্রবেশ," *গল্পসমগ্র ২,* ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২৪৬।

১১। নবনীতা দেবসেন, "স্বভূমি," *দশটি উপন্যাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., জানুয়ারি ২০০৩), ১০৮।

তৃতীয় অধ্যায়

নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে আন্তর্বয়নের প্রকৃতি নির্ধারণ

৩. নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে আন্তর্বয়নের প্রকৃতি নির্ধারণ

৩.১. ভূমিকা

> Intertextuality … foregrounds notions of relationality, interconnectedness and interdependence …[১]

আন্তর্বয়ান (intertext) প্রকৃতপক্ষে এমন একটি উচ্চারণ বা পাঠকে বোঝায়, যা অন্য কোনো উচ্চারণ বা পাঠের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই শেষোক্ত উচ্চারণ বা পাঠটি সমসাময়িক কালের হতে পারে, আবার অনেক পুরনো কোনো পাঠ বা উচ্চারণও হতে পারে; তা হতে পারে কোনো সাহিত্যিক পাঠ কিংবা সাহিত্য ব্যতীত অন্য কোনো ধরনের পাঠ। বিষয়টি সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যাক।

আমরা যখন কোনো একটি বিষয়ে মৌখিক আলোচনা করি বা বক্তৃতা দিই কিংবা গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদি সাহিত্য প্রকরণ রচনা করি (যাকে এককথায় বলা যায় পাঠ), তখন সেই বলা বা লেখার মাঝে যদি আগে কথিত বা লিখিত কোনো পাঠের অংশ স্মরণ ক'রে উদ্ধৃত করি (উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার ক'রে বা না-ক'রে), তবে সেই উদ্ধৃত অংশকে বর্তমান পাঠের আন্তর্বয়ান বলা হয়। আর এরকম কথন বৈশিষ্ট্য বা লিখন বৈশিষ্ট্যের নাম আন্তর্বয়ন (intertextuality)। এক্ষেত্রে বক্তা বা লেখক আশা করেন যে তাঁর শ্রোতা বা পাঠকবৃন্দ আলোচ্য বিষয়ের সাথে উদ্ধৃতাংশের সংযোগ সাধন করতে পারবেন। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক –

ধরা যাক, অমিত এবং করবী কয়েকদিন হল একটা কুকুরছানা পুষেছে। কিন্তু তার নাম টম রাখা হবে নাকি ভুলু, তা নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্ক শুরু হল। এরকম অবস্থায় করবী হঠাৎ বলল, 'What's in a name?' [২]। আমরা সকলেই জানি, এই কথাটি আসলে Shakespeare-

এর *Romeo and Juliet* থেকে উদ্ধৃত, যেখানে বাক্যটির প্রাসঙ্গিক অর্থ, রোমিও-র নাম যাই হোক না কেন জুলিয়েট রোমিওকেই ভালোবাসে।

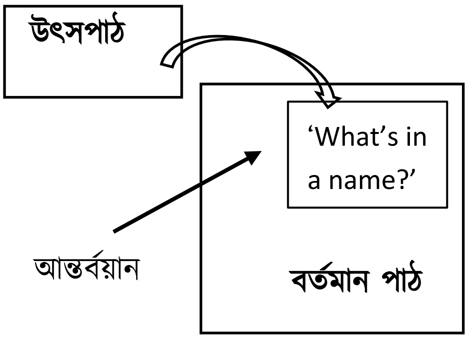

চিত্র ৬: আন্তর্বয়ন

তাই উদাহরণটিতে করবীর উক্তিটি আপাতভাবে প্রশ্নসূচক মনে হলেও, আসলে তা ছদ্ম-প্রশ্ন। একথার উদ্দেশ্য এটা বলা যে, কুকুরছানার যে নামই রাখা হোক তাতে তার গুণাগুণ কিংবা তার প্রতি ভালোবাসা কিছুই বদলায় না। আর এই প্রক্রিয়াটিই হল আন্তর্বয়ন (দ্র. চিত্র ৬)। এর ফলে মূল বিষয়টি যেমন আরও স্পষ্ট রূপ লাভ করে, তেমনি উদ্ধৃতির উৎসপাঠের প্রসঙ্গ (context)-এর সাথে বর্তমান পাঠের প্রসঙ্গের প্রতিতুলনা করে সহৃদয় পাঠক ও শ্রোতা পরিতৃপ্তি লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, কুম্ভীলক বৃত্তি (plagiarism) কখনোই আন্তর্বয়ন নয়। কারণ আন্তর্বয়ন হল পাঠের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ; অন্যদিকে কুম্ভীলক বৃত্তি চৌর্যবৃত্তির নামান্তর।

অনেক সময় অন্য পাঠ থেকে হুবহু উদ্ধৃত না-করে খানিকটা রূপান্তরিত করে নেবার প্রবণতাও দেখা যায়। অর্থাৎ, এসব ক্ষেত্রে পাঠঋণ (borrowing) ও রূপান্তর (transformation) দুটিই লক্ষণীয়। যেমন –

রবীন্দ্রনাথের *বলাকা* কাব্যের ‘চঞ্চলা’[৩] কবিতা	**সজনীকান্ত দাসের প্যারোডি কবিতা ‘গদি’[৪]**
হে বিরাট নদী, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল অবিচ্ছিন্ন অবিরিল চলে নিরবধি।	হে প্রাচীন গদি, অদৃশ্য নিঃশব্দ তব তলে ছারপোকা দলে দলে চলে নিরবধি।

সারণি ১: প্যারডি সাহিত্যে আন্তর্বয়ন

প্যারোডি-সাহিত্য পূর্ণ মাত্রায় আন্তর্বয়ন নির্ভর একটি প্রকরণ, যেখানে পাঠঋণ আর রূপান্তরের মাধ্যমে উৎসপাঠের সমালোচনা ব্যঙ্গ শ্লেষোক্তি করাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে প্যারোডি ছাড়াও আন্তর্বয়ানের রূপান্তরিত প্রয়োগ দেখা যায়। সেসব ক্ষেত্রে উৎসপাঠের সমালোচনার পরিবর্তে বর্তমান পাঠের প্রসঙ্গের সমালোচনা করাও লেখকের উদ্দেশ্য হতে পারে। এর দৃষ্টান্ত আমরা নবনীতা দেবসেনের লেখা বিশ্লেষণ করতে গিয়েই দেখতে পাব।

গত শতাব্দীর আটের দশকে ফরাসী দার্শনিক জুলিয়া ক্রিস্তেভা (Julia Kristeva) তাঁর ‘The Bounded Text’ প্রবন্ধে ‘intertextuality’ কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন।[৫] রুশ দার্শনিক, সাহিত্যিক মিখাইল বাখতিনের (M. M. Bakhtin) তত্ত্বকে সম্প্রসারিত করেন তিনি। তাঁর মতে, কোনো পাঠই প্রকৃতপক্ষে আন্তর্বয়ন বর্জিত নয়। অর্থাৎ, স্বয়ংসম্পূর্ণ পাঠ ব’লে কিছু নেই। ফলে প্রতিটি পাঠ একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। এইভাবে ক্রমশ একটি নির্দিষ্ট পাঠ আর শুধুমাত্র তার নিজের সীমাতেই আবদ্ধ থাকে না। বরং পরস্পর সংযুক্ত সবক’টি পাঠ মিলিতভাবে একটি বিস্তৃত পরিসর নির্মাণ করে। এভাবে পাঠ থেকে পাঠে তৈরি হয় একটা সংলাপ। মিখাইল বাখতিনের বক্তব্য অনুযায়ী,

any text is constructed as a mosaic of quotations; any text is the absorption and transformation of another [৬]

সুতরাং, আন্তর্বয়ান সমন্বিত পাঠের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে হলে পাঠককে এক পাঠ থেকে বহু পাঠে যাতায়াত করতে হয়।

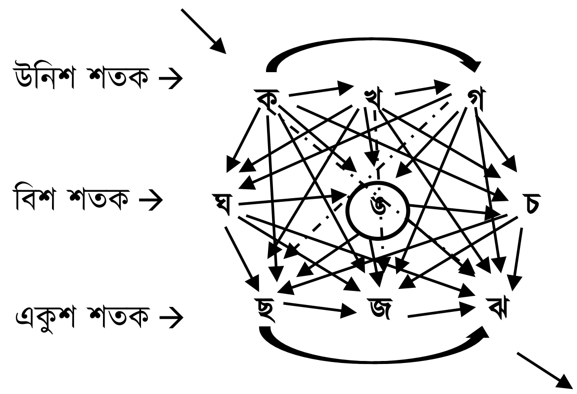

চিত্র ৭: বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট বিভিন্ন পাঠের সম্ভাব্য জাল (নেটওয়ার্ক)

(চিত্র ৭ দ্রষ্টব্য) ধরা যাক, কোনো পাঠক বিশ শতকে রচিত 'ঙ' শীর্ষক পাঠটি পড়ছেন, চিত্রে যেটিকে বৃত্তাকার রেখায় আবদ্ধ করা হয়েছে। 'ঘ' এবং 'চ' হল ওই একই সময়পর্বে সৃষ্ট পাঠ (contemporary text)। 'ক', 'খ' এবং 'গ' – এই তিনটি হল অপেক্ষাকৃত পুরনো, উনিশ শতকে রচিত পাঠ। 'ছ', 'জ' এবং 'ঝ' – এই তিনটি বিশ শতক অপেক্ষা পরবর্তী সময়কাল একুশ শতকে সৃষ্ট পাঠ। চিত্রে এই তিন সময়পর্বে তৈরি বিভিন্ন পাঠের মধ্যে সৃষ্ট সম্পর্কের সম্ভাব্য জাল দেখানো হয়েছে। আন্তর্বয়ান ব্যবহারের ফলেই বিভিন্ন পাঠের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের জাল তৈরি হয়েছে। পরে রচিত পাঠে তার আগে রচিত যেকোনো পাঠের উপাদান ব্যবহৃত হতে পারে। এটাই চিত্রে তীর চিহ্নের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দুটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে –

প্রথমত, পৃথিবীর সমস্ত ধরনের পাঠের মধ্যে প্রথম সৃষ্ট পাঠ ব'লে কি কিছু আছে?

দ্বিতীয়ত, যেকোনো দুটি পাঠের মধ্যে এই আন্তর্বয়ন জনিত সম্পর্কের ভিত্তি কী?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, না। ক্রিস্তেভার মতে, প্রথম পাঠ ব'লে কিছু নেই। কারণ, মানুষের সৃজনশীল কর্মের শুরু কোথা থেকে তার কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, আন্তর্বয়ন হল Graham Allen-এর মতে দুটি টেক্সটের মধ্যে 'relationality', 'interconnectedness' এবং 'interdependence'।[১] এই সম্পর্ক নির্মিত হয় উভয় পাঠের প্রসঙ্গের ভিত্তিতে। মানব সভ্যতায় প্রবহমান সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ঐতিহ্যের নিরিখেই দুটি ভিন্ন পাঠেও সমজাতীয় প্রসঙ্গ (context) হওয়া সম্ভব। Graham Allen তাঁর *Intertextuality* বইয়ের ভূমিকায় বলেন,

> Works of literature, after all, are built from systems, codes and traditions established by previous works of literature. The systems, codes and traditions of other art forms and of culture in general are also crucial to the meaning of a work of literature. Texts, whether they be literary or non-literary, are viewed by modern theorists as lacking in any kind of independent meaning. They are what theorists now call intertextual. The act of reading, theorists claim, plunges us into a network of textual relations. To interpret a text, to discover its meaning, or meanings, is to trace those relations. Reading thus becomes a process of moving between texts. Meaning becomes something which exists between a text and all the other texts to which it refers and relates, moving out from the independent text into a network of textual relations. The text becomes the intertext.[৭]

মৌখিক বা লিখিত যেকোনো পাঠ-ই প্রসঙ্গ (context)-এর ভিত্তিতে তার পূর্ববর্তী মৌখিক বা লিখিত যেকোনো পাঠের সঙ্গে আন্তর্বয়ানগত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এর ফলে একটি পাঠের দু'রকম অর্থ তৈরি হয়। একটি হল বাহ্যিক অর্থ, যা কেবলমাত্র ওই নির্দিষ্ট পাঠের সাথে লগ্ন। আর অন্যটি হল আভ্যন্তরীণ অর্থ, যা তৈরি হয় পূর্ববর্তী কোনো পাঠের সাথে প্রাসঙ্গিক সাজুয্যের ফলে। Kristeva তাই প্রতিটি পাঠের 'double meaning'-এর কথা বলেছিলেন,

> Kristeva's semiotic approach seeks to study the text as a textual arrangement of elements which possess a double meaning: a meaning in the text itself and a meaning in what she calls 'the historical and social text'.[৮]

বিশেষ এক প্রকার আন্তর্বয়নকে বলা হয় আন্তর্চারিত্রিকতা। এটি দুটি ভিন্ন পাঠের একটির চরিত্রের সঙ্গে অপরটির চরিত্রের আন্তঃসম্পর্ক নির্দেশ করে। এইরকম চরিত্রনির্ভর আন্তঃসম্পর্ক কার্যত পাঠে এক নতুন অর্থের দ্যোতনা তৈরি করে। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে (দ্র. ৩.৩.২)।

যদিও বাখতিন, ক্রিস্তেভা, হ্যালিডে, উইডোসন প্রমুখের মত অনুসারে কোনো পাঠই আন্তর্বয়ান বর্জিত নয়, তবু বর্তমান গবেষণার নিরিখে আমাদের মনে রাখতে হবে যে যেসব লেখায় আন্তর্বয়ানের প্রতিপত্তি যথেষ্ট নজর কাড়ে, সেখানে এটি নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে। নজর কাড়া আন্তর্বয়ানের কথা বলছি, কারণ পাঠ মানেই তা আন্তর্বয়ান সমন্বিত, এরকম সরলীকৃত ভাবনায় স্বাভাবিকভাবেই আপত্তি ওঠে। একমাত্র মিমিক্রি বা প্যারডির মতো কোনো প্রকরণ যদি না হয়, তবে যেকোনও স্রষ্টাই তাঁর সৃষ্টিকর্মে স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ ঘটান। আমরা একটা গোটা পাঠকে অন্যান্য পাঠের আন্তর্বয়ান হিসেবে বিবেচনা করলে, শিল্পীর নিজস্ব শিল্পচিন্তার অভিনবত্বকে অস্বীকার করা হবে। এক পাঠের সঙ্গে অন্য পাঠের প্রাসঙ্গিক (contextual) মিল থাকলেও, বদলে যায় সেই প্রসঙ্গের প্রতি শিল্পী বা স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা তাঁর সেই দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তাকেও অস্বীকার করব, যদি তাকে কেবলমাত্র অন্য কোনো পাঠের প্রভাবজাত আন্তর্বয়ান রূপে দেখি।

সুতরাং, নবনীতা দেবসেনের গল্প উপন্যাস বিশ্লেষণকালে আমরা নজর-কাড়া আন্তর্বয়ানগুলিকেই বেছে নেব এবং বোঝার চেষ্টা করব সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গের নিরিখে আন্তর্বয়ানের ব্যবহার কতখানি সার্থক হয়েছে। আমরা দুটি বিষয়ের সন্ধান করব –

১) নবনীতার গল্প ও উপন্যাসে কী ধরনের আন্তর্বয়ন দেখা যায়?

২) আন্তর্বয়ান গল্প ও উপন্যাসে কী জাতীয় প্রভাব সৃষ্টি করেছে?

৩.২. পদ্ধতি

বর্তমান অধ্যায়ে শৈলীবিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কথাশিল্পী নবনীতা দেবসেনের ছোটগল্পের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে ধাপে ধাপে নির্ণয় করা হয়েছে একেকটি গল্পে ব্যবহৃত আন্তর্বয়ানের প্রকৃতি। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট পদ্ধতি[৯] অবলম্বন করা হয়েছে, নিচে তার পরিচয় দেওয়া হল।

গল্প, উপন্যাস কিংবা যেকোনও পাঠে দু'রকম আন্তর্বয়ন বিন্যস্ত থাকতে পারে –

ক) সার্ব-আন্তর্বয়ন (macro-intertextuality)

খ) অণু-আন্তর্বয়ন (micro-intertextuality)

পাঠের সামগ্রিক গঠন ও অর্থের ওপর ক্রিয়াশীল সার্ব-আন্তর্বয়ন। আর অণু-আন্তর্বয়ন ধরা থাকে পাঠের আভ্যন্তরীণ স্তরে। পাঠের ভিতরকার ধ্বনি, রূপ, শব্দ, বাক্য স্তরে একে অনুভব করা যায়।

আবার, অণু-আন্তর্বয়নের প্রকৃতি চার রকমের হতে পারে –

(অ) আবেশধর্মী (Allusion)

(আ) নির্দেশধর্মী (Indication)

(ই) স্বাঙ্গীকরণমূলক (Adaptation)

(ঈ) উদ্ধৃতিমূলক (Quotation)

এগুলি সম্পর্কে নিচে ধারণা দেওয়া হল –

(অ) আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান (ALLUSION) : আবেশধর্মী আন্তর্বয়ানের মাধ্যমে চরিত্র, স্থান, ঘটনা বা গল্প-উপন্যাসের অন্তর্গত কোনো বিষয়কে অন্য একটি পাঠের চরিত্র, ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা হয় না, কিন্তু পরোক্ষে সেই অন্য পাঠের চরিত্র, ঘটনা ইত্যাদির আবেশ সৃষ্টি করা হয়।

আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান হতে পারে ধনাত্মক বা ঋণাত্মকধর্মী। M. H. Abrams বলছেন,

> Most allusions serve to illustrate or expand upon or enhance a subject, but some are used in order to undercut it ironically by the discripancy between the subject and the allusion.[১০]

(আ) নির্দেশধর্মী আন্তর্বয়ান (INDICATION): সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি যেকোনো বিষয়ের পাঠ থেকে কোনো ধারণা গ্রহণ ক'রে তাকে বর্তমান পাঠে ফুটিয়ে তুলে অন্য কোনো তাৎপর্যবাহী ধারণা বা অর্থের প্রতি দিকনির্দেশ করে।

(ই) স্বাঙ্গীকরণমূলক আন্তর্বয়ান (ADAPTATION): এই জাতীয় আন্তর্বয়ন অন্য কোনো সাহিত্যিক-পাঠ কিংবা শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, চলচ্চিত্র ইত্যাদির কোনো ধারণা সরাসরি গ্রহণ ক'রে বর্তমান পাঠে ফুটিয়ে তোলে।

(ঈ) উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান (QUOTATION): এই জাতীয় আন্তর্বয়নে আগে রচিত কোনো পাঠ থেকে সরাসরি উদ্ধৃতি-চিহ্ন ব্যবহার ক'রে বা না-ক'রে উদ্ধৃত করা হয়।

বর্তমান অধ্যায়ে ওপরের পদ্ধতিতে দুটি নতুন ভাবনার সংযোগ করা হয়েছে –

প্রথমত, অণু-আন্তর্বয়নের মতোই সার্ব-আন্তর্বয়নও বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রেও আবেশধর্মী, উদ্ধৃতিমূলক ইত্যাদি রকমভেদ দেখা যায়। এর নমুনা আমরা নবনীতা দেবসেনের সাহিত্য বিশ্লেষণ করতে গিয়েই দেখতে পাব।

দ্বিতীয়ত, ওপরের যেকোনো ধরনের আন্তর্বয়নই ধনাত্মক বা ঋণাত্মকধর্মী হতে পারে। এই ধর্ম নির্ভর করে আন্তর্বয়ানের উৎসপাঠ ও বর্তমান পাঠের প্রাসঙ্গিক সম্পর্কের (contextual relation) ভিত্তিতে। একটি আন্তর্বয়ানের অব্যবহিত প্রসঙ্গ যদি উৎসপাঠ এবং বর্তমান পাঠে সমজাতীয় হয়, তাহলে আন্তর্বয়ানটি হয় ধনাত্মক। কিন্তু, যদি উভয় পাঠে আন্তর্বয়ানের অব্যবহিত প্রসঙ্গ বিজাতীয় হয়, তবে সেক্ষেত্রে আন্তর্বয়ানটি হয় ঋণাত্মক আন্তর্বয়ান। ফলাফলেও দেখা যায়, ধনাত্মক আন্তর্বয়ান বর্তমান পাঠের সংশ্লিষ্ট বিষয়কে আরও স্পষ্ট করে। কিন্তু ঋণাত্মক আন্তর্বয়ান যতটা না বিষয়কে স্পষ্ট করতে চায়, তার থেকে অনেক বেশি তার উদ্দেশ্য হল, উৎসপাঠের সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গের স্মৃতিকে উস্‌কে দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গের গুরুত্বকে লঘু করে দেখানো। অর্থাৎ, সেই Abrams-এর ভাষা ধার করে বলা যায়, “in order to undercut it ironically by the discripancy”[১০]। প্রাসঙ্গিক সম্পর্কের ধাঁচটা চিনে নিতে পারলেই পাঠের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় ও সেইসঙ্গে লেখকের আন্তর্বয়নের পথ অবলম্বন করার উদ্দেশ্যও সফল হয়।

নতুন ভাবনা সম্বলিত গবেষণা পদ্ধতিটিই নবনীতা দেবসেনের সাহিত্যে আন্তর্বয়নের প্রকৃতি নির্ধারণে কাজে লাগানো হয়েছে।

৩.৩. বিশ্লেষণ ও আলোচনা

৩.৩.১. আন্তর্বয়নের প্রকৃতি অন্বেষণ

আমরা উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে এবার নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্য থেকে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করব এবং আন্তর্বয়নের প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করব।

৩.৩.১.১. 'সেদিন দুজনে' গল্পে আন্তর্বয়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণ

সদ্য বিবাহিত এক দম্পতির বিদেশের মাটিতে দিনযাপনের কিছু টুকরো ছবির সমাহার নবনীতা দেবসেনের 'সেদিন দুজনে' গল্প।

৩.৩.১.১.১. 'সেদিন দুজনে' গল্পে সার্ব-আন্তর্বয়ন

গল্পের নামটি পড়া কিংবা শোনামাত্র পাঠকের স্মরণে আসবে রবীন্দ্রনাথের গান, 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে, ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা'[১১]। দেখা যাবে, পুরো গানটিতে একেকটি ছবি ফুটে ওঠে এবং তা আসলে সুখস্মৃতির রোমন্থন। আর সেই বর্ণিত সুখ যে বর্তমানে অস্তমিত, দুজনের একান্ত নৈকট্য যে আর নেই, তা স্পষ্ট হয়, যখন বলা হয় –

> এখন আমার বেলা নাহি আর, বহিব একাকী বিরহের ভার –
> বাঁধিনু যে রাখী পরানে তোমার সে রাখী খুলো না, খুলো না।।[১২]

'সেদিন দুজনে' গল্পে একের পর এক সুখের মুহূর্ত গাঁথা হলেও আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে গল্পের শিরোনামে আন্তর্বয়ানের ব্যবহার থাকায় প্রচ্ছন্নে বিরহের সুর বাজে। পাঠক অনুভব করেন – ওই গানের পরিণতির মতোই হয়তো গল্পে বর্ণিত 'কত্তা' ও 'গিন্নি'র একত্র সুখ পরবর্তীকালে স্থায়ী হয়নি। আর তখনই নামকরণে 'সেদিন' শব্দের প্রয়োগ অন্য মাত্রা লাভ করে। তবে একথা অনস্বীকার্য, পাঠকের নিজস্ব পাঠ-অভিজ্ঞতার ওপর এই জাতীয় ব্যাখ্যা নির্ভর করে। পাঠক যদি রবীন্দ্রনাথের গানটি না-শুনে থাকেন, তাহলে তিনি এই গল্পের গভীরতা অনুধাবনে কিছুটা অসফল হবেন। সেক্ষেত্রে যেহেতু গল্পে একটিও দু:খের মুহূর্ত

চিত্রিত হয়নি (শুধুমাত্র একবার বলা হয়েছে, “এহেন ধর্মপত্নীকে জন্মের ভাত-কাপড় প্রমিশ করে ফেলে কোন পতিদেবতার প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে না?”[১৩]) এবং গল্পটি শেষ হয় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক নৈকট্যের গাঢ়তায়, তাই শিরোনামে প্রযুক্ত ‘সেদিন’ শব্দের দূরবিস্তৃত বিরহের ব্যঞ্জনা পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। তাই বলা যায়, ‘সেদিন দুজনে’ গল্পের নামকরণে আন্তর্বয়ন প্রকৃতপক্ষে গোটা গল্পের শরীর জুড়ে সর্বজ্ঞ কথকের মনের ভাব প্রকাশের পরিবর্তে মনের প্রকৃত ভাব গোপন করার সহায়ক হয়েছে।

শিরোনামে আন্তর্বয়ানের প্রয়োগ ধনাত্মক সার্ব-আন্তর্বয়নের আওতাভুক্ত। গল্প এবং উল্লিখিত গানের প্রসঙ্গ সমগোত্রীয় হওয়ায় ধনাত্মক সার্ব-আন্তর্বয়ন (positive macro-intertextuality) দেখা গেল।

৩.৩.১.১.২. ‘সেদিন দুজনে’ গল্পে আবেশধর্মী (ALLUSION) অণু-আন্তর্বয়ন

‘সেদিন দুজনে’ গল্পে ‘enhance a subject’[১০] নয়, বরং ‘discripancy between the subject and the allusion’[১০]-এর প্রবণতাই বেশি দেখা যায়। গল্পে গিন্নির মই বেয়ে তিনতলায় ওঠার দৃশ্য নিঃসন্দেহে হাসির উদ্রেক করে,

> কত্তা ক্ষমা-প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসেন একটু। পরমুহূর্তেই পুনরায় ঊর্দ্ধমুখে, দুই কোমরে দুই হাত, গিন্নির সশরীরে স্বর্গারোহণের পুণ্যদৃশ্য ধ্যানস্থচিত্তে নিরীক্ষণ করেন।[১৪]

মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বে যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গারোহণ দৃশ্যের তুলনা স্মরণে আসা অনিবার্য। অথচ এই দুয়ের প্রসঙ্গে কিছুমাত্র মিল নেই। তাই আন্তর্বয়ানটি হল ঋণাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান (negative allusion)। উভয় পাঠের প্রসঙ্গের এই অমিলই কার্যত

হাস্যরস উৎপাদনের সহায়ক হয়েছে। এরূপ ঋণাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ানের নিদর্শন নবনীতার গল্পে আরও মেলে,

> ... ততক্ষণে তিনতলার জানলা দয়া করে দ্বিধা হয়েছেন এবং গিন্নিও তাতে প্রবেশ করে ফেলেছেন।[১৫]

ধরণী দ্বিধা হলে সীতার পাতাল প্রবেশের বহুচর্চিত দৃশ্য পাঠকের নিশ্চয় মনে পড়ে। অথচ গল্পের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ধনাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান (positive allusion)-এর উপস্থিতিও নবনীতার লেখায় বিরল নয়। উপস্থাপ্য বিষয়কে আরও স্পষ্ট করে তোলার জন্য অর্থাৎ, অ্যাব্রাম্‌সের ভাষানুযায়ী, বিষয়কে ‘illustrate’ বা ‘expand’ বা ‘enhance’ করার জন্যই এটির ব্যবহার। ‘সেদিন দুজনে’ গল্পে বসন্তকালীন মনোরম আবহাওয়া এবং সেই আবহাওয়ার দরুণ কর্ত্তা-গিন্নির ফুরফুরে মেজাজ তথা পরস্পরের প্রতি টইটুম্বুর প্রেম পাঠকের কাছে অনেক বেশি পরিস্ফুট হয়েছে অ্যালুশন তৈরি হয়েছে ব’লে। গল্পে যখন বিবৃত হয়,

> আবহাওয়াটি বড় মনোরম। ললিতলতা লবঙ্গলতা। পরিশীলন কোমল সেই সময় সমীরণে মোটেই ঠাণ্ডার কামড় নেই[১৬]

তখন জয়দেবের গীতগোবিন্দের ‘সামোদ-দামোদর:’ শীর্ষক প্রথম সর্গের পংক্তি মনে আসে,

> ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
> মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে।।[১৭]

৩.৩.১.১.৩. *‘সেদিন দুজনে’ গল্পে নির্দেশধর্মী (INDICATION) অণু-আন্তর্বয়ন*

কোনো একটি পাঠে বারবার একই ধরনের অ্যালুশন বা আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান দেখা গেলে, তার পরিণামে নির্দেশধর্মী আন্তর্বয়ন তৈরি হবার সম্ভাবনা থাকে। অর্থাৎ, লেখকের বিশেষ

কোনো অভীষ্ট বক্তব্যের ইঙ্গিত থাকা সম্ভব। বিষয়টি আমরা 'সেদিন দুজনে' গল্পের নিরিখে বোঝার চেষ্টা করব।

প্রথমত, গল্পটি শুরু হয় এইভাবে –

> এক যে ছিলেন কত্তা, তাঁর ছিল এক গিন্নি। কত্তাটি ফর্সা ধবধবে, লম্বা চওড়া – গিন্নি কালকাল ছোটখাট। কত্তা স্বল্পভাষী, গিন্নি বাকি্যনির্ঝর। কত্তা যেমনই সভ্যভব্য, কেতাদুরস্ত শান্তশিষ্ট, ভদ্রলোক – গিন্নি তেমনি ছটফটে, দুরন্ত, সভ্যতাবর্জিত, বন্যপ্রাণী। দুর্ধর্ষ গিন্নিকে সামলাতে সামলাতে ভালোমানুষ কত্তার প্রাণ যায়-যায়। এহেন গিন্নিকে নিয়ে কত্তা সংসার পেতে বসলেন কোথায়? না সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার হয়ে সেই মার্কিন মুলুকে।[১৮]

প্রথম বাক্যটি তো বটেই, সেইসঙ্গে পরের বাক্যগুলির অন্বয়, শব্দ চয়ন দেখলেই বোঝা যায়, এখানে রূপকথার ভাষাশৈলীর আবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, 'সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পারে'র চিত্রকল্প গল্পে আবারও ফিরে আসে –

> কিন্তু গিন্নি তো তখন পেছন ফিরে পেঁয়াজ কুচচ্ছেন, আর থেকে থেকে চোখ মুচ্ছেন। খানিকটা জল পেঁয়াজের জন্যে, আর বাকিটা সাতসমুদ্দুর তেরনদীর পারে ফেলে আসা দুটি বুড়োবুড়ির জন্যে।[১৯]

গিন্নির বাবা-মাকে 'দুটি বুড়োবুড়ি' ব'লে অভিহিত করার বিষয়টিও স্মর্তব্য। এসবই আসলে রূপকথার ভাষাভঙ্গির আবেশ সৃষ্টি করে।

তৃতীয়ত, লক্ষ করব দুটি দীর্ঘ বাক্য –

- একটা গাছে মস্ত মস্ত চওড়া সবুজ পাতার বাহার- আরেকটা গাছে বেগুনী ফুল ফুটে আছে থোকা থোকা, একটা ক্ষুদে গাছে ক্ষুদে ক্ষুদে কমলালেবু টুনি-বালবের মতো জ্বলছে, আর একটা ছোট লঙ্কাগাছে লাল টুকটুকে লঙ্কা ঝুমঝুম করছে।[২০]
- আর গিন্নি রান্নাঘরে অর্থাৎ তিনগজ তফাতে রান্নাবান্নার কোণটাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুটনো কোটেন কুটুর-কুটুর, বাসন মাজেন খুটুর-খুটুর, আর গড়গড় করে কথা বলেন।[২১]

একগুচ্ছ ধ্বন্যাত্মক শব্দ আর শব্দদ্বৈত প্রয়োগের পাশাপাশি এখানে রয়েছে অনুপ্রাস (alliteration)-এর প্রাচুর্য। দুটি বাক্যের মধ্যে প্রথম বাক্যের দিকেই আগে নজর দেওয়া যাক (দ্র. সারণি ২) –

একটা গাছে	/k/ ও /g/ উভয় কণ্ঠ্য ধ্বনিতে অনুপ্রাস (alliteration) হচ্ছে।
মস্ত মস্ত	শব্দদ্বৈত
চওড়া সবুজ পাতার বাহার	i) /ʧ/ ও /ʤ/ তালব্য ধ্বনিতে অনুপ্রাস ii) /b/, /p/ দ্বিওষ্ঠ্য ধ্বনিতে অনুপ্রাস iii) স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির ক্রম পাই, (CVVCV) (CVCVC) (CVCVC) (CVCVC) – প্রতি শব্দে ৫টি ধ্বনি, শেষ তিনটি শব্দে স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি একই ক্রমে সজ্জিত এবং শেষ দুটি শব্দে /a/-র স্বরমিত্রতা (assonance) তৈরি হয়।
আরেকটা গাছে	i) /a/ এবং /e/ ধ্বনির ক্রম স্বরমিত্রতা (assonance) তৈরি করে। ii) /k/, /g/ ধ্বনিতে অনুপ্রাস
বেগুনী ফুল ফুটে আছে	i) পরপর ৩বার দ্বিওষ্ঠ্য ধ্বনি(/b/, /p^h/)-র প্রয়োগে অনুপ্রাস ii) /u/ ধ্বনির স্বরমিত্রতা (assonance) iii) 'আছে'-র সাথে 'গাছে'-র ধ্বনিসাদৃশ্য
থোকা থোকা	শব্দদ্বৈত
একটা ক্ষুদে গাছে ক্ষুদে ক্ষুদে কমলালেবু	i) /k/, /k^h/ এবং /g/ কণ্ঠ্য ধ্বনির প্রাবল্যে তৈরি হয় অনুপ্রাস ii) 'ক্ষুদে' শব্দের বারংবার প্রয়োগ
কমলালেবু টুনি-বালবের মতো জ্বলছে	i) দ্বিওষ্ঠ্য ধ্বনি /m/ ও /b/-এর অনুপ্রাস ii) /l/-এর অনুপ্রাস
আর একটা ছোট লঙ্কাগাছে লাল টুকটুকে লঙ্কা ঝুমঝুম করছে	i) /k/ ও /g/ উভয় কণ্ঠ্য ধ্বনিতে অনুপ্রাস ii) /l/-এর অনুপ্রাস
টুকটুকে	ধ্বন্যাত্মক শব্দ
ঝুমঝুম	ধ্বন্যাত্মক শব্দ

সারণি ২: বাক্যের ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

একইভাবে, দ্বিতীয় বাক্যটিতেও শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুপ্রাসের যথেষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়, যা রূপকথার ভাষাশৈলীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থত, গল্প ক্রমশ অগ্রসর হলে পাওয়া যায়,

‘পাইপের বদলে মই পেলুম টাক ডুমাডুম ডুম।’[২২]

এই বাক্যটি পড়ামাত্র বাঙালি পাঠক শৈশবে শোনা শেয়ালের নাকে বেগুনকাঁটা ফোটার গল্পটির দুই পংক্তি মনে মনে আওড়ে নেবেন – নাকের বদলে নরুন পেলাম/টাক ডুমাডুম ডুম ... হাঁড়ির বদলে কনে পেলাম/ টাক ডুমাডুম ডুম।

পঞ্চমত, গল্পের একেবারে শেষে গিয়ে পাওয়া যায় ‘বন্দিনী কন্যেটিকে উদ্ধার’[২৩] করার মতো চিরাচরিত রূপকথার চিত্রকল্প।

সুতরাং, বিশ্লেষণ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে নবনীতা তাঁর ‘সেদিন দুজনে’ গল্পে রূপকথার ভাষাবৈশিষ্ট্যের আবেশ (allusion) সৃষ্টি করেছেন। গল্পটি শেষ পর্যন্ত শিশু-কিশোর সাহিত্য না-হয়েও একরকম ছদ্ম রূপকথার আদল সৃষ্টি করে। প্রাপ্ত-বয়স্ক পাঠকের জন্য রচিত গল্পে বারংবার রূপকথার ভাষাছাঁদের আবেশ তৈরি করার ফলে আবেশধর্মী আন্তর্বয়ানগুলি সমষ্টিগতভাবে আন্তর্বয়নের প্রকৃতিকে নির্দেশধর্মী (indication) স্তরে পৌঁছে দিয়ে নতুন এক অর্থের মাত্রা নির্দেশ করে। ‘সেদিন দুজনে’ শিরোনাম যেমন শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনে বিরহের বোধ জাগায়, তেমনি রূপকথার ভাষাবৈশিষ্ট্যের আত্তীকরণও কার্যত রূপকথার জগতের বিপরীতমুখী বোধের জন্ম দেয়। রূপকথার সব পেয়েছির দেশ বাস্তবজীবনে বড়ই ক্ষণস্থায়ী, এমন এক বিষন্নতার ইঙ্গিত আছে গল্পের আদ্যোপান্ত। আর যেহেতু এই নির্দেশধর্মী আন্তর্বয়ন এই গল্পে উৎসপাঠের (অর্থাৎ এক্ষেত্রে রূপকথার) বিপরীতমুখী ভাব জাগায়, অর্থাৎ রূপকথার প্রসঙ্গ অপেক্ষা ভিন্নধর্মী প্রসঙ্গকে নির্দেশ (indicate) করে, তাই এটি ঋণাত্মক নির্দেশধর্মী আন্তর্বয়ান।

৩.৩.১.২. 'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পের আন্তর্বয়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণ

'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পে দেখা যায়, লেখিকা তিন প্রজন্মে ভালোবাসা সম্পর্কিত ধারণার বিবর্তন নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখবেন ব'লে অনেকের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন। এই সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েই লেখিকা কী জাতীয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন এবং কী সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, তাই নিয়েই গল্পটি।

৩.৩.১.২.১. 'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পে সার্ব-আন্তর্বয়ন

'সেদিন দুজনে' গল্পের মতোই 'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পের শিরোনামটিও একটি আন্তর্বয়ান। এটির উৎসও একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত। গানটির সংশ্লিষ্ট অংশ নিচে উল্লেখ করা হল,

> সখী, ভাবনা কাহারে বলে। সখী, যাতনা কাহারে বলে।
> তোমরা যে বলো দিবস-রজনী 'ভালোবাসা' 'ভালোবাসা' –
> সখী, ভালোবাসা কারে কয় ! সে কি কেবলই যাতনাময়।[২৪]

রবীন্দ্রনাথের এই গানে ভালোবাসা সম্পর্কে উঠে আসে নানা প্রশ্ন ("ভাবনা কাহারে বলে", "যাতনা কাহারে বলে", "ভালোবাসা কারে কয়"), উঠে আসে ছদ্মপ্রশ্নের আড়ালে কিছু নেতিবাচক মন্তব্য ("সে কি কেবলই যাতনাময়", "সে কি কেবলই চোখের জল", "সে কি কেবলই দুখের শ্বাস") এবং শেষ পর্যন্ত একটা সদর্থক মনোভাব ফুটে ওঠে ("আমার চোখে তো সকলই শোভন" ইত্যাদি) – ভালোবেসে যে সুখলাভ হয়, সেই সুখানুভূতির কথা বলা হয়েছে।

'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পেও অনুরূপ কৌশল দেখা যায়। অর্থাৎ, প্রথম দিকে ভালোবাসা সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন ও সংশয় (লেখিকা বিভিন্ন মানুষের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে প্রেম কী, তা জানতে চাইছেন), তারপর বেশ কিছু নঞর্থক মনোভাবের উদয় (যেমন -

প্রেম পড়াশোনা তথা কেরিয়ার তৈরির ক্ষেত্রে মস্ত একটা প্রতিবন্ধক, প্রেম একইসঙ্গে সময় ও অর্থ অপচয়ের কারণ, বর্তমান যুগে প্রেম করে বোকারা আর ন্যাকারা; বাকিদের কাছে প্রেম হল একটা 'ফান' ইত্যাদি) এবং শেষে ভালোবাসা বিষয়ে সদর্থক অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায় (যেমন – "মনে মনে সক্কলেই প্রেমে বিশ্বাস করে"[২৫], "যেমন বুকের মধ্যে ভগবানের নাগাল না পেলেই লোকে বলতে থাকে ভগবানে বিশ্বাস করি না, অথচ যন্ত্রণা, অপমান, পরাজয়ের মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে দৈবের নাগাল পেতে চায় অবিশ্বাসীও, এরাও তেমনি"[২৬] ইত্যাদি)।

এখানে নিঃসন্দেহে ধনাত্মক সার্ব-আন্তর্বয়ন পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, উক্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং গল্প – দুটিতেই ভালোবাসা সম্পর্কিত অনুভূতির আলোচনাই হয়েছে প্রসঙ্গ এবং সেই বক্তব্যের গঠনরীতিও সমধর্মী।

৩.৩.১.২.২. 'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পে উদ্ধৃতিমূলক (QUOTATION) অণু-আন্তর্বয়ন

গল্পের যেসব অংশে উদ্ধৃতিচিহ্নযুক্ত এবং উদ্ধৃতিচিহ্নহীন উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি নিচের সারণিতে নিম্নরেখাঙ্কিত করা হল। সেইসঙ্গে প্রতিটি উদ্ধৃতির উৎস নির্দেশ করা হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	**'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি**	**উদ্ধৃতির উৎসপাঠ**
i.	প্রেমের মূলতত্ত্বই হলো, শতং করো, মা বলো। আর বলাই বাহুল্য, কদাচ মা লিখ।[২৭]	শতং বদ মা লিখ (প্রবাদ বাক্য)
ii.	এমন সময়ে...বাজিল কাহার বীণা?[২৮]	"বাজিল,কাহার বীণা মধুর স্বরে"[২৯]
iii.	নাটকীয়ভাবে হাতজোড় করে জ্যাকি শ্রফ মার্কা গোঁফের তলায় নকল করে মিষ্টি হেসে কুনাল বলে – "আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা" – বলেই লাইব্রেরির দরজায় সেঁধিয়ে যায়।[৩০]	"দিনে দিনে অর্ঘ্য মম/পূর্ণ হবে, প্রিয়তম,/আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা।।"[৩১] (মহুয়া কাব্যের 'অসমাপ্ত' কবিতা)
iv.	হাসতে হাসতে মন্দাকিনী বলে – "শ্রীচৈতন্যদেবের	প্রবাদবাক্য। তবে এর পিছনে

	টাইপের। মেরেছে কলসির কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না? আমি সেই টাইপ।...”[৩২]	রয়েছে চৈতন্যজীবনীতে বর্ণিত জগাই-মাধাই কেন্দ্রিক প্রসিদ্ধ কাহিনি।
v.	‘হে মাধবী-দ্বিধা-কেন-আসিবে-কি-ফিরিবে কি’-র মতো করে আমি বলি – “কি ব্যাপার? এত কিন্তু-কিন্তু কিসের? এই কি নতুন আসছিস? নাকি তোরা রিমঝিম? আর প্রতিম? আয় না ওপরে আয়, শুধু শুধু অত ভয় পাচ্ছিস কেন? বোস্ এখানে। (আমি আছি গিন্নি আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে!)[৩৩]	প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের একটি গান[৩৪] দ্বিতীয়টি সুকুমার রায়ের ‘ভয় পেয়ো না’ কবিতা[৩৫]

সারণি ৩: “ভালোবাসা কারে কয়” গল্পে উদ্ধৃতি ও তার উৎস

এবার আমরা পরপর উপরোক্ত উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ানগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করব।

i. **ধনাত্মক উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান →** ‘শতং বদ মা লিখ’ কথাটির অর্থ হল, মুখে আমরা কটূক্তি, মিথ্যা ভাষণ, নিন্দা, অশ্লীল মন্তব্য ইত্যাদি যা কিছু অনুচিত বাক্য বলি না কেন, সেইসব কথা কখনোই লিখিত আকারে প্রকাশ করা উচিত নয়। তাহলে তা প্রমাণ হিসেবে থেকে যাবে এবং মানহানির কারণ হতে পারে।

এবার আসা যাক গল্পে প্রযুক্ত অংশে। লেখিকাকে সম্পাদক মহাশয় প্রেম বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে বলেছেন। তিনি পড়েছেন মুশকিলে। কারণ প্রেম কী, তা অনুভবযোগ্য; মনের কাছেই তার যাবতীয় আবেদন। কথা কিংবা লেখা কোনো মাধ্যমেই এটি প্রকাশযোগ্য নয়। ফলে এই প্রকাশের অযোগ্য বিষয়ের সূত্রেই উক্ত প্রবাদটির সঙ্গে গল্পের এই অংশের প্রাসঙ্গিক মিল। এটি তাই ধনাত্মক উদ্ধৃতি। তিনি প্রবাদবাক্যটিকে প্রয়োজন মতো খানিক বদলে নিয়ে প্রয়োগ করেছেন।

ii. **দুর্বলভাবে ধনাত্মক উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান →** গল্পের সংশ্লিষ্ট অংশের সাথে গানের প্রায় কোনো রকম প্রাসঙ্গিক মিল নেই বললেই চলে। গল্পে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিতে বীণা বাজার কথা

বলা হলেও আসলে একটি ডোরবেল বেজেছে। প্রাসঙ্গিক মিল যদি স্বল্প মাত্রায় থাকেও, তাহলে তা কেবলমাত্র ডোরবেল (গল্পে) এবং বীণা (গানে) বেজে ওঠার আকস্মিকতায় এবং বীণাবাদক ও ডোরবেল যে বাজিয়েছে তাদের অনির্দেশ্যতায়। ফলে এখানে আমরা ধনাত্মক উদ্ধৃতি পেলেও, তা দুর্বলভাবে ধনাত্মক।

iii. **ঋণাত্মক উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান →** উৎসপাঠের সঙ্গে এই অংশের কোনো প্রাসঙ্গিক মিল নেই। ঋণাত্মক উদ্ধৃতি এটি। রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যের 'অসমাপ্ত' কবিতায় প্রিয়তমের প্রতি প্রিয়তমার আত্মনিবেদনের আকাঙ্ক্ষা ও অপারগতা ফুটে ওঠে। কিন্তু গল্পে উদ্ধৃতিটি লেখিকাকে তাঁর ছাত্র বলেছে। বেশ খানিক্ষণ ধরে প্রেম সম্বন্ধে তার মতামত ব্যক্ত করার পর যখন সে অধৈর্য হয়ে পড়েছে, তখন তাড়াতাড়ি লেখিকাকে বিদায় জানিয়ে চলে যাবার জন্যই সে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে একটি অংশ উদ্ধার করেছে। এই উদ্ধৃতিটি আসলে তার বিদায় জানানোর সুভাষণ রীতি (euphemism)-তে পরিণত হয়েছে।

তাছাড়া, এই তৃতীয় উদাহরণে আরও একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। এখানে উদ্ধৃতি এবং আবেশ (allusion) উভয়ে মিলে একটা ইমেজ তৈরি করেছে। 'জ্যাকি শ্রফ মার্কা গোঁফ' একটা আবেশ সৃষ্টি করে। তারপর যখন পুরো বাক্যটিতে দেখা যায়, নাটকীয় ভঙ্গিতে কুনালের নমস্কার করা এবং তার 'জ্যাকি শ্রফ মার্কা গোঁফ', তার নকল হাসি আর সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে উদ্ধৃতি টেনে সুভাষণ রীতিতে শিক্ষিকাকে (অর্থাৎ লেখিকাকে) বিদায় জানানো, তখন এই সবটা মিলে তৈরি হয় কুনাল চরিত্রের ইমেজ।

iv. **ঋণাত্মক উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান →** চতুর্থ উদাহরণটিও একটি ঋণাত্মক উদ্ধৃতি। গল্পে দেখা যায়, প্রেম ক'রে যদি আঘাত আসে, তবুও মন্দাকিনী কখনো প্রেমের প্রতি বিমুখ হয় না। আঘাত পাওয়া সত্ত্বেও ভালোবাসায় তার অটুট বিশ্বাস – এই বিষয়টিকে অবলম্বন ক'রেই উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আসলে কোনো প্রাসঙ্গিক মিল নেই। কারণ,

চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম আপামর জনসাধারণের হৃদয়ে পারস্পরিক ভেদাভেদহীন ভালোবাসা জাগিয়ে তোলার কথা বলে। যে ভালোবাসা জগাই-মাধাইয়ের মতো দুর্বৃত্তকেও সুপথে এনে তাকে আপন ক'রে নেয়, তা সর্বব্যাপী মানবপ্রেম। কিন্তু 'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পের মন্দাকিনীর প্রেম নিছকই কামনা-বাসনাযুক্ত নারী-পুরুষের প্রেম।

v. **দুর্বলভাবে ঋণাত্মক উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান →** লেখিকার বাড়িতে তাঁর মেয়ের দুই বন্ধুর আসার যে দ্বিধা তার সঙ্গে 'হে মাধবী, দ্বিধা কেন' গানের প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক খুব বেশি নেই। গানে আমরা দেখি, প্রকৃতির আঙিনায় চামেলি, বকুল, করবী, শিরীষ এলেও, মাধবী এখনো পদার্পণ করেনি। তাই মাধবীর কাছে কবির প্রশ্ন –

> হে মাধবী, দ্বিধা কেন, আসিবে কি ফিরিবে কি—
> আঙিনাতে বাহিরিতে মন কেন গেল ঠেকি।।[৩৪]

অন্যদিকে, গল্পে আমরা জানতে পারি, মেয়ের সামনে পরীক্ষা ব'লে লেখিকা কিছুদিন আগেই বাড়িতে মেয়ের বন্ধুদের জমায়েত দেখলেই রেগে গিয়ে তাড়াতাড়ি তাদেরকে ভাগিয়ে দিয়েছেন। তাই এখন তারা লেখিকার বাড়িতে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত। অতএব, উভয় পাঠে দ্বিধা বিষয়ে প্রাসঙ্গিক সাদৃশ্য নেই। তাই উভয় প্রসঙ্গের ঋণাত্মক সম্পর্ক বলাই যায়। কিন্তু আমরা খেয়াল করব, নবনীতা লিখেছেন –

> 'হে মাধবী-দ্বিধা-কেন-আসিবে-কি-ফিরিবে কি'-র মতো করে আমি বলি[৩৩]

অর্থাৎ, তিনি বলার ভঙ্গিমার ওপর জোর দিতে চাইছেন। এবার এই গানের দিকে খেয়াল করলে আমরা বুঝতে পারব, সেই সুরের[৩৬] মধ্যেও একাধারে দ্বিধার ও দ্বিধাগ্রস্তকে অভয়দানের অভিব্যক্তি মিশে আছে। অন্যদিকে গল্পে দেখা যায়, ইতিপূর্বে যে ছেলে দুটিকে লেখিকা নিজেই 'রৈ-রৈ শব্দে ভাগিয়ে' দিয়েছিলেন, সেই তাদেরকেই যখন তিনি বাড়ির ভিতরে আসতে

বলছেন, তখন তাঁর কণ্ঠস্বরেও ওই গানের মতোই যেন খানিক দ্বিধা ও দ্বিধাগ্রস্তকে অভয়দানের অভিব্যক্তি মিশে থাকে। কণ্ঠস্বরের এই ভঙ্গিতে তিনি বলতে থাকেন –

> কি ব্যাপার? এত কিন্তু-কিন্তু কিসের? এই কি নতুন আসছিস? নাকি তোরা রিমঝিম? আর প্রতিম? আয় না ওপরে আয়, শুধু শুধু অত ভয় পাচ্ছিস কেন? বোস্ এখানে।[৩৩]

সুতরাং এই মিলটুকুর দরুন ঋণাত্মক উদ্ধৃতি হয়েও, তা দুর্বলভাবে ঋণাত্মক।

ধনাত্মক উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান → অভয়দানের প্রসঙ্গেই আসে সুকুমার রায়ের 'ভয় পেয়ো না' থেকে গৃহীত আন্তর্বয়ান –

> আমি আছি গিন্নি আছেন, আছেন আমার নয় ছেলে[৩৩]

এক্ষেত্রে আবার ধনাত্মক উদ্ধৃতি পাচ্ছি। কারণ, উক্ত ছড়ায় আমরা দেখেছি, সত্যই যে ভীতিপ্রদ, সে একটি ছোট ছেলেকে নিজের শিকারে পরিণত করবে ব'লে তাকে মিথ্যে অভয় দিয়ে আকর্ষণ করছে। অন্যদিকে গল্পেও আমরা দেখি, লেখিকা আগন্তুক ছেলে দুটির কাছে সত্যই ভীতিপ্রদ। কারণ আগে একদিন তারা এই লেখিকার কোপের মুখে প'ড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আর এখন লেখিকা তাদেরকেই অভয়দান ক'রে ডাকছেন নিজের প্রয়োজনে। প্রয়োজন একটাই – প্রেম বিষয়ে সাক্ষাৎকার নেওয়া।

৩.৩.১.২.৩. 'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পে আবেশধর্মী (ALLUSION) অণু-আন্তর্বয়ন

গল্পের যেসব অংশে আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান এসেছে, সেগুলির কয়েকটি নিচের সারণিতে পরপর তুলে ধরা হল। সেইসঙ্গে ক্রমান্বয়ে প্রতিটির উৎস নির্দেশ করা হল।

ক্রমিক সংখ্যা	'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পে ব্যবহৃত আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান	আবেশধর্মী আন্তর্বয়ানের উৎসপাঠ
i.	তাঁদের বধিবে যাঁরা, তাঁদের কে যে এখন কোন্	কংসবধের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের গোকুলে বেড়ে

	গোকুলে বর্ধমান তা কি আমি জানি?[৩৭]	ওঠার পৌরাণিক কাহিনি
ii.	কৃষ্ণের বাঁশির জন্য শ্রীরাধিকার আকুল প্রতীক্ষাও এই আমার কাছে তুশ্চু![৩৮]	বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত কৃষ্ণপ্রেমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য শ্রীরাধিকার কৃষ্ণের বাঁশি শোনার আকুল প্রতীক্ষা
iii.	হিন্দি সিনেমাতে ভিলেনই হোক, হিরোই হোক এমনি একটা সময়ে নিজেই নিজের দু'গালে বাঁ-হাত বুলোতে থাকে। তারপর ডান হাতে ঘুষি মারে। ('শাহেনশা'তে অবশ্য উলটো।)[৩৯]	সাধারণত হিন্দি সিনেমার অ্যাক্শন দৃশ্যের আগে হিরো বা ভিলেনের আচরণ। অমিতাভ বচ্চন অভিনীত প্রখ্যাত হিন্দি সিনেমা 'শাহেনশা'র কথা বলা হয়েছে।

সারণি ৪: "ভালোবাসা কারে কয়" গল্পে আবেশ ও তার উৎস

উপরোক্ত আন্তর্বয়ানগুলির প্রকৃতি নির্ধারণ করা হল –

i. **ঋণাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান →** গল্পে সংশ্লিষ্ট অংশে লেখিকা নিজের ছোট ছোট দুই মেয়ের ভবিষ্যতের অজানা প্রেমিক সম্পর্কে উক্তিটি করেছেন। লক্ষণীয়, নবনীতা এখানে গোকুলে বর্ধমান কৃষ্ণের আসন্ন কংসবধের যে অ্যালুশন তৈরি করলেন, তার ফলে যে নতুন একটি মেটাফর তৈরি হল, সেটি নিম্নরূপ-

'প্রেমে পড়া হল বধ হওয়া'

এখানে, 'বধ হওয়া' হল মেটাফরের উৎসক্ষেত্র (source domain), যার দ্বারা আমরা 'প্রেমে পড়া'-র প্রকৃতিকে চিনছি। অর্থাৎ, 'প্রেমে পড়া' হল মেটাফরের লক্ষ্যক্ষেত্র (target domain)। মেটাফর সৃষ্টিতেই এখানে আবেশধর্মী আন্তর্বয়ানটি ব্যবহারের সার্থকতা। প্রকৃতপক্ষে কংসবধ এবং কৃষ্ণের বড় হবার সঙ্গে গল্পের কোনোরকম প্রাসঙ্গিক মিল নেই। তাই এটি অবশ্যই ঋণাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান। কংসবধ এবং লেখিকার দুই মেয়ের প্রেমে বধ হবার মেটাফরিকাল সাদৃশ্য এবং একইসঙ্গে এই দু'য়ের প্রাসঙ্গিক বৈসাদৃশ্য বা ঋণাত্মকতা একত্রে পাঠকের মনে হাস্যরসের উদ্রেক করেছে।

ii. **ঋণাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান →** গল্পে দেখা যায়, লেখিকা প্রেম বিষয়ে প্রবন্ধ লিখবেন ব'লে প্রেম সম্পর্কে কার কী অভিমত, তা জানার জন্য তাঁর মেয়ের বন্ধুদের সাক্ষাৎকার নিতে উদ্যোগী হন। তাই তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন কখন তাঁদের বাড়িতে ডোরবেল বাজবে আর তিনি সেই আগন্তুককে প্রেম সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন করতে শুরু করবেন। তাঁর এই ডোরবেল বেজে ওঠার প্রতীক্ষা যে কতখানি তীব্র, তা বোঝানোর জন্যই তিনি কৃষ্ণের বাঁশির জন্য শ্রীরাধিকার আকুল প্রতীক্ষার একটা আবেশ তৈরি করেছেন, যদিও প্রেমিকা রাধার অপেক্ষা আর সাক্ষাতকার গ্রহীতা লেখিকার অপেক্ষার মধ্যে প্রাসঙ্গিক সাদৃশ্যের কোনও অবকাশ নেই। তাই এটি ঋণাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান।

তবে এসব ক্ষেত্রে আমরা নবনীতার লেখায় একটা বৈশিষ্ট্য প্রায়শই খুঁজে পাই। অনেক সময় তিনি অ্যালুশন তৈরি করেও সঙ্গে সঙ্গেই সেই নির্মিত অ্যালুশনকে ভেঙে দেন। যেমন, উক্ত রাধিকার অ্যালুশনকে তিনি বাক্যের শেষে 'তুশ্চু' শব্দের প্রয়োগের মাধ্যমে অস্বীকার করেছেন। এই অস্বীকার করার ফলেই গল্পের আলোচ্য অংশে আরও বেশি মাত্রায় কৌতুক সৃষ্টি হয়েছে। যেন লেখিকার ব্যাকুলতা কৃষ্ণের জন্য রাধার ব্যাকুলতাকেও হার মানায়। এভাবে আবেশ বা অ্যালুশন তৈরি করে তাকে ভেঙে দেবার প্রবণতা আমরা পরের উদাহরণেও দেখতে পাব।

iii. **ঋণাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান →** গল্পে দেখা যায়, সদ্য কলেজ পাশ করা সুদীপকে যখন লেখিকা প্রশ্ন করেন যে প্রেম সম্পর্কে সে ঠিক কী ভাবছে, তখন সে চেয়ারে ব'সে তেরচা চাউনিতে একদৃষ্টিতে লেখিকার দিকে তাকিয়ে থাকে। সুদীপের এই সময়কার মনোভাবকে স্পষ্ট করে তুলতেই যেন হিন্দি সিনেমার অ্যাক্‌শন হিরো বা ভিলেনের আবেশ, আরও বিশেষভাবে 'শাহেনশা' সিনেমার নামচরিত্র শাহেনশার আবেশ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু গল্পের সঙ্গে উৎসের কোনো প্রাসঙ্গিক মিল না-থাকায় আন্তর্বয়ানটি

হয়েছে ঋণাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান। এই আবেশের প্রকৃতি এতটাই ঋণাত্মকধর্মী যে লেখিকা পরের বাক্যেই আবেশটি ভেঙে দিয়েছেন। কারণ, লেখিকা তথা অধ্যাপিকা নবনীতাকে ছাত্র সুদীপের ঘুঁষি মারার এতটুকু সম্ভাবনাও অকল্পনীয়। পরের বাক্যটি হল – "সুদীপ ঘুঁষি মারবে না, জানি"[৩৯]।

৩.৩.১.৩. 'মঁসিয়ো হুলোর হলিডে' গল্পের আন্তর্বয়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণ

বাড়ির তিনতলার কার্নিশে আটকে পড়া একটি বেড়ালকে কীভাবে ফায়ার ব্রিগেডের লোক ডেকে বহু কসরতের পর উদ্ধার করা হল, তা নিয়ে একটি হাস্যরসাত্মক গল্প হল 'মঁসিয়ো হুলোর হলিডে'। উদ্ধারকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর বেড়ালটি লেখিকার কোল থেকে নেমে যাওয়ার আগে তাঁকে সবলে আঁচড়ে এবং কামড়ে দিয়ে চলে যায়।

৩.৩.১.৩.১. 'মঁসিয়ো হুলোর হলিডে' গল্পে সার্ব-আন্তর্বয়ন

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী –

> বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
> জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।[৪০]

'মঁসিয়ো হুলোর হলিডে' গল্পের শিরোনামের পরেই যে বাক্যটি আমরা দেখতে পাই সেটি হল -

> "জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"[৪১]

এরপর নতুন একটি অনুচ্ছেদ থেকে গল্প বলা আরম্ভ হচ্ছে। এর থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ওই বাক্যটি গোটা গল্পের একটা ভাবমূর্তি ধারণ করে আছে। বেড়ালের প্রতি দয়ার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরসেবার প্রক্রিয়া এবং পরিণাম যে সর্বদা সুখকর নয়, সেটাই এই গল্পের উপজীব্য।

৩.৩.১.৩.২. *'মঁসিয়ো হুলোর হলিডে' গল্পে আবেশধর্মী (ALLUSION) অণু-আন্তর্বয়ন* ধনাত্মক

আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান → বাড়ির কার্নিশে আটকে পড়া একটি বেড়ালের কান্না কোথা থেকে আসছে প্রথমে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। তখন লেখিকার মনে পড়ে -

> ভূতেরা যে মাঝে মাঝেই বেড়াল সেজে দেয়ালের ভেতর থেকে কাঁদে – একথা পো-সাহেব লিখে রেখে গেছেন।[৪২]

আমেরিকান সাহিত্যিক Edgar Allan Poe-র ছোটগল্প 'The Black Cat'-এ আমরা এই দৃশ্য দেখতে পাই[৪৩]। নবনীতার গল্পটিতে শ্রোতার অবস্থান থেকে বেড়ালের ডাক শুনতে ঠিক কেমন লাগছিল, তা পাঠক যাতে আরও ভালোভাবে অনুভব করতে পারেন, সেজন্যই গল্পকার Poe বর্ণিত ভৌতিক বেড়ালের ডাকের আবেশ তৈরি করা হয়েছে। এই আবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিশ্চয় Abrams কথিত "to illustrate or expand upon or enhance a subject"[১০]। সুতরাং, এই অংশে পাওয়া যায় ধনাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান।

৩.৩.১.৩.৩. *'মঁসিয়ো হুলোর হলিডে' গল্পে উদ্ধৃতিমূলক (QUOTATION) অণু-আন্তর্বয়ন*

গল্পের যেসব অংশে উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান এসেছে, তা হতে পারে উদ্ধৃতিচিহ্নযুক্ত কিংবা উদ্ধৃতিচিহ্নহীন, সেগুলির মধ্য থেকে দুয়েকটি নিদর্শন নিচের সারণিতে নিম্নরেখাঙ্কিত করে দেখানো হল। সেইসঙ্গে ক্রমান্বয়ে প্রতিটি উদ্ধৃতির উৎস নির্দেশ করা হল।

ক্রমিক সংখ্যা	**'মঁসিয়ো হুলোর হলিডে' গল্পে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি**	**উদ্ধৃতির উৎসপাঠ**
i.	"বলিছে দেওয়াল ঘড়ি টিক টিক টিক।"[৪৪]	"বলিছে সোনার ঘড়ি, "টিক্ টিক্ টিক্, যা কিছু করিতে আছে, করে ফেল ঠিক।"[৪৫]
ii.	আমি হলুম একদার ম্যাটারহর্নের অভিযাত্রী, আমি কি ডরাই কভু সামান্য কার্নিশে?[৪৬]	দানব-নন্দিনী আমি, রক্ষ-কুল-বধূ; রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,- আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?[৪৭]

সারণি ৫: "মঁসিয়ো হুলোর হলিডে" গল্পে উদ্ধৃতি ও তার উৎস

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলির প্রকৃতি নির্ধারণ করা হল –

দুটি উদাহরণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, উৎসপাঠের বাক্যকে বর্তমান পাঠের প্রসঙ্গ অনুসারে সামান্য বদলে নিয়ে উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

i. **ঋণাত্মক উদ্ধৃতি** → উৎস-পাঠে অর্থাৎ ছড়ায় দেখা গেছে, সকলকে সময়ের মূল্য সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে। সময় কখনো থেমে থাকে না। তাই প্রয়োজনীয় কাজ নির্দিষ্ট সময়ে করে ফেলতে হবে। কিন্তু গল্পে আমরা এই সময়ের মূল্য সম্পর্কে সচেতনতামূলক কোনো প্রসঙ্গ পাইনি। সেখানে দেখা যাচ্ছে, কার্নিশ থেকে বেড়াল যাতে নেমে আসতে পারে সেজন্য কার্নিশের সামনে একটি মই রেখে দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বেড়াল নেমে আসার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। দীর্ঘ সময়ব্যাপী এই অপেক্ষা যে কতখানি অসহনীয়, সেটা বোঝাতেই "বলিছে দেওয়াল ঘড়ি টিক টিক টিক" উদ্ধৃতির ব্যবহার। সুতরাং এটি একটি ঋণাত্মক উদ্ধৃতি।

ii. **ঋণাত্মক উদ্ধৃতি** → আমরা বুঝতে পারছি, অদম্য সাহসী ও দৃঢ় মনোভাব বোঝাতেই নবনীতা মেঘনাদবধ কাব্যের প্রমীলার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, যাতে তাঁর মানসিক ও একইসঙ্গে শারীরিক শক্তির সঙ্গে কিছুটা হলেও পাঠক প্রমীলার তুলনা করে নিতে পারেন। তবে এই দুই পাঠের প্রাসঙ্গিক মিল নেই। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রামসেনা দ্বারা বেষ্টিত লঙ্কাপুরে প্রবেশ ক'রে স্বামী মেঘনাদের কাছে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং পারিবারিক বীরত্বের ঐতিহ্যের স্মরণ – এই হল পতিবিরহে ব্যাকুল প্রমীলার বীরত্বসূচক উক্তিটির অব্যবহিত প্রসঙ্গ। অন্যদিকে, বিপদগ্রস্ত বেড়ালটিকে উদ্ধার করার অদম্য ইচ্ছা এবং ম্যাটারহর্ন যাত্রাকালীন সাহসিকতার স্মরণ হল গল্পের সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ।

৩.৩.১.৪. 'ডক্টর দেবসেনের বিদেশযাত্রা' গল্পের আন্তর্বয়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণ

নবনীতা দেবসেনের আরও অনেক গল্পের মতোই 'ডক্টর দেবসেনের বিদেশযাত্রা' গল্পেও কেন্দ্রীয় চরিত্র তিনি নিজেই। ১৯৭৩ সালে কানাডায় কম্পারেটিভ লিটারেচার কন্‌ফারেন্স, প্যারিসে ওরিয়েন্টালিস্ট কংগ্রেস এবং লণ্ডনে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সেমিনার – এই তিনটিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে নবনীতাকে পথে কীরকম সব বিভ্রাটে পড়তে হয়েছিল, তা নিয়ে এই হাসির গল্পটি তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন।

৩.৩.১.৪.১. *'ডক্টর দেবসেনের বিদেশযাত্রা' গল্পে আবেশধর্মী (ALLUSION) অণু-আন্তর্বয়ন*

প্রথমে আমরা এই গল্প থেকে কয়েকটি আবেশধর্মী আন্তর্বয়ানের দৃষ্টান্ত পরপর দেখে নেব –

i. সর্বংসহা ধরিত্রী এতে দ্বিধা হলেন না, বরং আকাশকেই দ্বিখণ্ডিত করে আমাদের জেট প্লেন উড়ে গেল।[৪৮]
ii. 'এই তো! পেয়েছি, পেয়েছি!' – চীৎকার করে উঠলেন ডক্টর দেবসেন, আর্কিমিডিসের মতো মহোল্লাসে।[৪৯]
iii. ভার্জিনিয়ার ফরেস্ট রেঞ্জার রয় সলিভ্যান ছ-ছ'বার বজ্রাহত হয়েও, বহাল তবিয়তে বেঁচে থেকে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করেছেন বলে পড়েছি। আর এই বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ বিদেশে যেতে গিয়ে শতবার বজ্রাহত হয়েও বহাল তবিয়তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।[৫০]

ওপরের তিনটি আবেশ কীভাবে তৈরি হল, তা এবার ক্রমানুসারে নিচে বিশ্লেষণ করা হল।

i. **দুর্বলভাবে ধনাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান →** প্রথম দৃষ্টান্ত থেকে আমরা সহজেই বুঝে যাই যে ধরিত্রীর দ্বিধা হওয়ার ব্যাপারটিই হল আন্তর্বয়ান এবং এর উৎস হল আদিকাব্য রামায়ণ। বিনা অপরাধে রাম কর্তৃক সর্বসমক্ষে অপমানিত সীতা সেই মুহূর্তে নিজেকে সেই স্থান-কাল-পাত্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ধরিত্রী মায়ের কোলে আশ্রয় নেবার জন্য তাঁকে দ্বিধা হওয়ার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। আলোচ্য গল্পে অবশ্য ডক্টর দেবসেন নিরপরাধ নন। একমাত্র ডক্টর দেবসেনের দেরিতে প্লেনে পা রাখার জন্য প্লেন তার সমস্ত যাত্রী সমেত পুরো দু'মিনিট দেরিতে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। আর এই কথাটাই কো-পাইলট সমস্ত যাত্রীর

সামনে যখন তাঁকে বলেন, তখন তা যে তাঁর পক্ষে কতখানি লজ্জাজনক, সেইটি বোঝাতেই ধরিত্রী দ্বিধা হওয়ার প্রার্থনার অ্যালিউশন তৈরি করা হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে, দুটি পাঠেই সর্বসমক্ষে অপমান ও লজ্জার প্রসঙ্গ রয়েছে ঠিকই, কিন্তু একটিতে বিনা দোষে অপমান এবং অন্যটিতে অপমানজনক পরিস্থিতির যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তাহলে আমরা এই অ্যালিউশনকে ধনাত্মক বললেও, তা আসলে দুর্বলভাবে ধনাত্মক।

ii. **দুর্বলভাবে ধনাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান →** গ্রিক গণিতজ্ঞ আর্কিমিডিস তাঁর বিখ্যাত 'আর্কিমিডিস সূত্র' আবিষ্কারের পর আনন্দের উত্তেজনায় 'ইউরেকা' বলতে বলতে যেভাবে দৌড়েছিলেন, সেই দৃশ্যের আবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে গল্পের এই অংশে। গল্পে দেখা গেছে, ব্যাগ হারিয়ে যাওয়ার পর বিদেশের মাটিতে নবনীতার পরনের কাপড়টি ছাড়া আর পরিধেয় কিছুই ছিল না। তখন 'ফাইভ ডলার স্টোর্স' থেকে দশ ডলারে একটা শার্ট আর একটা ঢলঢলে ব্লু জিনস কিনলেন ঠিকই, কিন্তু সীমিত অর্থসম্বল থাকায় আরও পাঁচ ডলার খরচ ক'রে কোমরের বেল্ট কিনতে হবে ভাবতেই তাঁর অস্বস্তি হচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন ফুটপাতের ওপর একটি নাইলনের দড়ি পড়ে আছে। মুহূর্তমধ্যে সেটাকেই যখন বেল্টের বিকল্প ভেবে নিলেন আর দৌড়ে সেটা কুড়িয়ে আনতে গেলেন, তখন তাঁর উচ্ছ্বাস ওই আর্কিমিডিসের তুল্য। আবিষ্কারের আনন্দ উভয় ক্ষেত্রেই আছে সত্য, তবে আবিষ্কৃত উপাদানের যে ব্যাপক তারতম্য আছে, তা তো বলাই বাহুল্য। তাই স্বাভাবিকভাবেই কন্‌টেক্সট বা প্রসঙ্গের তারতম্যও অনেকখানি। কেবল উচ্ছ্বাসের মুহূর্তকে আরও স্পষ্টতা দিয়েছে এই আবেশ। তাই এটি দুর্বলভাবে ধনাত্মক আবেশ।

iii. **ঋণাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান →** ভার্জিনিয়ার ফরেস্ট রেঞ্জার রয় সলিভ্যান বাস্তবিকই সাতবার বজ্রাহত হয়ে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন। এই কারণে তিনি 'হিউম্যান লাইটনিং কন্‌ডাক্টর' এবং 'হিউম্যান লাইটনিং রড' নামে অভিহিত।[৫১] তাঁর বহুবার বজ্রাহত হয়েও

বেঁচে থাকার মতো আশ্চর্যজনক বিষয়টি গল্পের সংশ্লিষ্ট অংশে একধরনের আবেশ তৈরি করেছে। তবে বোঝাই যাচ্ছে যে এটি মোটেই সংশ্লিষ্ট অংশের অব্যবহিত প্রসঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়, বরং বৈসাদৃশ্যমূলক প্রাসঙ্গিক সম্পর্কে আবেশ ধরা দিয়েছে। Abrams কথিত 'to undercut it ironically'[১০]-র উদ্দেশ্যই এই আবেশ তৈরির মূলে ক্রিয়াশীল। এটি তাই ঋণাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান।

৩.৩.১.৪.২. 'ডক্টর দেবসেনের বিদেশযাত্রা' গল্পে উদ্ধৃতিমূলক (QUOTATION) অণু-আন্তর্বয়ন

ক্রমিক সংখ্যা	'ডক্টর দেবসেনের বিদেশযাত্রা' গল্পে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি	উদ্ধৃতির উৎসপাঠ
i.	এদিকে প্যারিসে পৌঁছে 'শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে' – সরকারের দেওয়া আট ডলার পথেই শেষ।[৫২]	'শূন্য হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে – ফিরি হে দ্বারে দ্বারে –'[৫৩]
ii.	ভাবখানা – 'অনেক সাধায়ে অনেক কাঁদায়ে দরশ মিলালি মোরে, বঁধু আর না ছাড়িব তোরে'।[৫৪]	'অনেক কাঁদায়ে অনেক সাধায়ে দরশ / মিললি মোরে / বঁধু আর না ছাড়িব তোরে'[৫৫]

সারণি ৬: "ডক্টর দেবসেনের বিদেশযাত্রা" গল্পে উদ্ধৃতি ও তার উৎস

এবার ওপরের ক্রমানুসারে উদ্ধৃতিগুলির অব্যবহিত প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক –

i. **ঋণাত্মক উদ্ধৃতি →** প্যারিসে পৌঁছে লেখিকা চেক ভাঙাতে পারছিলেন না। সরকারের দেওয়া আট ডলার পথেই শেষ হয়ে গেছে। বিদেশবিভুঁইয়ে এই অর্থশূন্যতার দরুণ যে মানসিক অস্থিরতা, সেটা বোঝাতেই রবীন্দ্রসঙ্গীতটির প্রথম পংক্তি তিনি আন্তর্বয়ান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বলাই বাহুল্য, পূজা পর্যায়ের এই গানটির সাথে গল্পের সংশ্লিষ্ট অংশের কোনও প্রাসঙ্গিক মিল নেই।

ii. **দুর্বলভাবে ঋণাত্মক উদ্ধৃতি →** উৎসপাঠ অর্থাৎ গানটিতে রয়েছে কৃষ্ণের প্রতি প্রেমিকা রাধার এই উক্তি। কিন্তু গল্পে কোনও প্রেমিক-প্রেমিকার উপস্থিতি নেই। একটি হারিয়ে

যাওয়া সুটকেস বহু চেষ্টার বিনিময়েও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর এয়ারপোর্টে এক অসম্ভাব্য স্থানে আকস্মিকভাবে সেটিকে দেখতে পেয়ে লেখিকার মনে যেরকম কষ্ট মিশ্রিত উৎফুল্লতা দেখা দিয়েছিল, তা স্পষ্ট করতেই পাঠকের পরিচিত ওই পংক্তিটি তিনি ব্যবহার করেছেন। তবে একথাও ঠিক, প্রিয় কোনও কিছু হারিয়ে অনেক কষ্ট সহ্যের পর তাকে পুনরায় অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে পেলে যে প্রকার আনন্দের অনুভূতি জাগে, তা হারানো মানুষ কিংবা হারানো জিনিস – উভয়ের জন্যই স্বীকার্য, যদিও দুই ক্ষেত্রে অনুভূতির মাত্রাভেদ অনেকখানি। তাই গল্পের এই উদ্ধৃতিকে আমরা বলব দুর্বলভাবে ঋণাত্মক।

৩.৩.১.৫. *ফিনিক্স* উপন্যাসের আন্তর্বয়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণ

ফিনিক্স উপন্যাস গড়ে উঠেছে দুই নারীর জীবনযাপনরীতিকে ঘিরে। সেই দুই নারী অর্থাৎ বিপাশা ও রোহিণী পরস্পর মা-মেয়ে হলেও বিপাশা প্রথাগত মাতৃত্বের কোনো টান অনুভব করে না। দেহে-মনে তারা উভয়ই আক্ষরিক অর্থে স্বাধীন জীবন যাপন করে, যা পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় সচরাচর দেখা যায় না।

প্রধানত যে ধরনের আন্তর্বয়ন নজরে পড়ে, তা সবই সার্ব-আন্তর্বয়ন। নিচে সেগুলির দুয়েকটি বিশ্লেষণ করা হল।

৩.৩.১.৫.১. ফিনিক্স উপন্যাসে *সার্ব-আন্তর্বয়ন*

উপন্যাসে ছ'টি পর্ব আছে। প্রতিটি পর্বের শিরোনাম আছে। এদের মধ্যে প্রথম ও শেষ পর্বের শিরোনাম যথাক্রমে 'বিপাশা' এবং 'রোহিণী'। এই দু'য়ের মাঝে যে চারটি পর্ব রয়েছে,

সেগুলির শিরোনামেই প্রযুক্ত হয়েছে উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ন। সেই চারটি আন্তর্বয়ান ক্রমান্বয়ে নিচে উল্লেখ করা হল –

i. জীবন গিয়েছে চলে কুড়ি কুড়ি বছরের পার[৫৬]
ii. সকাল নয় তবু আমার প্রথম দেখার ছটফটানি[৫৭]
iii. সেকি জানিত না, আমি তারে যত জানি –[৫৮]
iv. কার মিলন চাও বিরহী[৫৯]

এই একই ক্রমে আন্তর্বয়ানগুলি নিচে বিশ্লেষণ করে এগুলির প্রকৃতি নির্ণয় করা হল –

i. **ধনাত্মক উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান →** আন্তর্বয়ানটির উৎস হল কবি জীবনানন্দ দাশের "কুড়ি বছর পরে" কবিতা। কবিতায় সংশ্লিষ্ট অংশটি নিচে উদ্ধৃত করা হল,

> জীবন গিয়েছে চ'লে আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার –
> তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার !
> … … … …
> জীবন গিয়েছে চ'লে আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার –
> তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার ![৬০]

এই কবিতায় ধ্বনিত হয় অনেকগুলো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রেমাষ্পদের সাথে পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা। ধরা দেয় কাঙ্ক্ষিত পুনর্মিলনকালীন আবহ সম্পর্কিত বিবিধ কল্পনা, মিশে থাকে খানিক নস্টালজিয়া। আর সেই সঙ্গে মিশে থাকে কালস্রোতে চিরতরে কোনো কিছু হারিয়ে ফেলার দরুণ এক প্রকার চাপা কষ্টের অনুভূতি। আমাদের মনে পড়বে, কবিতার শেষ দুই পংক্তি,

> সোনালি-সোনালি চিল – শিশির শিকার ক'রে নিয়ে গেছে তারে –
> কুড়ি বছরের পরে সেই কুয়াশায় পাই যদি হঠাৎ তোমারে ![৬১]

কবিতার প্রসঙ্গের মতোই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের প্রসঙ্গেও আমরা দেখি, বিপাশা তার প্রথম প্রেমিক সমীরের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হতে চেয়েছে। মাঝখানে কেটে গেছে অনেকগুলো বছর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিতান্ত নিরুপায় হয়ে সমীরকে বিপদের মুখে ফেলে রেখে বিপাশাকে

চলে যেতে হয়েছিল বিদেশে। মাঝের এতগুলো বছরে সে কত-না কল্পনা করেছে সমীরের সাথে পুনর্মিলন ও সেই পুনর্মিলনকালীন আবেগের। তবে এত বছর পর আবার যখন সে দেশে ফিরেছে, তখন সমীরকে ফিরে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও মিশে গেছে ভালোবাসার পুরনো বন্ধনের তার ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাজনিত একটা চাপা কষ্ট। কলকাতায় পা রেখে বিপাশা বুঝেছে শুধু জেলফেরত সমীর নয়, চারপাশের চেনা মানুষজন এমনকি কলকাতা শহরটাই বদলে গেছে অনেকখানি। প্রত্যেকেই নিষ্ঠুর সময়ের শিকারে পরিণত হয়েছে।

জীবনানন্দের কবিতাটি আমাদের মনে যে অনুভূতির অভিজ্ঞতা দিয়ে গেছে, সেই অনুভূতির অভিজ্ঞতা *ফিনিক্স* উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বের আবেদনের গভীরতা বুঝতে সাহায্য করেছে। আর এখানেই পর্বটির শিরোনামে “কুড়ি বছর পরে” কবিতা থেকে নেওয়া আন্তর্বয়ানের প্রয়োগসার্থকতা।

ii. **ধনাত্মক উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান →** আন্তর্বয়ানটির উৎস সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা ‘তোমার কাছেই’। উপশিরোনামে এই কবিতার প্রথম পংক্তি ব্যবহারের ফলে দেখা যায় যে সমগ্র কবিতায় যে আবেগ মিশে আছে, তা *ফিনিক্স* উপন্যাসের তৃতীয় পর্বে নিহিত আবেগকে পাঠকের কাছে আরও বেশি ঘনীভূত করেছে। কবিতায় আমরা লক্ষ করি, ‘সকাল’, ‘দুপুর’, ‘নদী’, ‘শিরীষ’, ‘বিকেল’ এবং ‘তুমি’ – এরা কেউই বাস্তবে ছিল না। মিলনের পাত্র এবং মিলনের সহায়ক পরিবেশ দু’য়ের কোনোটাই আশানুরূপ নয়। তবু মিলনাকাঙ্ক্ষী মন ভ্রমবশে এদের অস্তিত্ব কল্পনা করে এবং প্রিয়ের সাথে মিলিত হতে চায়। *ফিনিক্স* উপন্যাসের তৃতীয় পর্বেও দেখা যায়, বিপাশা চিরদিন সমীরকেই পেতে চেয়েছে। বিদেশে থাকতে থাকতেও বুকের ভিতরে সে লালন করেছে তার ভালোবাসাকে, যদিও সমীর সেখানে ছিল না, ছিল না স্বদেশের চেনা প্রিয় পরিবেশ। বিদেশ থেকে সে ছুটে

এসেছে কেবল সমীরের টানে। কিন্তু সমীর আর সেই আগের চেনা সমীর নেই। আমরা খেয়াল করব সুনীলের কবিতাটির শেষ কয়েকটি পংক্তি –

তৃষ্ণা ছোটে বিদেশ পানে
তুমি ছিলে না তবুও যেন
তোমার কাছেই বেড়াতে আসা![৬২]

সেই সঙ্গে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। 'তোমার কাছেই' কবিতা কিংবা *ফিনিক্স* উপন্যাস উভয় ক্ষেত্রেই যখনই বলা হল, "সকাল নয়, তবু আমার/প্রথম দেখার ছটফটানি", তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই 'সকাল' আসলে প্রেমের প্রথম পর্যায়কে ইঙ্গিত করছে। উপন্যাসে বিদেশ থেকে আগত বিপাশার জীবনে সমীরের সাক্ষাত প্রথম নয়। তবু দীর্ঘ বিচ্ছেদের কাল পেরিয়ে যখন প্রত্যাশিত মিলন আসন্ন, বিপাশার তখনকার আকুলতা যেন সমীরকে প্রথম দেখার উত্তেজনার সমতুল।

সমীরের উপস্থিতি ছাড়াই বিপাশার দীর্ঘকালব্যাপী অন্তরে অন্তরে প্রেমযাপন এবং তার ফলে পরবর্তীতে সমীরের থেকে পাওয়া অপ্রত্যাশিত আঘাত যে বিপাশার কাছে কতখানি তীব্র হতে পারে, তা অনুভব করতে সাহায্য করে এই আন্তর্বয়ান।

iii. **ধনাত্মক উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান →** উপন্যাসের চতুর্থ পর্বের শিরোনামে প্রযুক্ত আন্তর্বয়ানটির উৎস শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম খ্যাতনামা কবিতা 'আনন্দ ভৈরবী'। উপন্যাসের এই পর্বে আসে আগের পর্বের ঠিক পরবর্তী ঘটনাক্রম। বহুদিন পর প্রথম প্রিয় সান্নিধ্যে আসার ভরপুর উত্তেজনা নিয়ে বিপাশা সমীরের সামনে এসে যে-সমীরকে দেখল, সে আর আগের মতো নেই। তাকে বিপাশার ভারি অচেনা লাগে, আপন মনে হয় না। এই অপ্রত্যাশিত আঘাত যে বিপাশার পক্ষে কতখানি মর্মবিদারক, তা ব্যক্ত হয়েছে এই পর্বের শুরুতেই –

সমীর যে বিপাশার কাছে কী, সমীর তার কে, তা কি সমীর কিছুই বুঝতে পারেনি? কোনওদিনই না?[৬৩]

দীর্ঘ ব্যবধানে সম্পর্কের ছন্দপতন হয়ে গেছে, সম্পর্কের খাঁজে খাঁজে এখন বাসা বেঁধেছে অভিযোগ, অনুযোগ, ক্রোধ। প্রেমের তার বিপাশার সেই পুরনো চেনা সুরে বাজে না আর। ‘আনন্দ ভৈরবী’ কবিতা যাঁরা পড়েছেন, তাঁদের স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে নিচের পংক্তিগুলি –

আজ সেই গোঠে আসে না রাখাল ছেলে
কাঁদে না মোহনবাঁশিতে বটের মূল
এখনো বরষা কোদালে মেঘের ফাঁকে
বিদ্যুৎ-রেখা মেলে
… … … … …
সে কি জানিত না আমি তারে যত জানি
আনখ সমুদ্দুর।
আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি
অমন ছিল না আষাঢ়-শেষের বেলা
উদ্যানে ছিল বরষা-পীড়িত ফুল
আনন্দ-ভৈরবী।[৬৪]

বিপাশার অব্যক্ত ব্যথার গভীরতাকে অনুভব করতে পাঠককে আরও বিশেষভাবে সাহায্য করেছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ‘আনন্দ-ভৈরবী’ কবিতা।

iv. **ধনাত্মক উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান →** রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের ৪২৮ সংখ্যক গান[৬৫] থেকে নেওয়া হয়েছে উপন্যাসের পঞ্চম পর্বের শিরোনামে প্রযুক্ত আন্তর্বয়ান। বিপাশা এত বছর ধরে অন্তরে বাইরে যে প্রিয় মানুষটির সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছিল, তাকে যখন সে পেল না এবং যে বদলে যাওয়া সমীরকে সে মুহূর্তের জন্য পেল, তাকে সে কখনো কল্পনাও করেনি, তখন উপন্যাসের পঞ্চম পর্বে আমরা দেখি –

সেইমুহূর্তে তার মনে হয় আর নিজের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির খেলা নয় – সে ফিরে যাবে।[৬৬]

এবার ফিরে যাওয়ার সময় এসেছে। এমন ঘন বর্ষার মধ্যে বিপাশার হঠাৎ নিজেকে ভারহীন, গ্লানিহীন, মুক্ত, এবং পূর্ণ মনে হতে লাগল![৬৭]

বিপাশা এবার অন্যের মধ্যে ভালোবাসা খুঁজে পাওয়ার অপেক্ষা না-করে আত্মমগ্ন হতে চায়। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের ৪২৮ সংখ্যক গানটিতেও আমরা কার্যত আপনাতে আপনি মগ্ন হওয়ার বার্তা পাই।

৩.৩.১.৬. 'জরা হট্‌কে জরা বঁচ্‌কে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান্ !' গল্পের আন্তর্বয়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণ

অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী নবনীতা দেবসেনকে কলকাতায় ব'সে কতরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সেইসব বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমাহার 'জরা হট্‌কে জরা বঁচ্‌কে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান্ !' শীর্ষক গল্পটি। গল্পের ছত্রে ছত্রে ধরা দেয় একজন নোবেলজয়ীর প্রাক্তন স্ত্রীর পক্ষে একের পর এক অস্বস্তিকর মুহূর্ত। আর এই সবই তিনি পাঠককে পরিবেশন করেছেন হাস্যরসে মুড়ে, যা নবনীতার লেখনীর একেবারে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি।

৩.৩.১.৬.১. 'জরা হট্‌কে জরা বঁচ্‌কে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান্ !' গল্পে সার্ব-আন্তর্বয়ন

প্রথমেই গল্পের শিরোনামে[৬৮] দেখা যাচ্ছে আন্তর্বয়ান। শিরোনাম যেহেতু গল্পের সামগ্রিক মেজাজকে ধারণ করে, তাই এটি সার্ব-আন্তর্বয়ান। উৎসপাঠের সাপেক্ষে এই সার্ব-আন্তর্বয়ানের প্রকৃতি বিচার করব এবং দেখব এটি বর্তমান পাঠের নিরিখে কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত 'সি.আই.ডি.' শীর্ষক হিন্দি ছায়াছবিতে সঙ্গীতশিল্পী মহম্মদ রফি ও গীতা দত্তের গাওয়া যে বিখ্যাত গানের পংক্তি গল্পের শিরোনামে ব্যবহার করা হয়েছে, সেটি নিম্নরূপ,

অ্যায় দিল হ্যায় মুশকিল জীনা য়হাঁ
জরা হট্‌কে, জরা বঁচ্‌কে

ইয়ে হ্যায় বম্বে মেরি জান

… … … … … …

মিলাতা হ্যায় য়হাঁ সব কুছ ইক মিলতা নহীঁ দিল

… … … … … …[৬৯]

যান্ত্রিক সভ্যতায় মোড়া বম্বে মহানগরে সবকিছু মিললেও সেখানে কেবল যে-জিনিসটির অভাব, তা হল মানুষের মন। এখানে তাই জীবন যাপন করা সহজ কথা নয়। অনেকরকম ঝামেলা উপদ্রব প্রলোভনের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রে টিঁকে থাকতে হবে।

এই গানের মতোই নবনীতা দেবসেনের গল্পটিতেও মানুষের মনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। নোবেল পেলেন যিনি, তাঁর নাগাল না পেয়ে কলকাতা শহরের সাধারণ মানুষ তাঁর প্রাক্তন স্ত্রীকেই যত্রতত্র নানা অবান্তর প্রশ্নে, কটাক্ষে, প্রশস্তিতে, সমবেদনায়, তির্যক হাসিতে মুহুর্মুহু বিদ্ধ করতে থাকে। এসবের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে নিজেকে সুস্থির রাখাই দায়। সমগ্র পরিস্থিতির উত্তাপকে পাঠকের কাছে আরও অনুভববেদ্য ক'রে তুলতে লেখিকা সমজাতীয় প্রসঙ্গের উক্ত গানের পংক্তিকে গল্পের শিরোনাম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এটি সার্বিক স্তরের ধনাত্মক আন্তর্বয়ান।

গল্পটি বেশ কিছু পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং প্রতিটি পরিচ্ছেদ শিরোনামযুক্ত। এইসব উপশিরোনামেও আমরা কখনো কখনো আন্তর্বয়ান দেখেছি। যেহেতু উপশিরোনামগুলি পৃথকভাবে বিভিন্ন পরিচ্ছেদের সার্বিক মেজাজের ধারক, তাই এইসব স্থানে প্রযুক্ত আন্তর্বয়ানকেও আমরা সার্বিক স্তরের ব'লেই চিহ্নিত করব। নিচে সেরকমই দুয়েকটি দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো হল।

(ক) 'জবাব চাই। জবাব দাও'[৭০]

(খ) 'কী ভাল আমার লাগল আজ এই সকালবেলায়'[৭১]

প্রথমটি একটি বহু পরিচিত রাজনৈতিক স্লোগান এবং দ্বিতীয়টি বুদ্ধদেব বসুর ‘চিল্কায় সকাল’[৭২] কবিতার প্রথম পংক্তি। প্রথমটি ঋণাত্মক ও দ্বিতীয়টি দুর্বলভাবে ধনাত্মক উদ্ধৃতিমূলক সার্ব-আন্তর্বয়ান। কারণ –

প্রথমটির পরিচিত প্রসঙ্গ হল প্রশাসকের কোনও অনৈতিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জনতা অথবা প্রতিবাদী রাজনৈতিক দলের কর্মীবৃন্দের প্রতিবাদ। তবে গল্পে কিন্তু কোনোরকম অনৈতিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায়নি। সেখানে দেখা যায়, অমর্ত্য সেন নোবেল পেয়েছেন জেনে একজন পথচারী নবনীতাকে জানান যে তিনি অমর্ত্য অথবা তাঁর বৃদ্ধা মা অথবা নবনীতা অথবা নবনীতা-অমর্ত্যর দুই মেয়ে - এঁদের মধ্যে যেকোনো একজনকে চিঠি লিখতে চান। এঁদের মধ্যে যিনি চিঠির জবাব দিতে পারবেন, তাঁকেই তিনি চিঠি লিখবেন এবং প্রাপ্ত উত্তর তিনি ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখে দেবেন অমর্ত্য সেনের নোবেল জয়ের স্মৃতিতে। পথচারী ভদ্রলোক নোবেল জয়ী অথবা তাঁর পরিবারের যে-কারোর চিঠির জবাব পেতে এতটাই মরিয়া যে লেখিকা তাঁর সেই মরিয়াভাবের স্বরূপ প্রকাশ করেছেন প্রতিবাদী স্লোগানটি উদ্ধৃত ক’রে, যদিও এখানে প্রতিবাদের লেশমাত্রও নেই। ফলে প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক ঋণাত্মক। তাই উদ্ধৃতিমূলক এই সার্ব-আন্তর্বয়নও ঋণাত্মকধর্মী।

দ্বিতীয়টির উৎসপাঠের প্রসঙ্গ আমরা জানি। সকালবেলায় চিল্কা হ্রদের প্রাকৃতিক শোভা আর প্রেমিকার সান্নিধ্যে মুগ্ধ হয়েছেন কবি। পংক্তিটি কবির সেই মুগ্ধতার প্রকাশ। অথচ আলোচ্য গল্পে তেমন কোনও প্রসঙ্গ নেই। যদিও সেখানে আমরা পেয়েছি একটি সকালবেলা আর পেয়েছি লেখিকার বিস্ময় মাখানো মুগ্ধতা। গল্পে দেখা গেছে, অমর্ত্য সেন নোবেল পাওয়ার পর একদিন সকালবেলায় নবনীতা যখন কলকাতার রাস্তায় প্রতিদিনের মতো মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন, তখন বিভিন্ন অপরিচিত মানুষের সাথে সাক্ষাত হয়েছে, যাঁরা তাঁকে নবনীতার

নিজের কাজের পরিচয়ে চেনেননি, বরং টিভির পর্দায় চিনেছন কেবলমাত্র অমর্ত্য সেনের প্রাক্তন স্ত্রী হিসেবে এবং নবনীতার সাথে তাঁরা সেইমতো কথা বলেছেন। ফলে নবনীতার কাছে এ ছিল এক অভিনব সকাল। সুতরাং, একটি সকালবেলা এবং বিস্ময় – এই দু'য়ের অস্তিত্ব যদি উক্ত কবিতা ও গল্পের সংশ্লিষ্ট অংশের প্রাসঙ্গিক সম্পর্ককে কিছুমাত্র ধনাত্মক করে, তবে তা নিতান্তই দুর্বলভাবে ধনাত্মক। আন্তর্বয়ানের প্রকৃতিও সেইরূপ।

৩.৩.১.৬.২. 'জরা হট্‌কে জরা বঁচ্‌কে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান্ !' গল্পে উদ্ধৃতিমূলক (QUOTATION) অণু-আন্তর্বয়ন

'জরা হট্‌কে জরা বঁচ্‌কে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান্ !' গল্পে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি	**উদ্ধৃতির উৎসপাঠ**
'পলকহারা আলোকদিঠি মরমপরে' – লেজার বিমের মতো বিদ্ধ হচ্ছে। চারিদিকে এত চোখ, কোনও পর্দা নেই। আব্রু নেই।[৭৩]	তব গানের সুরে হৃদয় মম রাখো হে রাখো ধরে,/... .../তব পলকহারা আলোক-দিঠি মরম-'পরে রাখো[৭৪]

সারণি ৭: "জরা হট্‌কে জরা বঁচ্‌কে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান্ !" গল্পে উদ্ধৃতি ও তার উৎস

ঋণাত্মক উদ্ধৃতি → ওপরের উদ্ধৃতির উৎস-পাঠের সঙ্গে গল্পের প্রাসঙ্গিক সাদৃশ্য একেবারেই নেই। গল্পে আমরা দেখি, নবনীতা এক বিয়েবাড়িতে গেলে বিয়েবাড়িতে উপস্থিত সবাই তাঁকে নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের প্রাক্তন স্ত্রী হিসাবে চারদিক থেকে নিরীক্ষণ করতে থাকে, যা নবনীতার কাছে মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। তারা যে তাদের বিরামহীন নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে নোবেলজয়ীর প্রাক্তন স্ত্রী'র অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত প'ড়ে ফেলতে চায়, তা উদ্ধৃতির অন্তর্গত 'মরমপরে' শব্দের দ্যোতনা এবং তারপরেই লেজার বিমের তুলনা থেকে স্পষ্ট। অথচ এর বিপরীতে উৎসপাঠে দেখেছিলাম, উদ্ধৃতিটি রবীন্দ্রনাথের একটি প্রার্থনামূলক সঙ্গীতের অন্তর্গত অন্যতম প্রার্থনাবাক্যের objective complement, প্রার্থিত বিষয়। কিন্তু গল্পে 'পলকহারা

আলোকদিঠি মরমপরে' একেবারেই প্রার্থিত নয়। যাই হোক, আমাদের বুঝতে অসুবিধা নেই যে প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক এখানে ঋণাত্মক। ফলে আন্তর্বয়নও হয়েছে ঋণাত্মক প্রকৃতির।

৩.৩.১.৭. 'বামুন-মুচি-রাজা' গল্পের আন্তর্বয়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণ

এই গল্প থেকে আমরা কয়েকটি আবেশধর্মী আর উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ানের ব্যবহার বৈশিষ্ট্য দেখব।

৩.৩.১.৭.১. 'বামুন-মুচি-রাজা' গল্পে আবেশধর্মী (ALLUSION) অণু-আন্তর্বয়ন

ক্রমিক সংখ্যা	**'বামুন-মুচি-রাজা' গল্পে ব্যবহৃত আবেশ**	**আবেশের উৎসপাঠ**
i.	এই প্রেম রাহুর প্রেম, এ থেকে অভিষেকের মুক্তি না পেলে চলবে না।[৭৫]	রবীন্দ্রনাথের *ছবি ও গান* কাব্যের 'রাহুর প্রেম' কবিতা[৭৬]
ii.	তুমি 'গ্রাজুয়েট' সিনেমাটা দেখেছিলে? ... আন্টির শুষ্ক, একাকী নারীজীবনেও আমি হঠাৎ কেমনভাবে যেন জড়িয়ে গেলুম ...[৭৭]	১৯৬৭ সালে মুক্তি পাওয়া আমেরিকান সিনেমা 'গ্রাজুয়েট'।[৭৮]
iii.	সেই 'পরমা' সিনেমার মতনই অবস্থা। ... আন্টির সঙ্গে আমার অত্যাশ্চর্য এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, একেবারেই অতর্কিতে।[৭৯]	১৯৮৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অপর্ণা সেন পরিচালিত বাংলা সিনেমা 'পরমা'।[৮০]

সারণি ৮: "বামুন-মুচি-রাজা" গল্পে আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান ও তার উৎস

এবার উপরোক্ত আবেশধর্মী আন্তর্বয়ানগুলির প্রকৃতি নির্ধারণ করা যাক –

i. **ধনাত্মক আবেশ →** 'রাহুর প্রেম' কবিতায় আমরা দেখেছিলাম, এই প্রেম কারোর জীবনে সুখ-শান্তি আনে না। গল্পেও অভিষেকের কথায় আমরা জানতে পারি, জীবনে বারবার প্রেম এলেও প্রেমে সে কখনোই সত্যিকারের সুখী হতে পারেনি। তার জীবনের

অসুখী ভাবকে স্পষ্টতর করেছে এই রাহুর প্রেমের আবেশ সৃষ্টিকারী আন্তর্বয়ান। এটি ধনাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান।

ii. **ধনাত্মক আবেশ →** 'গ্রাজুয়েট' সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্র বেন্‌জামিন তার বাবার বন্ধুপত্নীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল এবং একইসঙ্গে তার মেয়েকেও ভালোবেসেছিল। আলোচ্য গল্পটিতেও দেখা যায়, অভিষেক একইসঙ্গে জয়া ও জয়ার মাসির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল।

iii. **ধনাত্মক আবেশ →** 'পরমা' সিনেমায় চল্লিশ বছর বয়সী বিবাহিতা পরমা তাঁর থেকে বয়সে অনেক ছোট যুবক রাহুলের প্রেমে পড়া থেকে নিজেকে প্রতিহত করতে পারেননি। গল্পে জয়ার মাসি আর অভিষেকের সম্পর্কের চেহারাকে আরও স্পষ্ট রূপ দিতেই 'পরমা' সিনেমার খানিক আবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩.৩.১.৭.২. *'বামুন-মুচি-রাজা' গল্পে উদ্ধৃতিমূলক (QUOTATION) অণু-আন্তর্বয়ন*

ক্রমিক সংখ্যা	'বামুন-মুচি-রাজা' গল্পে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি	উদ্ধৃতির উৎসপাঠ
i.	সেই যে সুনীল গাঙ্গুলির লাইন – "আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে" – সে শক্তি ছিল না জয়ার।[৮১]	"আমার যৌবনে তুমি স্পর্ধা এনে দিলে / তোমার দু'চখে তবু ভীরুতার হিম।"[৮২]
ii.	"শরীর, শরীর, তোমার মন নাই, অভিষেক?" আছে! আর সেইটেই তো মুশকিল, তমসা।[৮৩]	"শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?"[৮৪]

সারণি ৯: "বামুন-মুচি-রাজা" গল্পে উদ্ধৃতি ও তার উৎস

i. **ধনাত্মক উদ্ধৃতি →** গল্পের সংশ্লিষ্ট অংশের সঙ্গে উৎস-পাঠের প্রাসঙ্গিক সাদৃশ্য রয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'তুমি' কবিতায় যে কামনাপূর্ণ প্রেমের প্রকাশ লক্ষিত হয়, আলোচ্য গল্পে জয়ার মাসি তেমনই কামনাদগ্ধ প্রেম এনে দেয় অভিষেকের সদ্যলব্ধ যৌবনে।

ii. **ধনাত্মক উদ্ধৃতি →** 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় কুসুম নিজেকে অকপটে প্রকাশ করেছিল শশীর কাছে। নিজের শরীরী কামনা সে অব্যক্ত রাখেনি। নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত পরিশীলিত শশী তাকে বাহ্যত আমল দিতে চায়নি ব'লেই উদ্ধৃত উক্তিটি করেছিল। কিন্তু কুসুমের মন ছিল। মন ছিল ব'লেই অভিমান ছিল, আত্মসম্মানবোধ ছিল। তাই পরবর্তীকালে সে নিজেই শশীকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, "আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না"[৮৫]। নবনীতা দেবসেন তাঁর গল্পে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের প্রবাদপ্রতিম বাক্যটিই আরোপ করেছেন অভিষেক চরিত্রে। কুসুমের মতোই অভিষেককে আপাতভাবে শরীর সর্বস্ব ব'লে মনে হয়। কিন্তু কুসুমের মতোই তারও নিশ্চয় একটি মন আছে। তাই সে আর একের পর এক শরীরী খেলায় মেতে থাকতে চায় না। এতদিন যে স্ত্রী-পুত্রকে সে অবহেলা করেছে, তাদেরকে নিয়েই অভিষেক প্রকৃত দায়িত্ববান পুরুষের মতো বাকি জীবনটা বাঁচতে চায়।

৩.৩.১.৮. 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের 'পৌরাণিকী' পর্বের আন্তর্বয়নের প্রকৃতি বিশ্লেষণ

'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের 'পৌরাণিকী' পর্বে আমরা যে জাতীয় আন্তর্বয়নের সন্ধান পেয়েছি, তা স্বাঙ্গীকরণমূলক আন্তর্বয়ন (adaptation)। এই পর্বে আছে মোট ছ'টি গল্প – 'মূল-রামায়ণ', 'রাজকুমারী কামবল্লী', 'অমরত্বের ফাঁদে', 'সীতার পাতাল প্রবেশ', 'অশ্বোপাখ্যান' এবং 'অভিজ্ঞানদুষ্মন্তম্'।

'মূল-রামায়ণ' গল্পে আছে হনুমানের লঙ্কায় যাওয়া ও সীতা উদ্ধারের কাহিনি। 'রাজকুমারী কামবল্লী'-তে আছে শূর্পণখাকে কেন্দ্র করে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার কাহিনি। 'অমরত্বের ফাঁদে' গল্পে পাওয়া যায় নাগপাশে বদ্ধ রাম-লক্ষ্মণের কথা এবং অশোককাননে বন্দি সীতার দুঃখের কাহিনি। 'সীতার পাতাল প্রবেশ' গল্পে পাওয়া গেছে বাল্মীকির আশ্রমবাসিনী সীতাকে। সঙ্গে আছে তার দুই পুত্র লব-কুশ। তারপর এসেছে সীতার অযোধ্যায় পুনরাগমন, অগ্নিপরীক্ষা এবং পাতাল প্রবেশের কাহিনি। 'অম্বোপাখ্যান'-এ আছে অম্বা ও ভীষ্মের কাহিনি এবং 'অভিজ্ঞানদুষ্মন্তম্'-এ রয়েছে শকুন্তলা ও রাজা দুষ্মন্তের কাহিনি।

প্রতিটি গল্পের কাহিনিই উৎস-পাঠের কাহিনি অর্থাৎ মহাকাব্যের কাহিনিকে স্বাঙ্গীকরণ ক'রে এগিয়েছে। নবনীতার নিজের কথায় –

> ধ্রুপদী কাহিনীর অন্তর্গত কোন রদবদল হয়নি, কেবল কিছু কল্পিত ঘটনা যুক্ত হয়েছে। আবার কাহিনীর নিজগুণেই তা বিযুক্ত হয়ে গেছে।[৮৬]

'পৌরাণিকী' পর্বে অন্য ধরনের আন্তর্বয়ান থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু এই পর্বের একেকটি গল্পের আগাগোড়া যে জাতীয় আন্তর্বয়ানের উপস্থিতি সর্বদাই পাঠককে মাতিয়ে রাখে, সেটিই নিশ্চিতরূপে প্রকট। এটি সার্ব-আন্তর্বয়ান এবং তা স্বাঙ্গীকরণমূলক।

৩.৩.২. চিত্রকল্প নির্মাণে আন্তর্বয়ানের ভূমিকা

সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে চিত্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ের এতক্ষণের আন্তর্বয়ান সংক্রান্ত আলোচনার নিরিখে একথা বুঝতে নিশ্চয়ই অসুবিধা হয় না যে আন্তর্বয়ান ব্যবহারের মাধ্যমেও চিত্রকল্প গড়ে তোলা সম্ভব। এবার আমরা তিনটি দৃষ্টান্ত

সহযোগে বিশেষভাবে খেয়াল করব যে আন্তর্বয়ান ঠিক কীভাবে সরাসরি চিত্রকল্পের অংশ হয়ে উঠতে পারে।

৩.৩.২.১. *ফিনিক্স উপন্যাসে চিত্রকল্প নির্মিতির সহায়ক আন্তর্বয়ান*

সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে আমরা *ফিনিক্স* উপন্যাস থেকে চিত্রকল্পের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলাম [দ্র. ১.৩.২.৪.-এর (ক)]। সেই চিত্রকল্পের নির্মিতিতে ব্যবহার করা হয়েছিল একটি আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান, যেটি গীতার শ্লোক থেকে গৃহীত। যুগে যুগে ধর্মসংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণের আবেশ সৃষ্টিকারী আন্তর্বয়ানের কৌশলী ব্যবহার চিত্রকল্পে লক্ষ করা যায় –

> মাও-সে-তুং -এর জয়ধ্বনি দিয়ে, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য দুষ্কৃতের বিনাশ করে সমাজে ধর্মসংস্থাপনের ভার নিজেরাই নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল তারা।[৮৭]

আন্তর্বয়ানের দ্বারা সৃষ্ট এই চিত্রকল্প সত্তরের দশকের আন্দোলকারীদের চরিত্র বুঝতে পাঠককে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

৩.৩.২.২. *'অলৌকিক রত্নভস্ম এবং নন্দকাকু' গল্পে চিত্রকল্প নির্মিতির সহায়ক আন্তর্বয়ান*

নবনীতার প্রায় সমস্ত গল্প-উপন্যাসের মতোই 'অলৌকিক রত্নভস্ম এবং নন্দকাকু' গল্পেও বেশ কিছু আন্তর্বয়ান ধরা দিয়েছে। আমরা তার মধ্যে থেকে বিশেষ এক প্রকার আন্তর্বয়ান নিয়ে আলোচনা করব। এসব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, আন্তর্বয়ান চিত্রকল্প তৈরিতে সাহায্য করেছে। যেমন –

> ফর্সা, ঢ্যাঙা, রোগা টিংটিঙ (বহুরূপীর 'রক্তকরবী'র সর্দারের মতো চেহারার), একমাথা উষ্কখুষ্ক রুক্ষ পাকা চুল ...[৮৮]

শম্ভু মিত্রের নাট্যদল 'বহুরূপী' অভিনীত 'রক্তকরবী' নাটকের সর্দারের চেহারার স্মৃতি জাগে পাঠকের মনে। লক্ষণীয়, সর্দার চরিত্রের আবেশ শুধুমাত্র চেহারাতেই থেমে থাকে না। তা চেহারার সাথে সাথে গল্পের এস.কে. নামের ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকেও ছায়া ফেলে।

চেহারা এবং গতিবিধিতেও সে প্রায় 'রক্তকরবী'র সর্দারের তুল্য। সর্দাররাই যেমন 'রক্তকরবী'র রাজাকে টপকে একটা গোটা সমাজের ওপর ছড়ি ঘোরাত, গল্পের এস.কে. নামক এই ব্যক্তিটিও তেমন ধাঁচের। নকুড়েশ্বরের উচ্ছন্নে যাওয়ার মূলে সে-ই দায়ী ব'লে জানা যায়। সুতরাং, 'রক্তকরবী' থেকে সর্দারের আন্তর্বয়ান গৃহীত হয়েছে ব'লেই এখানে খুব স্বল্প কথায় এস.কে. চরিত্রের একটি ইমেজ তৈরি করা গেছে।

এই গল্পেই অনুরূপ আরেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল –

> ইতিমধ্যে কাকা-কাকিমা মুখোমুখি। "সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি" নন্দকাকু যেন সন্ত্রস্ত হরিণী। আর কাকিমা? খাস রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।[৮৯]

'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ কবি মধুসূদন তাঁর প্রতিভাশালী কলমের দুয়েকটি আঁচড়ে রাবণপুত্র বীরবাহুর বীরত্ব ও সেই বীরত্বের আকস্মিক করুণ পরাভবের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন[৯০]। পাঠকের স্মৃতিতে চিরসমুজ্জ্বল হয়ে আছে সেই চিত্র। এখন নবনীতা পাঠকের স্মৃতিতে সঞ্চিত সেই চিত্রকে ফিরিয়ে এনেছেন উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ানের মাধ্যমে। এভাবে তিনি নতুন একটি চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন, যা গল্পের নন্দকাকুর সদামেজাজী চেহারা (বীরবাহুর তুল্য)-র আকস্মিক পরিবর্তিত মূর্তিকে বুঝতে সাহায্য করে।

৩.৩.৩. আন্তর্চারিত্রিকতা ও তার প্রকৃতি অন্বেষণ

জার্মান ভাষাবিদ থিওডোর জ়িওকোস্কি (Theodore Ziolkowski) ১৯৮৩ সালে তাঁর 'Varieties of Literary Thematics' প্রবন্ধে বিশেষ এক প্রকার আন্তর্চারিত্রিকতা (interfigurality)-র কথা বলেন। একটি সাহিত্যিক পাঠের কোনও একটি চরিত্র যদি অন্য একটি পাঠে ব্যবহৃত হয়, তখন এই ধরনের চরিত্রকে তিনি বলেছেন, 'figuren auf pump', যার ইংরেজি অর্থ "Figures on Loan"[৯১]। এই যে পাঠ থেকে পাঠে চরিত্রের সরণের কথা

তিনি বললেন, সেটি হতে পারে একই লেখকের অন্য কোনও গল্প বা উপন্যাসে। কিংবা অন্য লেখকের রচনায়। একই লেখকের নতুন ধরনের সৃষ্টির প্রণোদনা পুরনো কোনও চরিত্রের সরণ ঘটাতে পারে। অথবা ভিন্ন লেখকের নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিগত তফাতের কারণে ওই চরিত্রের সরণ হতে পারে। বিষয়টি একটি চিত্রের মাধ্যমে বোঝানো হল (দ্র. চিত্র ৮)।

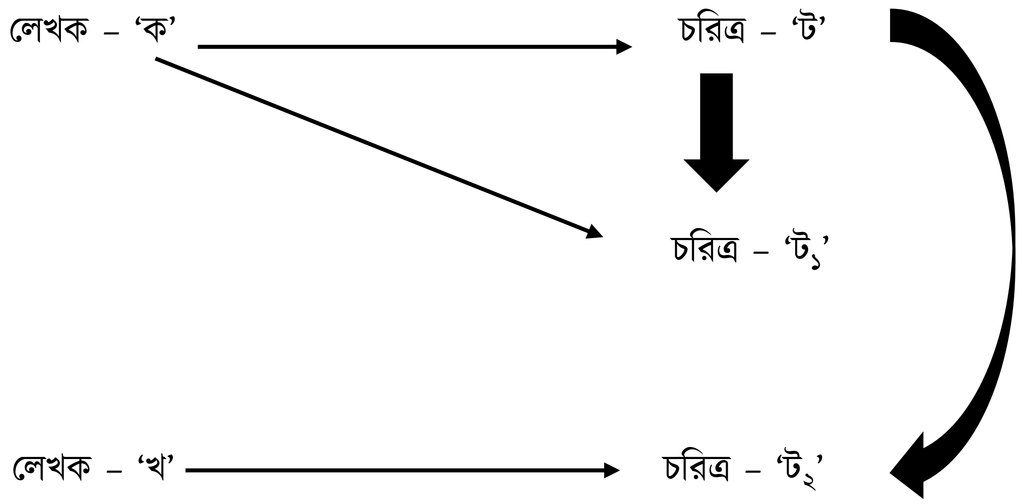

চিত্র ৮: "ফিগারস্ অন্ লোন্"

ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যিক পাঠের চরিত্রের মধ্যকার এই আন্তঃসম্পর্ককে জার্মান পণ্ডিত উলফগ্যাং মুলার (Wolfgang G. Muller) প্রথম 'interfigurality' নামে চিহ্নিত করেছেন[৯২]।

আন্তর্চারিত্রিকতার যেসব নিদর্শন নবনীতা দেবসেনের লেখায় ধরা দিয়েছে, প্রতিটির একটি ক'রে উদাহরণ বিশ্লেষণ করা হল –

৩.৩.২.১. চরিত্রনাম দ্বারা সৃষ্ট আন্তর্চারিত্রিকতা

এক্ষেত্রে চরিত্রের নাম দেওয়া হয় কোনও বিখ্যাত চরিত্রের নামানুসারে। এই নামকরণের মধ্য দিয়ে লেখক প্রকারান্তরে পাঠককে ভাবাতে চান যে চরিত্রটি আসলে ওই বিখ্যাত চরিত্রটির শ্রেণিতেই পড়ে, যদিও দুটি চরিত্র এক নয়।

নবনীতা দেবসেনের 'ভরতকথা' গল্পে এইরকম আন্তর্চারিত্রিকতার সন্ধান মেলে। এই গল্পে আগন্তুক ব্যক্তিটির প্রকৃত নাম জানা যায় না। তবে লেখিকা পাঠকের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়েছেন ভরত নামে। কেবল নামেই নয়, তার কার্যকলাপও রামায়ণের ভরতের অনুরূপ। গল্পের দুয়েকটি জায়গা খেয়াল করলেই এর প্রমাণ পাওয়া যায় –

> আমি ভরত। আপনি রামচন্দ্র। আমি আপনার অনুগত ছোটোভাই। এই চটি আমি মাথায় করে রেখে দেব। ...
>
> আজ সন্ধ্যায় সে ভরত। হাওড়া আজ অযোধ্যাপুরী।[৯৩]

৩.৩.২.২. পুনরায় ব্যবহৃত চরিত্র দ্বারা সৃষ্ট আন্তর্চারিত্রিকতা

আগেরটির মতো এখানে চরিত্রনাম ও সেই নামের মাধ্যমে চরিত্রের ছায়াই কেবল দেখা যায় না, এখানে গোটা চরিত্রটাকেই নিয়ে আসা হয় অন্য কোনও পূর্বসৃষ্ট পাঠ থেকে। ঠিক এই ধরনের চরিত্রকেই Ziolkowski বলেছিলেন "Figures on Loan"। তাঁর মতে, এই চরিত্রগুলিকে অন্য পাঠ থেকে ধার করা হয় এবং কাহিনির শেষে চরিত্রগুলি আবার উৎসপাঠে ফিরে যায়। অর্থাৎ, পূর্বসৃষ্ট কোনো পাঠের সম্পূর্ণ কাহিনির মাঝে নির্মাণ করা হয় আরেকটি পাঠের কাহিনি। অতএব চরিত্রটিকে একটি নতুন প্রসঙ্গে স্থাপন করা হয়। চরিত্রের এই পুনর্ব্যবহার দু'ভাবে হওয়া সম্ভব –

৩.৩.২.২.১. ভিন্ন লেখকের কলমে চরিত্রের পুনর্ব্যবহার

লেখক এক্ষেত্রে অন্য সাহিত্যিকের হাতে সৃষ্ট কোনও চরিত্রকে ধার করেন এবং নিজের ইচ্ছা মতো চরিত্রটিকে ব্যবহার করেন এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মের নিজস্ব প্রয়োজন বা চাহিদা অনুসারে চরিত্রটির রূপান্তর ঘটান।

এই ধরনের আন্তর্চারিত্রিকতা নবনীতার লেখায় যে যথেষ্ট সহজলভ্য, তার সাক্ষ্য দেয় তাঁর 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের 'পৌরাণিকী' পর্বের গল্পগুলি। এইসব গল্পে পুনরায় ব্যবহৃত হয়েছে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, শূর্পণখা, লব, কুশ, বাল্মীকি, অম্বা, ভীষ্ম প্রভৃতি চরিত্র। নবনীতার হাতে এইসব চরিত্র রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতিটি গল্পেই আসলে লেখিকা দেখাতে চেয়েছেন রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনির ভিতরে ভিতরে নিহিত নারীবঞ্চনার তথা নারীর মানসিক নির্যাতনের ইতিহাসকে। আর এই ইতিহাস সত্যকে উদ্ঘাটন করে, পুরুষশাসিত সমাজের কুটিল রূপকে তুলে ধরে। তাই স্বাভাবিকভাবেই রামায়ণ-মহাভারতের অন্তর্নিহিত নারীনিগ্রহকারী সমাজের ইতিহাসকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার উদ্দেশ্য পূরণ করতেই গল্পের চরিত্ররা আর তথাকথিত দেবতাসুলভ আচরণ করে না। চরিত্রগুলির রূপান্তরিত রূপ আমরা দেখতে পাই। অথচ মূল কাহিনিকে তিনি বদলাননি।

৩.৩.২.২.২. একই লেখকের কলমে চরিত্রের পুনর্ব্যবহার

লেখক তাঁর নিজের তৈরি চরিত্রগুলিকেই বিভিন্ন গল্প উপন্যাসে ফিরিয়ে আনেন। আত্মজীবনীমূলক লেখায় এটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

নবনীতা তাঁর অনেকানেক গল্পে নিজের জীবনের নানা ঘটনা তুলে এনেছেন। এইসমস্ত গল্পে একই চরিত্ররা ফিরে ফিরে এসেছে। উদাহরণ হিসেবে 'নিমন্ত্রণরক্ষা', 'ভরতকথা', 'MRIয়মান', 'মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর', 'নাট্যারম্ভ', 'জীবে দয়া', 'পরীক্ষা', 'ভালোবাসা কারে কয়', 'প্রজেক্ট চর্মচটিকা' প্রভৃতি গল্পের নাম করা যায়, যেখানে বারবার ফিরে ফিরে এসেছে লেখিকা, তাঁর দুই মেয়ে, তাঁর মা, দিপুমামা ইত্যাদি চরিত্র।

আত্মজীবনীমূলক গল্প ছাড়াও নবনীতার 'আমি, অনুপম' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অনুপমকে ফিরে আসতে দেখা গেছে 'ফিনিক্স' উপন্যাসে একেবারেই পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে।

'বামাবোধিনী' উপন্যাসের অংশুমালা, সঞ্জয়, মালিনী এবং ওয়েন্ডি চরিত্র পুনরায় ফিরে এসেছে এক দশক পরে লেখা 'অভিজ্ঞান' উপন্যাসে। আসলে এই ধরনের আন্তর্চারিত্রিকতায় চরিত্রগুলিকে পাঠ থেকে পাঠান্তরে বিভিন্ন পটভূমিকায় স্থাপন করা হয়। আর এভাবে চরিত্রগুলি ক্রমশ পরিণতির পথে অগ্রসর হয়।

৩.৩.২.৩. একাধিক চরিত্রের সংযোগ ও মিশ্রণের দ্বারা সৃষ্ট আন্তর্চারিত্রিকতা

এক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক পাঠ থেকে চরিত্র গ্রহণ ক'রে সম্পূর্ণ নতুন কন্টেক্সটে চরিত্রগুলির পারস্পরিক মিশ্রণ ঘটানো হয়। দুটি পৃথক পাঠ থেকে চরিত্র নিয়ে সে-দুটির মিশ্রণে যখন একটি চরিত্র নির্মাণ করা হয়, তখন তা নিঃসন্দেহে আন্তর্চারিত্রিকতা তথা আন্তর্বয়ানের চরম প্রকাশ।

নবনীতার গল্পে এই জাতীয় আন্তর্চারিত্রিকতাও বাদ পড়েনি। 'বাপ রে বাপ!' গল্পটি তারই সাক্ষ্য বহন করছে। এই গল্পে চরিত্রের মিশ্রণ হয়েছে নিম্নরূপে –

> [পরশুরামের 'কচি সংসদ' গল্পের চরিত্র লালিমা পাল (পুং)] + [লীলা মজুমদারের 'পদিপিসির বর্মী বাক্স' গল্পের চরিত্র পদিপিসি] = [নবনীতা দেবসেনের 'বাপ রে বাপ!' গল্পের সোমেশ চরিত্র]

'বাপ রে বাপ!' গল্পটির কেন্দ্রে আমরা এমন এক পুরুষকে পাই, যিনি অন্তরে নারী। সোমেশ নিজেকে নারীরূপে ভাবতে ভালোবাসেন, দেখতে ভালোবাসেন, সাজাতে ভালোবাসেন। তাঁর স্ত্রী বর্তমান এবং তিন সন্তানের বাবা তিনি। তাঁর বিশেষ ধরনের স্বভাব বা তথাকথিত 'মেয়েলি' স্বভাবকে ফুটিয়ে তোলার জন্য গল্পে 'লালিমা পাল (পুং)' এবং 'পদিপিসি'র একটা আবেশ তৈরি করা হয়েছে নিম্নরূপে –

i. চিরকালই সোমেশের চেহারায় সেই মেয়েলি মিষ্টতা আছে, 'লালিমা পাল (পুং)' গোছের একটা লাবণ্য, যাকে বলে লালিত্য।[৯৪]

ii. 'দিন দিন যেন পদিপিসি টাইপের স্বভাব হচ্ছে তোমার' – গাল দিচ্ছিলেন স্বামীকে ইন্দ্রাণী।[৯৫]

পরশুরামের হাস্যরসাত্মক গল্প 'কচি সংসদ'-এ আমরা 'লালিমা পাল (পুং)' নামের একটি চরিত্র পেয়েছিলাম[৯৬]। সে কচি সংসদের সদস্য। সদস্যরা অনেকেই সেখানে পুরুষোচিত কাঠিন্য নয়, বরং নারীসুলভ পেলবতা নিয়ে চলে। এই পেলবতার প্রকাশ দেখা যায় তাদের স্বনির্বাচিত নামে। লালিমা পাল (পুং) সেরকমই একজন। 'বাপ রে বাপ!' গল্পে সোমেশও এরকমই কোমল মিষ্টি নারীস্বভাব বিশিষ্ট। অন্যদিকে মেয়েদের মতোই বা আরও ভালোভাবে বোঝাতে গেলে লীলা মজুমদারের কলমে সৃষ্ট চরিত্র পদিপিসির মতোই মেয়েদের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন সোমেশ। আর এভাবেই গল্পে ধরা দেয় সোমেশ চরিত্রের একধরনের ইমেজ। সেইসঙ্গে প্রকারান্তরে ধরা দেয় দেহে-মনে পরস্পর পৃথক লিঙ্গসচেতনতার যেসব মানুষ আমাদের সমাজে রয়েছেন, খানিকটা তাঁদের ইমেজও।

৩.৩.২.৪. অন্য চরিত্রের অনুকরণের ফলে সৃষ্ট আন্তর্চারিত্রিকতা

বাস্তবক্ষেত্র বা সাহিত্যক্ষেত্র থেকে কোনও এক শক্তিশালী অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী নায়ককে (বা নায়িকা) আদর্শ হিসেবে বিবেচনা ক'রে লেখক বর্তমান চরিত্রের ওপর ওই চরিত্রের ছায়া ফেলেন।

নবনীতার 'জীবে দয়া' গল্পে এই জাতীয় আন্তর্চারিত্রিকতার নিদর্শন মেলে –

- রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা একটি অসুস্থ কুকুরের প্রতি পিকোর যে সেবা এবং বাৎসল্যের প্রকাশ দেখা যায়, তার নিরিখে লেখিকা পিকোকে 'মা টেরেসা জুনিয়ার' বলেছেন[৯৭]। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এই নামকরণ মাদার টেরেসার সেবাব্রতী মনোভাবের প্রভাবজাত।

- কুকুর-সেবার কাজে পিকোকে সবসময় সাহায্য করে তার ছোট বোন টুম্পা। এমনকি দিদি অন্ধকারে কুকুরটিকে খেতে দিতে যাবে ব'লে সে টর্চ ধ'রে থাকে। এজন্য সে নিজেই নিজেকে বলে 'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প'[৯৮]। ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল এই নামে পরিচিত ছিলেন। ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেলকে নিয়ে Lee Wyndham 'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। টুম্পা তার স্কুলের পাঠ্যবইয়ের এই গল্পটির কথা স্মরণ ক'রেই নিজেকে এই নামে চিহ্নিত করতে চায়। কাজেই একইসঙ্গে উক্ত ইংরেজি গল্প এবং বাস্তবের আদর্শময়ী নারী ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল চরিত্রের ছাপ গল্পের এই অংশে আন্তর্চারিত্রিকতা তৈরি করল।

৩.৪. উপসংহার

নবনীতা দেবসেনের উপন্যাসগুলি বেশ গুরুগম্ভীর বা সিরিয়াস প্রকৃতির। তুলনায় গল্পগুলি অধিকাংশই মজার অথবা সিরিয়াস বিষয়ও সেখানে হাস্যরসে আবৃত করে পরিবেশিত হয়েছে। তাই গল্পগুলিতে ধনাত্মক ঋণাত্মক উভয় প্রকার আন্তর্বয়ানের প্রতিপত্তি থাকলেও, উপন্যাসে আন্তর্বয়ানের ব্যবহার একেবারেই হাতেগোনা। অধিকাংশ উপন্যাসে তো আন্তর্বয়ান প্রায় চোখেই পড়ে না। আর যেসব উপন্যাসে অল্পস্বল্প দেখা পাওয়া যায়, সেগুলি সবই ধনাত্মক আন্তর্বয়ান। *ফিনিক্স* উপন্যাসের অন্তর্গত আন্তর্বয়ান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণার জন্য নির্বাচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'আমি অনুপম' এবং 'বামাবোধিনী'-তে দুয়েকটি আন্তর্বয়ানের সন্ধান পাওয়া যায়।

বেশ কিছু আন্তর্বয়ান একাধিক গল্প-উপন্যাসে ফিরে ফিরে এসেছে। এ থেকে স্পষ্ট যে ওইসব আন্তর্বয়ানের প্রতি লেখিকার আকর্ষণ বেশি ছিল।

আন্তর্বয়নের ক্ষেত্রে নবনীতার বিশেষ ঝোঁক দেখা যায় রূপকথার সংরূপগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি। আরেকটি প্রধান প্রবণতা হল রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে আন্তর্বয়ানের ব্যবহার। এই দুই প্রধান

আকর্ষণের কারণ হয়তো নিহিত আছে তাঁর জীবনচর্যার মধ্যে, তাঁর সাহিত্য-যাপনের ভিতরে। জীবনের নানাবিধ উত্থানপতনের মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তিনি রবীন্দ্রসৃষ্টির সান্নিধ্যে এসেছেন বারবার। অন্যদিকে, রূপকথার ভাষাছাঁদ তাঁর ভাব প্রকাশের মাধ্যম শুধু নয়, বলা ভালো তাঁর ভাব প্রকাশের অন্যতম নিজস্ব হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। কারণ, আমরা লক্ষ করেছি, রূপকথার ভাষা বৈশিষ্ট্য তিনি যখন ব্যবহার করেন, তখন তা ঋণাত্মক আন্তর্বয়ন হয়ে যায়। অর্থাৎ, সেগুলি ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে অন্য কোনো গভীরতর বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে।

দুর্বল ধনাত্মকের সঙ্গে দুর্বল ঋণাত্মকের পার্থক্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেখা হয়েছে উভয় পাঠের প্রসঙ্গের মিলের ভাগটা বেশি নাকি অমিলের ভাগটাই বেশি। মিলের ভাগ বেশি হলে দুর্বল ধনাত্মক প্রকৃতির আবেশ, দুর্বল ধনাত্মক প্রকৃতির উদ্ধৃতি ইত্যাদি হবে আর অমিলের ভাগ বেশি হলে পাওয়া যাবে দুর্বল ঋণাত্মক প্রকৃতির আবেশ, দুর্বল ঋণাত্মক প্রকৃতির উদ্ধৃতি ইত্যাদি। তাছাড়া, ঋণাত্মক আন্তর্বয়ান যেখানে প্রযুক্ত হয়েছে, সেখানে দেখা গেছে অব্যবহিত প্রসঙ্গের গুরুত্ব আসলে উৎসপাঠের প্রসঙ্গের গুরুত্বের তুলনায় অনেকখানি লঘু। অ্যাব্রাম্‌সের কথা পুনরায় ধার করে বলা যায়, ঋণাত্মক আন্তর্বয়ানের ব্যবহার হয় আসলে "to undercut it ironically"। নবনীতার লেখায় যা আসলে গল্পের হাস্যরস সৃষ্টির এক জোরাল পন্থা হয়ে উঠেছে। দুর্বলভাবে ঋণাত্মক আন্তর্বয়ানের ক্ষেত্রেও উপস্থাপ্য বিষয়কে আন্তর্বয়ানের উৎসের তুলনায় শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে লঘু করে দেখানোর প্রবণতা থাকে।

তবে একথাও স্বীকার করে নেওয়া সমীচীন যে আন্তর্বয়ানের দুর্বলভাবে ধনাত্মকতা এবং দুর্বলভাবে ঋণাত্মকতা – এই দুই বৈশিষ্ট্য পাঠকভেদে কিংবা একই পাঠকের ভিন্ন সময়ের অনুভূতিভেদে বদলে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে কোনও একটি দুর্বলভাবে ধনাত্মক আন্তর্বয়ান

একজন পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ ঋণাত্মক হিসাবে প্রতিভাত হতে পারে। অনুরূপ কারণে, একটি দুর্বলভাবে ঋণাত্মক আন্তর্বয়ানও প্রতিভাত হতে পারে সম্পূর্ণ ধনাত্মক আন্তর্বয়ানরূপে।

বর্তমান অধ্যায়ে গবেষকের একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বহুবিচিত্র আন্তর্বয়ান আসলে পাঠকের স্মৃতিশক্তি এবং বিস্তৃত পাঠ-অভিজ্ঞতা দাবি করে। কিন্তু পাঠক হিসেবে বর্তমান গবেষকের নিজস্ব পাঠ-অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে নবনীতা দেবসেনের মতো একজন বিদগ্ধ এবং সারাজীবনব্যাপী বহুবিধ পাঠে ঋদ্ধ লেখিকার পাঠ-অভিজ্ঞতার স্তর থেকে বহু দূরবর্তী অবস্থানে। এছাড়া স্মৃতিশক্তির দৌড়েও সকল পাঠক সমান পারঙ্গম নয়। তাই অনিচ্ছাকৃতভাবেই হয়তো অনেক আন্তর্বয়ান দৃষ্টির বাইরে থেকে গেল। এছাড়া, কিছু কিছু আন্তর্বয়ান ইচ্ছাকৃতভাবেও ব্যাখ্যা করা হয়নি সমজাতীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে।

৩.৫. তথ্যসূত্র

১। Graham Allen, *Intertextuality* (London: Routledge, 2000), 5.

২। William Shakespeare, *Romeo and Juliet*, act 2, scene 2, 46, accessed April 25, 2025, https://shakespear.folger.edu.

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বলাকা* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, নূতন সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ), ৩২।

৪। জামিয়া রহমান খান তিসা, “প্যারোডি এবং বাংলা সাহিত্য,” শেষবার দেখার তারিখ ফেব্রুয়ারি ০৬, ২০২৩, https://roar.media/bangla/main/literature/parody-and-bangla-literature.

৫। Julia Kristeva, “The Bounded Text,” In *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*, trans. Thomas Gora, Alice Jardine, and Leon S. Roudiez (New York: Columbia University Press, 1980), 36.

৬। Julia Kristeva, “Word, Dialogue, and Novel,” In *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*, trans. Thomas Gora, Alice Jardine, and Leon S. Roudiez (New York: Columbia University Press, 1980), 66.

৭। Allen, *Intertextuality*, 1.

৮। Allen, *Intertextuality*, 37.

৯। M. Ahmadian and H. Yazdani, “A Study of the Effects of Intertextuality Awareness on Reading Literary Texts: The Case of Short Stories,” *Journal of Educational*

and Social Research 3, no. 2 (May 2013): 160–61, accessed February 11, 2023, https://doi.org/10.5901/jesr.2013.v3n2p155.

১০। M. H. Abrams and G. G. Harpham, *A Glossary of Literary Terms* (Delhi: Cengage Learning, 2012), 12.

১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে", *গীতবিতান* (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ), ৩৪৬।

১২। ঠাকুর, *গীতবিতান,* ৩৪৬।

১৩। নবনীতা দেবসেন, "সেদিন দুজনে", *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯), ২৪৯।

১৪। দেবসেন, "সেদিন দুজনে", ২৬২।

১৫। দেবসেন, "সেদিন দুজনে", ২৬৩।

১৬। দেবসেন, "সেদিন দুজনে", ২৫৮।

১৭। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সম্পা., *কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ* (কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ), ২০ (শ্রীগীতগোবিন্দম্ অংশে)।

১৮। নবনীতা দেবসেন, "সেদিন দুজনে", *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯), ২৪৯।

১৯। দেবসেন, "সেদিন দুজনে", ২৫৪।

২০। দেবসেন, "সেদিন দুজনে", ২৫৩।

২১। দেবসেন, "সেদিন দুজনে", ২৫৩।

২২। দেবসেন, "সেদিন দুজনে", ২৫৯।

২৩। দেবসেন, "সেদিন দুজনে", ২৬৫।

২৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "সখী, ভাবনা কাহারে বলে", *গীতবিতান* (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ), ৭৭১।

২৫। নবনীতা দেবসেন, "ভালোবাসা কারে কয়", *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯), ৩১২।

২৬। দেবসেন, "ভালোবাসা কারে কয়", ৩১০।

২৭। দেবসেন, "ভালোবাসা কারে কয়", ২৯৪-৯৫।

২৮। দেবসেন, "ভালোবাসা কারে কয়", ২৯৮।

২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বাজিল, কাহার বীণা", *গীতবিতান* (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ), ২৮১।

৩০। দেবসেন, "ভালোবাসা কারে কয়", ৩০৬।

৩১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অসমাপ্ত," *সঞ্চয়িতা* (কলকাতা: সাহিত্যম্, ২০০৩), ৪৭১।

৩২। দেবসেন, "ভালোবাসা কারে কয়", ৩০৯।

৩৩। দেবসেন, “ভালোবাসা কারে কয়”, ৩০৩।

৩৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “হে মাধবী, দ্বিধা কেন”, *গীতবিতান* (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ), ৫২৩।

৩৫। সুকুমার রায়, *আবোল তাবোল* (কলকাতা: নির্মল বুক এজেন্সী, ২য় সংস্করণ, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ), ৪৮।

৩৬। Debabrata Biswas, “Hey Madhabi Dwidha Keno (হে মাধবী, দ্বিধা কেন)- Debabrata Biswas”, YouTube, February 28, 2015, music video, 0:00 to 0:46, https://youtu.be/u-201DnBdKQ?si=AFL_T5zYt6DU2y86.

৩৭। দেবসেন, “ভালোবাসা কারে কয়”, ২৯৫।

৩৮। দেবসেন, “ভালোবাসা কারে কয়”, ২৯৮।

৩৯। দেবসেন, “ভালোবাসা কারে কয়”, ৩০২।

৪০। স্বামী বিবেকানন্দ, “বীরবাণী”, *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড)* (কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ), ২৬৯।

৪১। নবনীতা দেবসেন, “মঁসিয়ো হুলোর হলিডে”, *গল্পসমগ্র ১* (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০১৯), ১১।

৪২। দেবসেন, “মঁসিয়ো হুলোর হলিডে”, ১১।

৪৩। Edgar A. Poe, “The Black Cat,” in *The Black Cat and Other Stories*, edited by Andy Hopkins and Jocelyn Potter (Harlow: Pearson Education Limited, 1999), 1-12.

৪৪। দেবসেন, “মঁসিয়ো হুলোর হলিডে”, ১২।

৪৫। যোগীন্দ্রনাথ সরকার, "কাকাতুয়া", *বাংলার কবিতা,* শেষবার দেখার তারিখ এপ্রিল ২৭, ২০২৫, https://banglarkobita.com/poem/famous/434.

৪৬। দেবসেন, “মঁসিয়ো হুলোর হলিডে”, ১২।

৪৭। মধুসূদন দত্ত, "মেঘনাদবধ কাব্য", *মধুসূদন রচনাবলী,* ৪র্থ সংস্করণ,। ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৪), ৫৬।

৪৮। নবনীতা দেবসেন, “ডক্টর দেবসেনের বিদেশযাত্রা”, *গল্পসমগ্র ১* (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০১৯), ৩৮।

৪৯। দেবসেন, “ডক্টর দেবসেনের বিদেশযাত্রা”, ৪৪।

৫০। দেবসেন, “ডক্টর দেবসেনের বিদেশযাত্রা”, ৪৯।

৫১। “Roy Sullivan”, Wikipedia, accessed February 11, 2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Roy_Sullivan.

৫২। দেবসেন, “ডক্টর দেবসেনের বিদেশযাত্রা”, ৩৮।

৫৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “শূন্য হাতে ফিরি হে”, *গীতবিতান* (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ), ১৬৪।

৫৪। দেবসেন, “ডক্টর দেবসেনের বিদেশযাত্রা”, ৪৬।

৫৫। মিলনসাগর, “তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান”, শেষবার দেখার তারিখ মার্চ ৩০, ২০২৩, http://www.milansagar.com/kobi/tarashankar/kobi-tarashankarbandyopadhyay_kobita4.html.

৫৬। নবনীতা দেবসেন, *ফিনিক্স,* ২য় সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৫), ৩৮।

৫৭। দেবসেন, *ফিনিক্স,* ৫৮।

৫৮। দেবসেন, *ফিনিক্স,* ৬৯।

৫৯। দেবসেন, *ফিনিক্স,* ৭৯।

৬০। জীবনানন্দ দাশ, “কুড়ি বছর পরে”, *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলকাতা: ভারবি, ২০১৪), ৫৮।

৬১। দাশ, “কুড়ি বছর পরে”, ৫৯।

৬২। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, “তোমার কাছেই”, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* মোঃ আফসারুল হুদা কর্তৃক প্রকাশিত (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৩), ৬৪।

৬৩। দেবসেন, *ফিনিক্স,* ৬৯।

৬৪। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, “আনন্দ-ভৈরবী”, *শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৪২), ৪৫-৪৬।

৬৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “কার মিলন চাও বিরহী”, *গীতবিতান* (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ), ১৭৩।

৬৬। দেবসেন, *ফিনিক্স,* ৮১।

৬৭। দেবসেন, *ফিনিক্স,* ৮৩।

৬৮। নবনীতা দেবসেন, "জরা হট্‌কে জরা বঁচ্‌কে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান!," *গল্পসমগ্র ৩,* ৪র্থ সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০২০), ১৭৯।

৬৯। Mahd Rafi and Geeta Dutt, "Ae Dil Hai Mushkil Jeena Yahan - HD Video Song," YouTube, uploaded on December 3, 2019, music video, 4:02 min, https://www.youtube.com/watch?v=R_JYoyWtLmk.

৭০। দেবসেন, "জরা হট্‌কে জরা বঁচ্‌কে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান!," ১৮৫।

৭১। দেবসেন, "জরা হট্‌কে জরা বঁচ্‌কে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান!," ১৮৮।

৭২। বুদ্ধদেব বসু, “চিল্কায় সকাল”, *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা,* সৌরেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত, (কলকাতা: নাভানা, ১৯৫৩), ৪৮।

৭৩। দেবসেন, "জরা হট্‌কে জরা বঁচ্‌কে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান!," ১৮০।

৭৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “তব গানের সুরে হৃদয় মম”, *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ষষ্ঠ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ), ২৩৪।

৭৫। নবনীতা দেবসেন, "বামুন-মুচি-রাজা," *গল্পসমগ্র ৩* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪), ৯৭।

৭৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “রাহুর প্রেম,” *সঞ্চয়িতা* (কলকাতা: সাহিত্যম্, ২০০৩), ২৪-২৬।

৭৭। দেবসেন, "বামুন-মুচি-রাজা," ১০০।

৭৮। Wikipedia, “The Graduate”, accessed February 11, 2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Graduate.

৭৯। দেবসেন, "বামুন-মুচি-রাজা," ১০০।

৮০। Wikipedia, “Parama (film)”, accessed February 11, 2023, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Parama_(film).

৮১। দেবসেন, "বামুন-মুচি-রাজা," ১০১।

৮২। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, “তুমি”, *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* মোঃ আফসারুল হুদা কর্তৃক প্রকাশিত (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৩), ৮।

৮৩। দেবসেন, "বামুন-মুচি-রাজা," ১০১।

৮৪। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পুতুল নাচের ইতিকথা* (কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ), ৯৪।

৮৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, *পুতুল নাচের ইতিকথা,* ১৮৯।

৮৬। নবনীতা দেবসেন, “সীতা থেকে শুরু,” *গল্পসমগ্র* ২, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২০৯।

৮৭। নবনীতা দেবসেন, *ফিনিক্স,* ৪২।

৮৮। নবনীতা দেবসেন, “অলৌকিক রত্নভস্ম এবং নন্দকাকু,” *গল্পসমগ্র ১* (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০১৯), ৬৯।

৮৯। দেবসেন, “অলৌকিক রত্নভস্ম এবং নন্দকাকু,” ৭১।

৯০। দত্ত, "মেঘনাদবধ কাব্য", ৩৫।

৯১। W. G. Müller, “Interfigurality: A Study on the Interdependence of Literary Figures,” in *Intertextuality*, ed. H. F. Plett (New York and Berlin: Walter de Gruyter, 1991), 102.

৯২। Müller, “Interfigurality,” 102.

৯৩। নবনীতা দেবসেন, "ভরতকথা", *গল্পসমগ্র ৩* (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০০৪), ১২৪-১২৫।

৯৪। নবনীতা দেবসেন, "বাপ রে বাপ!", *গল্পসমগ্র ৩* (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০০৪), ২৫৬।

৯৫। দেবসেন, "বাপ রে বাপ!", ২৫৬।

৯৬। রাজশেখর বসু, "কচি সংসদ", *পরশুরাম গল্পসমগ্র,* দীপংকর বসু সম্পাদিত (কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২), ১৫৯-১৭৬।

৯৭। নবনীতা দেবসেন, "জীবে দয়া", *গল্পসমগ্র ১* (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯৬), ১৬৮।

৯৮। দেবসেন, "জীবে দয়া", ১৬৮।

চতুর্থ অধ্যায়

পাঠকের বোধে আন্তর্বয়ানের প্রবেশ ও প্রভাব

৪. পাঠকের বোধে আন্তর্বয়ানের প্রবেশ ও প্রভাব

৪.১. ভূমিকা

আন্তর্বয়ন পুরো মাত্রায় একইসঙ্গে লেখক ও পাঠকের নিজস্ব পাঠভিত্তিক ধারণা নির্ভর একটি শৈলীগত মাধ্যম। কোনও একটি বাক্যে আন্তর্বয়ান ব্যবহৃত হলে, কেবলমাত্র সেই আন্তর্বয়ানের অন্তর্গত শব্দগুলির অর্থ জানলেই পাঠকের কাছে ওই বাক্যের অর্থের আবেদন সম্পূর্ণরূপে পৌঁছায় না। কারণ, আন্তর্বয়ানের সঙ্গে এমন কিছু পূর্ব-ধারণা বা এমন কিছু পাঠ-স্মৃতি যুক্ত থাকে, যাকে কেবল শব্দার্থ জ্ঞানের দ্বারা নয়, বরং পাঠ-অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বুঝতে হয়। যেহেতু লেখক এবং পাঠক উভয়ের কাছেই সংশ্লিষ্ট আন্তর্বয়ানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পূর্বপাঠের পরিস্থিতিসমূহ পরিচিত, তাই লেখককে আর বর্তমান পাঠের অন্তর্গত পরিস্থিতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে হয় না। আন্তর্বয়ান থেকেই পাঠক সমগ্র পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারেন। সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত বহুসংখ্যক দৃষ্টান্ত এর সাক্ষ্য বহন করছে। এবার বর্তমান অধ্যায়ে বিশ্লেষণের পালা যে পাঠক ঠিক কী প্রক্রিয়ায় আন্তর্বয়ানকে বুঝতে পারেন।

৪.২. পদ্ধতি

বর্তমান অধ্যায়ে গৃহীত পদ্ধতি হিসাবে বোধগত শৈলীবিজ্ঞানের ছকবদ্ধতা (schematicity) এবং রূপক (metaphor)-এর বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে [দ্র. ২.২]।

বোধগত শৈলীবিজ্ঞানের আরেকটি পদ্ধতির বিবরণ নিচে দেওয়া হল। পদ্ধতিটি হল সম্মুখন-পশ্চাদন পার্থক্য (figure-ground distinction)। বর্তমান অধ্যায়ে এই পদ্ধতিটিও কাজে লেগেছে।

৪.২.১ সম্মুখন-পশ্চাদন পার্থক্য (Figure-Ground Distinction)

বোধগত ভাষাবিজ্ঞানের জগতে খুব বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে আছে সম্মুখন (figure) ও পশ্চাদন (ground) সম্পর্কিত ধারণা। আমরা প্রথমে একটি ছবির মাধ্যমে বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করব (দ্র. চিত্র ৯) –

চিত্র ৯: সম্মুখন ও পশ্চাদন[১]

ছবিটি দু'ভাবে দেখা যেতে পারে – সাদা পশ্চাৎপটের ওপর কালো রঙের ফুলদানী অথবা কালো পশ্চাৎপটের সামনে মুখোমুখি দুটি মানুষের মুখ। যেভাবেই দেখা হোক না কেন, উভয় ক্ষেত্রেই একটি পশ্চাদন এবং একটি সম্মুখনের সমাহার হিসাবে ছবিটি আমাদের কাছে ধরা দেয়। কোনও একটি সাহিত্যিক পাঠের ক্ষেত্রেও এমন অনেক বিষয়গত এবং গঠনগত দিক থাকে, যেগুলিকে আমরা আমাদের সম্মুখন-পশ্চাদন ধারণার সাহায্যে বুঝতে পারি। যেমন, শৈলীবিজ্ঞানের ধারায় বহু চর্চিত প্রমুখন (foregrounding) হল সম্পূর্ণরূপে পাঠকের মানসিক ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে পাঠকের বোধের এলাকায় এই প্রমুখনের ধারণা গড়ে ওঠে সম্মুখন-পশ্চাদন ধারণার ভিত্তিতে। পাঠের অন্তর্গত যে বিষয়টি প্রমুখিত হয়, সেটি আসলে সম্মুখিত এবং যে সমস্ত ভাষাগত কিংবা বিষয়গত উপাদান দিয়ে প্রমুখন তৈরি করা হয়, সেটি হল ওই সম্মুখিত অংশের পশ্চাৎপট।

দৃশ্যগ্রাহ্য পৃথিবীতে আমাদের ধারণায় যেকোনও পশ্চাৎপটের ওপর সম্মুখন হতে পারে নিম্নরূপে –

> • it will be regarded as a self-contained object or feature in its own right, with well-defined edges separating it from the ground;
> • it will be moving in relation to the static ground;
> • it will precede the ground in time or space;
> • it will be a part of the ground that has broken away, or emerges to become the figure;
> • it will be more detailed, better focused, brighter, or more attractive than the rest of the field;
> • it will be on top of, or in front of, or above, or larger than the rest of the field that is then the ground. [২]

এককথায়, যে বিষয়টি আলাদাভাবে আমাদের নজর কাড়ে, সেটিই হল সম্মুখিত বিষয়। এবার দেখব, সাহিত্যিক পাঠের ক্ষেত্রে তাহলে কীভাবে পাঠকের বোধের জগতে এককেটি সম্মুখন হওয়া সম্ভব –

১) কোনও একটি চরিত্র তার সমস্ত কার্যকলাপ ও উপস্থিতির পৌনঃপুনিকতা অনুসারে একটি সমগ্র কাহিনিরূপ পশ্চাদন (ground)-এর ওপর সম্মুখন (figure) হয়ে উঠতে পারে।

২) মানবেতর কোনও প্রাণী যদি কাহিনিতে চরিত্রের সমান মর্যাদা পায়, তাহলে সেই প্রাণীটি কাহিনি-পশ্চাদনের ওপর সম্মুখিত হয়।

৩) পাঠের অন্তর্গত কোনও উপাদান যদি পাঠকের কাছে একেবারেই আশানুরূপ না হয়, তাহলে বলতে হবে সেটি সম্মুখিত। কিন্তু যদি উপাদানটি আশানুরূপ বা গতানুগতিক হয়, তাহলে তা পশ্চাতেই থেকে যায়।

৪) কোনও নির্দিষ্ট শৈলীগত বৈশিষ্ট্য যদি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়, তবে সেটিকে বলা হয় শৈলীর নিয়ন্ত্রক বৈশিষ্ট্য বা “dominant feature”[৩]। তখন সংশ্লিষ্ট পাঠের অন্তর্গত সবরকম শৈলীগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্মিত গ্রাউন্ডের ওপর নিয়ন্ত্রক বৈশিষ্ট্যটিই হয় ফিগার।

একটি পাঠের অন্তর্গত প্রত্যেকটি বিষয় কখনোই সমপরিমাণ মনোযোগ আদায় করতে পারে না। কারণ মনোযোগ সক্রিয় হয় খুবই নির্ধারিত ক্ষেত্রে। পাঠ মধ্যস্থ যেসব অংশে মনোযোগ আরোপিত হয়, সেগুলিই গোটা কাহিনিতে সম্মুখিত অংশ বা সম্মুখন (figure) হিসেবে চিহ্নিত হয়। আর যেসব অংশে মনোযোগ আরোপিত হয় না, সেগুলি উপেক্ষিত অংশ। সেইসব অংশ দ্বারাই তৈরি হয় কাহিনির পশ্চাদিত অংশ বা পশ্চাদন (ground)। পাঠকের এই মনোযোগকে লেখক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। অর্থাৎ, কোন্‌টি গ্রাউন্ডে থাকবে আর কোন্‌ বিষয়টি পাঠকের মনে ফিগার হিসেবে ধরা দেবে, তা লেখক ঠিক করে দেন।

৪.৩. বিশ্লেষণ ও আলোচনা

৪.৩.১. আন্তর্বয়ানের উপস্থিতি নির্ধারণে পাঠকের বোধগত প্রক্রিয়া

[দ্র. চিত্র ১০] চিত্রে দৃশ্যমান সাদা ক্ষেত্রটিকে যদি একটি সাদা পৃষ্ঠা ধরা হয়, তবে সেই পৃষ্ঠাটির ওপর রয়েছে দুটি কালো ছোপ। বলা বাহুল্য, সাদা অংশের তুলনায় ওই কালো অংশ দুটিই আমাদের বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। তার কারণ, এখানে সাদা পশ্চাদনের ওপর কালো সম্মুখন দেখা যাচ্ছে।

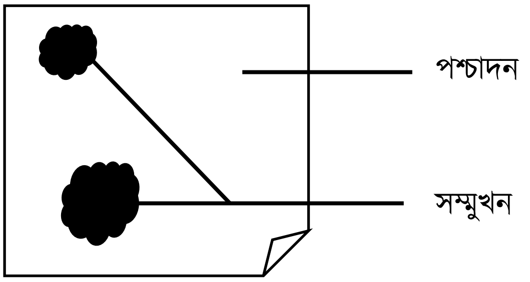

চিত্র ১০: সাদা পৃষ্ঠা (পশ্চাদন) এবং কালো ছোপ (সম্মুখন)

একইভাবে, নবনীতা দেবসেনের গল্প বা উপন্যাস পড়তে ব'সে যখন মাঝেমাঝেই একেকটি আন্তর্বয়ানের দেখা মেলে, তখন আসলে সব রকমের শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে নির্মিত ওই গোটা গল্প বা উপন্যাসটা হয়ে যায় পশ্চাদন এবং তার মধ্যে নজর কাড়ার মতো শৈলীগত বৈশিষ্ট্য বা "dominant feature" হিসেবে আন্তর্বয়ানগুলি সম্মুখিত হয়। এভাবে পাঠক কোনও একটি পাঠ মধ্যস্থ পুরনো পাঠের অভিজ্ঞতা সম্বলিত আন্তর্বয়ানগুলির উপস্থিতিকে সনাক্ত করতে পারেন।

৪.৩.২. আন্তর্বয়ানের অর্থ অনুধাবনে পাঠকের বোধগত কাঠামোর সক্রিয়তা ও বিবর্তন

আন্তর্বয়ানের উপস্থিতি সনাক্ত করার পর আসে বর্তমান পাঠের নিরিখে সেই আন্তর্বয়ানের অর্থ অনুধাবনের পালা। একেকটি আন্তর্বয়ানের অর্থ অনুধাবনের জন্য পাঠক তাঁর পূর্ব পাঠ-অভিজ্ঞতা সম্বলিত ছককে (schema) কাজে লাগান। কারণ, আন্তর্বয়ান তো নেওয়াই হয়েছে পূর্বসৃষ্ট অন্য কোনো একটি পাঠ থেকে। আন্তর্বয়ানে কীভাবে পাঠকের জ্ঞানের ছক সক্রিয় হয়, এখন সেটাই বোঝার চেষ্টা করব।

সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি, আন্তর্বয়ন ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক প্রকৃতির হতে পারে। এই ধনাত্মকতা ও ঋণাত্মকতা নির্ধারিত হয় বর্তমান পাঠ ও উৎসপাঠের সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ (context)-এর যথাক্রমে পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে।

ধনাত্মক আন্তর্বয়ানের ক্ষেত্রে উভয় পাঠের প্রাসঙ্গিক মিল থাকার দরুণ বর্তমান পাঠের অভিজ্ঞতা কিছুটা নতুন ধাঁচের হলেও, তা আসলে পাঠকের উৎসপাঠের সমজাতীয় অভিজ্ঞতাকে সুনিশ্চিত করে। তাই ধণাত্মক আন্তর্বয়ানের অর্থ বোঝার সময় পাঠকের ছক দৃঢ়ীকরণ (schema reinforcement) হয়। সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত বহুবিধ ধনাত্মক আন্তর্বয়ানের দৃষ্টান্ত এর সাক্ষ্য দেয়।

অন্যদিকে, ঋণাত্মক আন্তর্বয়ানের ক্ষেত্রে উভয় পাঠের প্রাসঙ্গিক মিল থাকে না। অথচ আন্তর্বয়ানের উপস্থিতি পাঠককে আগে পঠিত উৎসপাঠের সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ স্মরণ করায়। ঋণাত্মক আন্তর্বয়ান কার্যত পাঠকের জ্ঞান পুনর্গঠন (knowledge restructuring) করে। অর্থাৎ, পুরনো পাঠের জ্ঞান যে ছক নির্মাণ করেছিল, সেই ছকের অন্তর্গত ছাঁচগুলি (templates)-কে কাজে লাগিয়েই নতুন একটি ছক গড়ে ওঠে। বলা প্রয়োজন, ঋণাত্মক আন্তর্বয়ান কখনো উৎসপাঠ থেকে গড়ে ওঠা পুরনো ছকের ভাঙন (schema disruption) ঘটায় না। কারণ, ঋণাত্মক আন্তর্বয়ানটি পূর্বের জ্ঞানকে মিথ্যা প্রমাণ করে না। পাঠককে ধারণাগতভাবে কোনোরকম 'চ্যালেঞ্জ'-এর মুখোমুখি পড়তে হয় না। বরং, বিষয়টি দাঁড়ায় এরকম – সংশ্লিষ্ট আন্তর্বয়ানটি একাধারে উৎসপাঠ ও বর্তমান পাঠ উভয়ের প্রসঙ্গের জন্যই ব্যবহারযোগ্য। তবে এক্ষেত্রে, সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে বারবার যেকথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা পুনরায় স্মরণীয়। ঋণাত্মক আন্তর্বয়ান বর্তমান পাঠের প্রসঙ্গকে উৎসপাঠের প্রসঙ্গের তুলনায় শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে লঘু করে দেয়। তৃতীয় অধ্যায় থেকে যথেচ্ছভাবে একটি উদাহরণ নিয়ে [দ্র. ৩.৩.১.২.২-এর (iii)] বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক –

"আজি মোর দৈন্য করো ক্ষমা" – এই বাক্যের যা অর্থ, তা যেমন রবীন্দ্রনাথের 'অসমাপ্ত' কবিতাটির প্রসঙ্গে [৪] উপযুক্ত, তেমনি নবনীতা দেবসেনের 'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পে শিক্ষিকার কাছ থেকে ছাত্রটির বিদায় নেওয়ার সুভাষণ রীতির [৫] জন্যও উপযুক্ত। বাক্যটি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বক্তা উৎসপাঠের আবেগঘন অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে বর্তমান প্রসঙ্গে কাজে লাগাতে চেয়েছে। এই পর্যন্ত পাঠকের বোধগত প্রক্রিয়া ধনাত্মক আন্তর্বয়ানের জন্য ব্যবহৃত বোধগত প্রক্রিয়ার মতোই। কিন্তু তারপর দেখা যায়, উৎসপাঠ ও বর্তমান পাঠের প্রাসঙ্গিক বৈসাদৃশ্য এতই বেশি যে পাঠকের বোধে পুরনো ছকের অন্তর্গত কিছু ছাঁচ (templates) নিয়ে নতুন একটি ছক তৈরি হয়ে যায় [দ্র. সারণি ১০]।

'আজি মোর দৈন্য...'-র প্রসঙ্গ সংক্রান্ত পুরনো স্কিমার ছাঁচ	'আজি মোর দৈন্য...'-র প্রসঙ্গ সংক্রান্ত নতুন স্কিমার ছাঁচ
• আত্মনিবেদনের আকাঙ্ক্ষা	• কথোপকথন অব্যাহত রাখার ছদ্ম আকাঙ্ক্ষা
• বর্তমানে আত্মনিবেদনের অপারগতা	• বর্তমানে কথোপকথন অব্যাহত রাখা ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বুঝিয়ে দেবার অপারগতা
• ভবিষ্যতে আত্মনিবেদন করতে পারার প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতি	• ভবিষ্যতে কোনো একদিন বুঝিয়ে দেবার ছদ্ম প্রত্যাশা ও আশ্বাস
• ভবিষ্যতের সেই দিনটির জন্য নিজেকে যোগ্য করে তোলা	• ----
• প্রিয়তম	• শিক্ষিকা
• প্রিয়তমা	• ছাত্র

সারণি ১০: পাঠকের জ্ঞান পুনর্গঠনে ব্যবহৃত পুরনো স্কিমার ছাঁচ

সারণিতে নিম্নরেখাঙ্কিত তথ্যগুলি পাঠকের পরিচিত উৎসপাঠ থেকে তৈরি হওয়া পুরনো ছকের ছাঁচ।

সন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে নবনীতা দেবসেনের সাহিত্যে আন্তর্চারিত্রিকতার (যা বিশেষ এক ধরনের আন্তর্বয়ান) ব্যবহার বৈচিত্র্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে [দ্র. ৩.৩.৩]। আন্তর্চারিত্রিকতার যেসব প্রকারভেদ নবনীতার সাহিত্যে পাওয়া গেছে, সেগুলিকে বোঝার ক্ষেত্রে পাঠকের জ্ঞানের ছক কীভাবে সাড়া দিয়েছে, এখন সেটি বিশ্লেষণ করা হল।

চরিত্রনাম (যেমন – ভরত) [দ্র. ৩.৩.২.১], চরিত্রমিশ্রণ (যেমন – সোমেশ) [দ্র. ৩.৩.২.৩] এবং চরিত্রানুকরণ (যেমন – পিকো ও টুম্পা) [দ্র. ৩.৩.২.৪] পাঠকের জ্ঞান পুনর্গঠন করেছে। কারণ, এসব ক্ষেত্রে উৎসপাঠের চরিত্র সম্পর্কিত জ্ঞান অতীতে পাঠকের যে ছক নির্মাণ করেছিল, সেই ছকের ছাঁচকে কাজে লাগিয়েই বর্তমান পাঠের চরিত্রগুলিকে বুঝতে হয় ঠিকই, কিন্তু চরিত্রগুলি আদতে একেকটি নতুন চরিত্র।

ভিন্ন লেখকের কলমে চরিত্রের পুনর্ব্যবহার (যেমন – রাম ও সীতা) [দ্র. ৩.৩.২.২.১] পাঠকের ছক নবীকরণ (schema refreshment) করেছে। কারণ, রাম, সীতা প্রভৃতি চরিত্রের পুনর্ব্যবহার ক'রে নবনীতা আসলে 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের 'পৌরাণিকী' পর্বে বহুবিধ "বিকল্প সম্ভাবনার রঙ"[৬] ধরিয়েছেন। এভাবে মহাকাব্যিক পাঠের বিপরিচিতিকরণ করা হয়েছে। তাই এসব ক্ষেত্রে পাঠককে তাঁর মহাকাব্য পাঠের অভিজ্ঞতাকে ঝাড়াই-বাছাই ক'রে কিছুটা নতুনভাবে সাজিয়ে নিতে হয়। অতএব, এই জাতীয় আন্তর্চারিত্রিকতা পাঠকের ছক নবীকরণ করে এবং পাঠক তখন এই জাতীয় আন্তর্চারিত্রিকতা প্রয়োগের সার্থকতা যাথাযথভাবে অনুভব করতে পারেন।

একই লেখকের কলমে চরিত্রের পুনর্ব্যবহার (যেমন – অংশুমালা, নবনীতা) [দ্র. ৩.৩.২.২.২] পাঠকের ছক সংরক্ষণ (schema preservation) করেছে, আবার কখনো ছক বৃদ্ধি (schema accretion) করেছে। কারণ, এক্ষেত্রে চরিত্রগুলি একাধিক গল্পে বা উপন্যাসে ফিরে ফিরে এসেছে। ফলে প্রথম গল্প পাঠের পর দ্বিতীয় গল্প যখন পড়া হয়, তখন দেখা যায় পুনর্ব্যবহৃত চরিত্রটি পাঠকের পূর্বপরিচিত। তখন ওই দ্বিতীয় গল্পটি চরিত্রটি সম্পর্কে যা যা তথ্য দেয়, তা হয় পাঠকের ওই চরিত্র সম্পর্কিত আগের ছককেই হুবহু সমর্থন করে অথবা কিছু নতুন তথ্যের জোগান দিয়ে পাঠকের ছক বৃদ্ধি করে।

৪.৩.৩. আন্তর্বয়ান ও মেটাফরের আচরণগত সাদৃশ্য

একটি মেটাফরের যেমন উৎসক্ষেত্র (source domain) এবং লক্ষ্যক্ষেত্র (target domain) থাকে, ঠিক তেমনি আন্তর্বয়ানের সঙ্গেও লিপ্ত হয়ে আছে একটি উৎসপাঠ (source text) এবং একটি লক্ষ্যপাঠের (target text) ধারণা। আমরা জানি, একটি মেটাফরের লক্ষ্যক্ষেত্রের অর্থ

বুঝতে সাহায্য করে উৎসক্ষেত্র। একইভাবে আন্তর্বয়ানের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্যপাঠের অর্থ বোঝার জন্য উৎসপাঠের সাহায্য পাই।

মেটাফরের উৎসক্ষেত্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের ছক (schema) থাকে। সেই ছক আমরা লক্ষ্যক্ষেত্রের অর্থ বোঝার জন্য কাজে লাগাই। যেমন, 'তর্ক হল যুদ্ধ' – এই মেটাফরের উৎসক্ষেত্র হল 'যুদ্ধ'। যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের সুনির্দিষ্ট ছক রয়েছে। এই ছককে কাজে লাগিয়েই আমরা এই মেটাফরের লক্ষ্যক্ষেত্র 'তর্ক'-এর অর্থ বুঝতে পারি।

এবার দেখব, আন্তর্বয়ানের ক্ষেত্রেও উৎসপাঠ সম্পর্কে আমাদের পাঠ-অভিজ্ঞতা থাকলে, তবেই লক্ষ্যপাঠে ব্যবহৃত আন্তর্বয়ানটির অর্থের অনুধাবন যথাযথ হয়। উৎসপাঠে ব্যবহৃত একটি বাক্যের অব্যবহিত প্রসঙ্গ (context) সম্পর্কে পাঠক আগে থেকেই জানেন। ফলে উৎসপাঠের ওই নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ সংক্রান্ত একটি ছক (schema) আগে থেকেই নির্মিত হয়ে থাকে। সেই ছককেই পাঠক লক্ষ্যপাঠের অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট আন্তর্বয়ানের অর্থ বোঝার জন্য কাজে লাগান। বলা বাহুল্য, লক্ষ্যপাঠে অর্থাৎ বর্তমান পাঠে প্রযুক্ত আন্তর্বয়ানের আবেদন তার বাচ্যার্থে সীমাবদ্ধ থাকে না। আন্তর্বয়ানের ব্যাঞ্জনার্থ তৈরি হয় উৎসপাঠের প্রাসঙ্গিক স্মৃতির সংযোগ থাকে বলেই। লক্ষ্যপাঠের এই ব্যাঞ্জনার্থ মেটাফরের লক্ষ্যক্ষেত্রের বিমূর্ততার সাথে তুলনীয়। এই ব্যাঞ্জনার্থকে বুঝতে হয় উৎসপাঠের সংশ্লিষ্ট বাক্য (বা অন্য কোনো অংশ)-এর বাচ্যার্থের সাহায্যে। উৎসপাঠের এই বাচ্যার্থ মেটাফরের উৎসক্ষেত্রের মূর্ততার সাথে তুলনীয়।

মেটাফরের দুটি এলাকার মধ্যে যেমন কিছু সাদৃশ্য আছে, তেমনি কিছু বৈসাদৃশ্যও আছে। অর্থাৎ, 'তর্ক হল যুদ্ধ' – এই মেটাফরে 'তর্ক' এবং 'যুদ্ধ'-এর সব বৈশিষ্ট্য একরকম নয়। উভয়ের মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্যও আছে। একইভাবে, উৎসপাঠ ও লক্ষ্যপাঠের প্রসঙ্গের মধ্যেও

যেমন কিছু সাদৃশ্য থাকে তেমনি বৈসাদৃশ্যও থাকে অনেকখানি। বৈসাদৃশ্য থাকে বলেই দুটি পাঠ দুটি ভিন্ন সৃষ্টি হয়ে ওঠে।

নিচের সারণিতে সংক্ষেপে মেটাফরের সঙ্গে আন্তর্বয়ানের ব্যবহারিক সাদৃশ্য দেখানো হল [দ্র. সারণি ১১]।

মেটাফর	আন্তর্বয়ান
১) উৎসক্ষেত্র সম্পর্কিত জ্ঞান লক্ষ্যক্ষেত্রকে বুঝতে সাহায্য করে।	১) উৎসপাঠ সম্পর্কিত জ্ঞান লক্ষ্যপাঠকে বুঝতে সাহায্য করে।
২) উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে বৈসাদৃশ্য আছে বিস্তর।	২) উভয় পাঠের মধ্যে বৈসাদৃশ্য আছে বিস্তর।

সারণি ১১: আন্তর্বয়ান ও মেটাফরের আচরণগত সাদৃশ্য

একেকটি আন্তর্বয়ান আসলে মেটাফরের ন্যায় ভূমিকা পালন করে এবং বর্তমান পাঠের অর্থ এক অন্য মাত্রা নিয়ে পাঠকের বোধের জগতে প্রবেশ করে। ২০১২ সালে তিনটি পাঠের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন Mary-Anne Shonoda তাঁর 'Metaphor and Intertextuality: A Cognitive Approach to Intertextual Meaning-Making in Metafictional Fantasy Novels'[৭] শীর্ষক গবেষণা-নিবন্ধে। এই সিদ্ধান্তকেই প্রবলভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের স্তরে স্তরে বিধৃত বিবিধ আন্তর্বয়ান।

৪.৪. তথ্যসূত্র

১। Peter Stockwell, *Cognitive Poetics: An Introduction* (London and New York: Routledge, 2002), 13.

২। Stockwell, *Cognitive Poetics*, 15.

৩। Stockwell, *Cognitive Poetics*, 15.

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "অসমাপ্ত," *সঞ্চয়িতা* (কলকাতা: সাহিত্যম্, ২০০৩), ৪৭১।

৫। নবনীতা দেবসেন, "ভালোবাসা কারে কয়", *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৯), ৩০৬।

৬। নবনীতা দেবসেন, “সীতা থেকে শুরু,” *গল্পসমগ্র* ২, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২০৯।

৭। Mary-Anne Shonoda, “Metaphor and Intertextuality: A Cognitive Approach to Intertextual Meaning-Making in Metafictional Fantasy Novels”, *International Research in Children s Literature* 5, no. 1 (July 2012): 81-96, accessed June 11, 2023, https://www.researchgate.net/publication/274562324_Metaphor_and_Intertextuality_A_Cognitive_Approach_to_Intertextual_Meaning-Making_in_Metafictional_Fantasy_Novels.

পঞ্চম অধ্যায়

নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে বিচ্যুতি ও সমান্তরতার কার্যকারিতা

৫. নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে বিচ্যুতি ও সমান্তরতার কার্যকারিতা

৫.১. ভূমিকা

শৈলীবিজ্ঞানীরা ‘foregrounding’ শব্দটি প্রথম ধার করেছিলেন শিল্প সমালোচনার জগত থেকে। কোনও একটি ছবির ‘ব্যাকগ্রাউন্ডে’র সঙ্গে বৈপরীত্য বোঝাতেই ‘ফোরগ্রাউন্ড’ শব্দটির ব্যবহার। নিচের ছবি (দ্র. চিত্র ১১) থেকে বোঝা যাবে কীভাবে দুটি ফুলের প্রমুখন বা ‘ফোরগ্রাউন্ড’ করা হয়েছে। ফুল দু’টি ছাড়া ছবিতে উপস্থিত বাকি সবকিছুই অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। তাই সেগুলি আছে ব্যাকগ্রাউন্ডে। কীভাবে এই প্রমুখন করা হল? ফুলদুটিকে ছবির মাঝখানে রাখা হয়েছে এবং ছবির অন্যান্য অংশের তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে।

চিত্র ১১: প্রমুখনের দৃষ্টান্ত [১]

এরকমই প্রমুখন হতে দেখা যায় সাহিত্যজগতেও তখন তাকে বলা হয় ভাষাতাত্ত্বিক প্রমুখন (linguistic forgrounding)। পাঠের অন্তর্গত কোনও বিষয়কে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তাকে অন্যান্য অংশের তুলনায় স্পষ্ট ক’রে ফুটিয়ে তোলার একটা পদ্ধতি হল প্রমুখন। ছবির

মতোই গল্প, উপন্যাস, কবিতা ইত্যাদির ক্ষেত্রেও আমরা দেখি, একটি পাঠের প্রত্যেকটি অংশের পারস্পরিক সহাবস্থান পাঠের সম্পূর্ণতা এনে দেয়। কিন্তু তার মধ্যেও আবার কোনও কোনও অংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন সেইসব অংশের প্রমুখন করা হয়। প্রমুখনের কার্যকারিতা দ্বিবিধ –

১) প্রমুখিত অংশ পৃথকভাবে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

২) প্রমুখিত অংশকে কেন গুরুত্ব সহকারে স্পষ্ট ক'রে তোলা হল, তা পাঠক বুঝতে পারেন ওই অংশের বিশেষ গঠনের সাহায্যে। অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট অংশ যে অতিরিক্ত অর্থ বহন করছে, তাকে পাঠক সুনির্দিষ্টভাবে চিনতে পারেন।

প্রমুখন করা হয় সাধারণত বিচ্যুতি (deviation) আর সমান্তরতা (parallelism) সৃষ্টির মাধ্যমে।

বিচ্যুতি হয় তখনই, যখন আমাদের হাতে একগুচ্ছ নিয়ম থাকে অথচ সেই নিয়ম ভেঙে দেওয়া হয়। ***ঠিক যেমন এই বাক্যটির হরফ বাঁকিয়ে দিয়ে এবং মোটা হরফ ব্যবহার ক'রে লেখার সাধারণ নিয়ম ও সেইমতো পাঠকের স্বাভাবিক প্রত্যাশা ভেঙে দেওয়া হল।*** এই বিচ্যুতিই বাক্যটিকে অন্যান্য বাক্যের থেকে আলাদা করে দিয়ে বাক্যটির প্রমুখন করল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিচ্যুতি কেবলমাত্র ভাষার ব্যাকরণ সাপেক্ষ নয়। আরও নানাবিধ উপায়ে বিচ্যুতি সম্ভব। ওপরের উদাহরণে দৃশ্যমান হরফের পরিবর্তনও সেরকমই একটি উপায়।

বিচ্যুতি কিংবা সমান্তরতার গঠনকে অবলম্বন ক'রে প্রমুখন তৈরি হলেও, প্রমুখন আসলে একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। সেজন্যই আমরা দেখি, বিচ্যুতি কিংবা সমান্তরতাজনিত ভাষাতাত্ত্বিক গঠন পাঠের সংশ্লিষ্ট অংশ তথা সমগ্র পাঠের অর্থের ওপর প্রভাব বিস্তার করে – অর্থের ভিন্নতর মাত্রা সৃষ্টি করে। আর ওই বিশেষ ভাষাতাত্ত্বিক গঠন পাঠকের মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোয়

প্রভাব ফেলে বলেই পাঠক প্রমুখনের অস্তিত্ব টের পান। এই বিষয়ে van Peer-এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য,

> … van Peer (1986) has provided empirical evidence to substantiate the claim that foregrounded elements are not only psychologically more striking but are also regarded as more important in relation to the overall interpretation of the text.[২]

বিচ্যুতি এবং সমান্তরতা ভাষার যেকোনও স্তরেই (ধ্বনি, রূপ, শব্দ, অর্থ, বাক্য ইত্যাদি) হতে পারে। বর্তমান অধ্যায়ের বিশ্লেষণ ও আলোচনা অংশে ভাষাগত বিভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে নবনীতার কথাসাহিত্যে বিচ্যুতি ও সমান্তরতার বিন্যাস পরীক্ষা করা হবে।

অর্থের ভিন্নতর মাত্রা সৃষ্টিতে বিচ্যুতির মতোই আরও একটি শৈলীগত প্রক্রিয়া হল সমান্তরতা। দুই বা ততোধিক ভাষিক গঠন যখন পরস্পর সমজাতীয় হয়, তখনই তাদেরকে একে অপরের সমান্তর বলা হয়। ভাষার এরূপ গঠনগত সমতাই হল সমান্তরতা। পাঠ মধ্যস্থ কোনো অংশে সমান্তরতা প্রযুক্ত হলে, কোনো একক বিষয় বা ভাবনার প্রমুখন হচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে। তবে সব সমান্তরতার ক্ষেত্রে যে প্রমুখন হবেই এমন নিশ্চয়তা নেই। প্রমুখন হোক বা না-হোক, সমান্তরতা সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের অর্থকে প্রভাবিত করতে পারে দু'ভাবে। সমান্তর অংশগুলি পাঠকের কাছে একই অর্থ বোধক হতে পারে অথবা বিপরীতার্থক হতে পারে। এটিকে বলা হয় সমান্তরতা সূত্র (parallelism rule)। ভাষাতাত্ত্বিক মাইক শর্টের (Mick Short) কথায়,

> 'When readers come across parallel structures they try to find an appropriate semantic relationship between the parallel parts.' This is often a relationship of quasi-synonymy or quasi-antonymy…[৩]

তবে এটি কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নয়। প্রায়শই এই নিয়ম অনুসৃত হলেও তার ব্যতিক্রমও একেবারে দুর্লভ নয়।

সমান্তরতা সূত্র সমান্তর গঠনের অন্তর্গত কোনও অজানা শব্দের মানে বুঝতে সাহায্য করে। আবার, আভিধানিক অর্থানুযায়ী দুটি শব্দ সমার্থক বা বিপরীতার্থক না-হলেও সমান্তরতার মাধ্যমে পাঠক সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে শব্দদুটির মধ্যে প্রায়-সমার্থক (quasi-synonymy) অথবা প্রায়-বিপরীতার্থক (quasi-antonymy) সম্পর্ক আবিষ্কার করতে পারেন।

বিচ্যুতি দু'ধরনের হতে পারে – বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীন। সচরাচর আমরা যেসব ভাষাগত বিচ্যুতি দেখি, সেগুলি সবই বাহ্যিক বিচ্যুতি। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির ক্ষেত্রে দেখা যায়,

> রচনার ভিতরেই রচয়িতা স্বয়ং একটি ভাষা-ছাঁচ বা প্যাটার্ন বানিয়ে তোলেন এবং তারপর নিজেই সেই প্যাটার্ন থেকে বিচ্যুত হন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরনের বিচ্যুতি সংশ্লিষ্ট পাঠের নিরিখে বিশেষ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।[৪]

আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির সহায়ক হল আভ্যন্তরীণ প্যাটার্ন। আর আভ্যন্তরীণ প্যাটার্ন নির্মিত হয় সমান্তরতার দ্বারাই। এক্ষেত্রে সমান্তরতা দু'ভাবে ক্রিয়াশীল হয় –

(ক) সমধর্মী ঘটনার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে সমান্তরতা

(খ) ভাষিক গঠনের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে সমান্তরতা

যখন এই সমান্তর প্যাটার্ন ভেঙে যায় অর্থাৎ বিচ্যুতি দেখা যায়, তখনই তৈরি হয় ক্লাইম্যাক্স। এটির দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা জগদীশ গুপ্তের 'দিবসের শেষে' গল্পের উল্লেখ করতে পারি। এই গল্পে দেখা যায়, প্রতিটি অনুচ্ছেদে শেষ বাক্যটি হয়েছে ক্ষুদ্রতম। বাক্যগুলির শব্দসংখ্যা ৩ থেকে ৫। আর সেই ক্ষুদ্রতম বাক্যগুলিই গল্পের গুরুত্বপূর্ণ বার্তাবাহী। এভাবে লেখক গল্পের ভিতরে একটি প্যাটার্ন নির্মাণ করেছেন। কিন্তু গল্পের শেষে গিয়ে লেখক তাঁর স্বনির্মিত গুরুত্বপূর্ণ ছোট বাক্যের এই প্যাটার্ন থেকে বিচ্যুত হয়ে যান। গল্পের পরিণাম নির্দেশক সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ বাক্যটি আর মোটেই ক্ষুদ্র থাকে না, বাক্যটির শব্দসংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ৪৬। এই আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতির ফলে ৪৬-শব্দের বড় বাক্যটির প্রমুখন হয়।[৫]

মেটাফরও একধরনের সমান্তরতাকেই ইঙ্গিত করে। কারণ, "Analogies are created when at least two things appear to us to be conceptually parallel to one another"[৬]। মেটাফরের মাধ্যমে দুটি বিষয়ের মধ্যে বস্তুত সাদৃশ্য দেখানো হয়। যদিও বিষয় দুটির মধ্যে সবটুকু সাদৃশ্যের এলাকা নয়, অনেকখানি বৈসাদৃশ্যও থাকে, কিন্তু দুটি বিষয়ের ওই সাদৃশ্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলিই পারস্পরিক সমান্তরতা সৃষ্টি করে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত সহযোগে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হয়েছে সন্দর্ভের ষষ্ঠ অধ্যায়ে [দ্র. ৬.৩.৩]।

ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, শাব্দিক, আন্বয়িক প্রভৃতি স্তরের ভিত্তিতে নবনীতার কথাসাহিত্যে বিচ্যুতি ও সমান্তরতার বিন্যাস চিহ্নিত করাই বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

৫.২. পদ্ধতি

বর্তমান অধ্যায়ে *Exploring the Language of Poems, Plays and Prose* গ্রন্থে মাইক শর্ট (Mick Short) নির্দেশিত পদ্ধতি[৭] গ্রহণ করা হয়েছে। নিচে পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হল।

বিচ্যুতি

(ক) প্রাপ্ত বিচ্যুতিটি বাহ্যিক (ভাষার কোনও সার্বিক নিয়ম থেকে বিচ্যুতি) নাকি আভ্যন্তরীণ (পাঠের ভিতরেই তৈরি হওয়া কোনও ভাষিক প্যাটার্ন থেকে বিচ্যুতি)?

(খ) যদি বাহ্যিক বিচ্যুতি হয়, তবে ভাষার কোন্ নিয়মের বিচ্যুতি হয়েছে? কিংবা সংরূপগত নিয়মের বিচ্যুতি হলে, সেটিও হবে বাহ্যিক বিচ্যুতি। কারণ তা সংশ্লিষ্ট পাঠ নির্মাণের আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম এবং স্বাভাবিকভাবেই তা পাঠের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠেনি। তাই সেটি বাহ্যিক বিচ্যুতি।

(গ) নিম্নলিখিত কোন্ ভাষিক স্তরে বিচ্যুতি সংঘটিত হল –

ধ্বনিগত	শাব্দিক
লিপিতাত্ত্বিক	বাচনিক
ছন্দগত	শব্দার্থগত
রূপতাত্ত্বিক	প্রয়োগতাত্ত্বিক
আন্বয়িক	অন্যান্য

(ঘ) দেখতে হবে, একই স্থানে একাধিক বিচ্যুতি হয়েছে কিনা। যদি হয়, তবে সেইসব ক্ষেত্রেও ওপরের (ক) থেকে (গ) পর্যন্ত পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে বিশ্লেষণ করতে হবে। একাধিক বিচ্যুতি হলে অতিরিক্ত প্রমুখন বিশেষভাবে খেয়াল করতে হবে।

(ঙ) পাঠের কোনও নির্দিষ্ট অংশে বিচ্যুতি কি সাহিত্যবহির্ভূত কোনও অর্থের দ্যোতনা তৈরি করছে? যদি করে, তাহলে সম্পূর্ণ পাঠের সাপেক্ষে তার গুরুত্ব কতখানি, তা দেখতে হবে।

সমান্তরতা

(চ) দেখতে হবে, কোনোরকম সমান্তরতা তৈরি হয়েছে কিনা। যদি হয়, তবে (গ)-তে উল্লিখিত ভাষাস্তর অনুযায়ী তা ভাষার কোন্ স্তরে হয়েছে বুঝতে হবে।

(ছ) সমান্তরতার সূত্র (সমার্থ বা বিপরীতার্থ প্রকাশ পায় সমান্তর গঠনের অন্তর্গত উপাদানগুলির মধ্যে) প্রযোজ্য কিনা বুঝতে হবে।

প্রমুখন

(জ) প্রমুখিত অংশগুলি একত্রে সমগ্র পাঠের নিরিখে কী জাতীয় আবেদন সৃষ্টি করছে, তা লক্ষ্য করতে হবে। পাঠের অন্তর্গত যেসব বিচ্যুতি ও সমান্তরতার সার্থকতা আগে খুঁজে পাওয়া যায়নি, প্রমুখনের মাধ্যমে সেগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব কিনা দেখতে হবে।

(ঝ) যদি আরও কোনও নতুন ধরনের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তবে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত পদ্ধতির (গ)-তে উল্লিখিত তালিকাবদ্ধ ভাষিক স্তরগুলি ছাড়াও বর্তমান গবেষণায় আরও তিনটি ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ও সমান্তরতার উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলি হল পাঠক কিংবা চরিত্রের জ্ঞানের ছক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক রীতি এবং চরিত্রের মানসিক শক্তিস্তর। এই তিনটি ক্ষেত্রের বিচ্যুতি-সমান্তরতা দেখানো হয়েছে কারণ, এই জাতীয় বিচ্যুতি ও সমান্তরতাও শেষ পর্যন্ত লেখকের নির্বাচনের ফসল। আর নির্বাচন মানেই তা শৈলী। হতে পারে তা ভাষিক স্তরে সরাসরি নয়, তবু ভাষাব্যবহারের কলাকুশলতার দ্বারাই সাহিত্যে যেকোনো বিচ্যুতি কিংবা সমান্তরতাকে প্রকাশ করা হয়। এই প্রকাশের শৈলীকে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

৫.৩. বিশ্লেষণ ও আলোচনা

নবনীতা দেবসেনের অনেক গল্প ও উপন্যাসের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক বেছে নিয়ে সেইসব কাহিনিতে বিচ্যুতি, সমান্তরতা এবং প্রমুখন কতখানি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে, সেটিই ক্রমান্বয়ে বিশ্লেষণ করা হবে।

৫.৩.১. 'বামা-বোধিনী' উপন্যাসে বিচ্যুতি ও সমান্তরতার কার্যকারিতা

'বামা-বোধিনী' নামটি আসলে একটি আন্তর্বয়ান। এই নাম আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় উনিশ শতকের একটি উল্লেখযোগ্য মাসিক পত্রিকার কথা। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে উমেশচন্দ্র দত্ত মেয়েদের জন্য 'বামাবোধিনী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। নারীদের শিক্ষার প্রসার, নারী যাতে তার নিজের মর্যাদা ও অধিকার আদায়ের যোগ্য হতে পারে সে-বিষয়ে নারীর সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি নারীদের মনের কথা প্রকাশের একটা পরিসর তৈরি করাই ছিল এই পত্রিকার লক্ষ্য। অনুরূপ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে নবনীতা দেবসেনের 'বামা-বোধিনী' উপন্যাসটি।

গবেষণাধর্মী কাজ ও জীবনের নানা রক্তক্ষয়ী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অংশুমালা (এবং অংশুমালার হাত ধরে পাঠকও) অনুভব করেছে নারীদের চিরকালীন যন্ত্রণাপীড়িত অবস্থানকে। সেইসব নারীদের তালিকায় একদিকে যেমন আছেন রামায়ণের রাজমহিষী অথচ পরম দুঃখী নারী সীতা, ষোড়শ শতকের বাংলা রামায়ণকার চন্দ্রাবতী এবং দেবী সরস্বতী, তেমনি অন্যদিকে আছে বর্তমান সময়ের মালিনী, কমলাম্মা এবং অংশুমালা স্বয়ং। উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের বিচ্যুতি ও সমান্তরতা হয়ে উঠেছে এই প্রত্যেকটি নারীর নিজ নিজ অবস্থানকে প্রমুখিত করার অন্যতম প্রধান শৈলীগত হাতিয়ার। নিচে সেগুলির কয়েকটি বিশ্লেষণ করা হল।

৫.৩.১.১. অর্থতাত্ত্বিক বিচ্যুতি

> সূর্যের রক্তারক্তি চলছিল হুগলী নদীর বুকে।[৮]

অংশুমালা ও রবির পারস্পরিক নৈকট্য ও আবেগমথিত সম্পর্কের গাঢ়তাই প্রতীকায়িত হয়েছে ওপরের বাক্যটিতে। কিন্তু পরমুহূর্তেই রবি জানায় যে সে আর গোপনীয়তা বজায় রেখে অংশুমালার সাথে অভিনয় করতে পারছে না। আসলে সে একজন সমকামী পুরুষ। তাদেরই

বন্ধু সঞ্জুকে সে ভালবাসে। একথা শোনার পরেই অংশুর মধ্যে যে তীব্র মানসিক আলোড়ন শুরু হয়, তাকে প্রতীকায়িত করেছে নিচের বাক্যটি -

> পুরো হুগলী নদীটাই যেন ঘূর্ণিপাক খেয়ে সহসা এক বিপুল জলস্তম্ভের মতো খাড়া উঠে দাঁড়িয়েছিল অংশুর অতীত ভবিষ্যৎ গ্রাস করে; অংশুর সমগ্র নারীসত্তা ভেদ করে।[৯]

হুগলী নদীটাই এখানে অংশুমালার হৃদয়ের সমার্থক। রবির মুখ নিঃসৃত আকস্মিক, অকপট, কল্পনাতীত সত্যকে গ্রহণ করার মতো কোনও পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না অংশুমালার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমকামিতাকে এক ধরনের সামাজিক বিচ্যুতি ব'লে মনে করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। কিন্তু এই ধরনের সামাজিক বিচ্যুতি আসলে 'বিচ্যুতি' হিসেবে পরিগণিত হয় সমকামীদের সম্পর্কে অন্যদের বোধ (cognition) কী জাতীয় তার ভিত্তিতে। নবনীতা তাঁর সাহিত্যে সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামী বিষয়ে পাঠকের বোধকে কীভাবে চালনা করতে চেয়েছেন, তা সন্দর্ভের নবম অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে (দ্র. ৯.৩.৩)।

৫.৩.১.২. সম্মিলিতভাবে অর্থতাত্ত্বিক ও প্রয়োগতাত্ত্বিক সমান্তরতা

- তোমাকে ভীষণ মিস করছি মলয়।[১০]
- তোমাকে খুব মিস করছি।[১১]
- সবচেয়ে তোমার জন্যে মন কেমন করে কখন বলো তো?[১২]
- তোমাকে বাদ দিয়ে যেতে ইচ্ছে করে না।[১৩]
- এত কম চিঠি লেখো কেন?[১৪]

ওপরের প্রথম দুটি বাক্য একে অপরের সাথে অর্থতাত্ত্বিকভাবে সমান্তর। এই সমান্তরতাতেই পা মিলিয়েছে পরের তিনটি বাক্যের প্রয়োগতাত্ত্বিক সমান্তরতা। কারণ, প্রতিটি বাক্যের মধ্য দিয়েই প্রত্যক্ষ (অর্থতাত্ত্বিকভাবে) অথবা পরোক্ষভাবে (প্রয়োগতাত্ত্বিকভাবে) স্পষ্ট যে অংশুমালার বিদেশে কর্মরত অবস্থায় বারবার তার স্বামী মলয়কে নিজের পাশে পেতে ইচ্ছা করছে।

এই সমান্তর গঠন আসলে অংশুমালা ও মলয়ের দাম্পত্য সম্পর্কের পরিণাম নির্দেশক। উপন্যাসের প্রায় শেষে গিয়ে দেখা যায় মলয় অংশুমালার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাদের সম্পর্কের ছন্দপতন হয়। সেই বিশ্বাসঘাতকতা যে অংশুর কাছে কতখানি মর্মবিদারক হতে পারে, তা পাঠক অনুভব করতে পারেন উপন্যাসের প্রথম অংশের এই সমান্তরতার মাধ্যমে।

৫.৩.১.৩. সংরূপগত বিচ্যুতি

উপন্যাসে বারবার উপন্যাস সংরূপের প্রথাগত গঠনশৈলীর বিচ্যুতি দেখা গেছে।

- উপন্যাসের গদ্যরীতির ফাঁকে ফাঁকে ধরা দিয়েছে মধ্যযুগের পাঁচালি ঢঙের কিছু কবিতা। যেমন – 'কমলাম্মার কথা'[১৫], 'সীতার গর্ভলক্ষণ'[১৬] (এটি তেলেগু ও মারাঠি মেয়েলি গানের বাংলা অনুবাদ) এবং উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে অংশুর নিজের জীবনের সংকটময় অবস্থার বিবরণ দিয়ে তিনটি শিরোনামহীন পাঁচালী এবং সবশেষে 'অংশুমালার পালা'[১৭]।
- উপন্যাসের কাহিনির মাঝেই ৪র্থ পর্বে এসেছে ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত নয়ানচাঁদ ঘোষের 'চন্দ্রাবতী' পালার কাহিনিসংক্ষেপ[১৮]। 'চন্দ্রাবতী' পালার পংক্তিও সেখানে ব্যবহৃত হয়েছে।
- মাঝে মাঝেই দেখা দিয়েছে '[অংশুমালার খাতা]'[১৯], '[NOTES]'[২০] অংশ, যাকে আমরা একেবারে সরাসরি প্রবন্ধ-সংরূপের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলতে পারি।

উপন্যাসের মধ্যে এই যে বারবার উপন্যাস সংরূপের প্রথাগত গঠনশৈলীর বিচ্যুতি দেখা গেছে, এর দ্বারা দু'টি বিষয়ের প্রমুখন হয় –

প্রথমত, মানুষের জীবনের গতিধারা প্রতিনিয়ত বাঁক পরিবর্তনশীল। উপন্যাসের গঠনগত গতিধারার পরিবর্তন সেই বিষয়টিকেই ইঙ্গিত করে।

দ্বিতীয়ত, বিচ্যুতির অন্যতম লক্ষণ হিসেবে পয়ার ছন্দে মধ্যযুগীয় পাঁচালির ঢঙকেই বেছে নিয়েছেন নবনীতা। এর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে বলা যায় যে সমাজের সমস্ত স্তরের মেয়েদের পুরুষের দ্বারা মানসিক নিগ্রহের ইতিহাস কেবল অংশুমালা ও কমলাম্মার যুগের নয়, তা সেই সীতা ও চন্দ্রাবতীর যুগ থেকে চ'লে আসছে। যেহেতু মানসিক (কোথাও কোথাও শারীরিকও) পীড়নের ইতিহাস অতি প্রাচীন, তাই উপন্যাসের পাঠকের কাছে তাকে প্রকাশের মাধ্যমও হয়েছে প্রাচীন সাহিত্যশৈলী। ঢিমে লয়ের পাঁচালি গানের সুরেই যুগের পর যুগ ধরে থেকে গেছে নারীর দুঃখগাথা। সামাজিকভাবে এর কোনও প্রতিকার হয়নি। আজকের যুগও তার ব্যতিক্রম নয়। মালিনী, অংশুমালার মতো শিক্ষিত স্বনির্ভর মেয়েদেরকেও জীবনের নিকটতম পুরুষের দ্বারা প্রতারিত হতে হয়।

৫.৩.১.৪. ছকমূলক (schematic) বিচ্যুতি

স্বামী মলয় সম্পর্কে অংশুমালার এতদিনের জ্ঞানের বিচ্যুতি ঘটে -

> আশ্চর্য বাবা, মলয়কে বেশ মিশুকে বলেই জানতাম, হইচই গানবাজনা যেমন ভালবাসে, মানুষজনের সান্নিধ্যও তেমনই প্রিয়। এই নতুন একলসেঁড়ে রূপটি এতদিন দেখিনি।[২১]

অংশুমালার বাড়িতে যখন থেকে কমলাম্মা কাজ করতে শুরু করল, তখন থেকেই অংশুর স্বামী মলয় প্রতিনিয়ত অংশুর কাছে এব্যাপারে বিভিন্নভাবে আপত্তি জানাতে শুরু করল। অথচ মলয়ের স্বভাব এমন প্রকৃতির নয় ব'লেই অংশু এতদিন জানত। অংশুর পূর্বজ্ঞানের এই আকস্মিক বিচ্যুতির তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় উপন্যাসের শেষের দিকে। শিথিল চরিত্রের মলয় আসলে নিজেকে ভয় করত ব'লেই কমলাম্মাকে কাজে নিযুক্ত করা নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারেনি। অংশুর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কমলাম্মার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে স্ত্রী অংশুর সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।

৫.৩.১.৫. ধ্বনিগত বিচ্যুতি

কমলাম্মার উচ্চারণে 'সংস্কৃত' হয়েছে 'সংস্কুত্' এবং 'সংস্ক্রুত্' –

> জানি জানি, সংস্কুত্। ঠাকুর পুজোর, ব্রাহ্মণদের মন্ত্রের ভাষা তো? অন্ধ্রেও আছে, সংস্ক্রুত্।[২২]

ধ্বনিগত এই বিচ্যুতি শিক্ষার আলো না-পাওয়া কমলাম্মাকে চেনায়। উপন্যাসের কাহিনির সাপেক্ষে এই বিচ্যুতি গুরুত্বপূর্ণ। তথাকথিত শিক্ষিত পুরুষের লালসার শিকার হতে হয়েছে কমলাম্মার মতো তথাকথিত অশিক্ষিত নারীকে।

৫.৩.১.৬. ছকমূলক (schematic) বিচ্যুতি

তেলেগু মেয়েদের পাঁচালি গানে রামায়ণের সীতা আসলে ওই ঘরোয়া মেয়েদের রূপকমাত্র। সীতার দুঃখের কাহিনি কার্যত এই সমাজের শাশুড়িতর্জিত, ননদীভীত অসহায় স্ত্রীলোকের নিত্যদিনের জীবনকাহিনি। 'সীতার গর্ভলক্ষণ' শীর্ষক গানে দেখা যায় গর্ভাবস্থায় সীতার নানা সুখাদ্য ভক্ষণের সাধ হ'লে, তার শাশুড়ি কৌশল্যা বলেন –

> রাম-লক্ষ্মণের জন্ম দিয়েছি তো আমি
> শুনিনি দেখিনি কভু এহেন ন্যাকামি[২৩]

সীতার গর্ভলক্ষণ বর্ণনা ও কৌশল্যার এই জাতীয় মন্তব্য – কোনওটাই ধ্রুপদী সংস্কৃত মহাকাব্যে কল্পনীয় নয়। এখানে তাই জ্ঞানের কাঠামোগত বিচ্যুতি চোখে পড়ে। এই বিচ্যুতি সীতার অবস্থানের পাশাপাশি ভারতবর্ষীয় সমাজে কমবেশি প্রতিটি নারীর সাংসারিক অবস্থানকে প্রমুখিত করছে।

৫.৩.১.৭. ছকমূলক সমান্তরতা

তেলেগু মেয়েদের রচিত রামায়ণী গানের বিপুল ভাণ্ডার সম্পর্কে জানতে পারার পর অংশুর মনে প'ড়ে যায় চারশো বছর আগের বাংলা রামায়ণ রচনাকার চন্দ্রাবতীর কথা। দুই ভিন্ন

প্রদেশের নারীর কলমে ধরা দিয়েছে রামায়ণ গান এবং উভয় ক্ষেত্রেই রামায়ণের কাহিনি বিধৃত হয়েছে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে। উঠে এসেছে নারীর শিক্ষিত, স্বাধীনতাকামী অথচ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক অবদমিত মূর্তি। দুই প্রদেশের রামায়ণী গানের মধ্যে এই যে মিলের জায়গাটুকু, সেটিই অংশুর জ্ঞানের কাঠামোগত সমান্তরতা সৃষ্টি করেছে। শুধু রামায়ণের সীতাই নয়, ওই একই সমান্তরতায় সামিল হয়েছে শিক্ষিত বিদগ্ধ চন্দ্রাবতীর ব্যক্তিগত সুখে বঞ্চিত জীবন। এই সমান্তরতাতেই এসে শেষ পর্যন্ত যুক্ত হয়েছে গবেষক অংশুমালার প্রেমিক-সুখে, স্বামীসুখে বঞ্চিত জীবন। সেই সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছে অংশুর বন্ধুস্থানীয় মালিনীর জীবন। উচ্চশিক্ষিতা, উচ্চপদে কর্মরত মালিনীর স্বামী একজন সমকামী পুরুষ হওয়ায় তারও শেষ পর্যন্ত স্বামীসুখ স্থায়ী হয়নি। আবার এই সমান্তরতার সারিতেই দেখা গেছে অংশুর বাড়ির কাজের মেয়ে কমলাম্মাকে, এমনকি বাগ্‌দেবী বীণাবাদিনী দেবী সরস্বতীকেও। কমলাম্মা প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না-হলেও মার্জিত রুচিসম্পন্ন, স্বনির্ভর, কর্মদক্ষ, আত্মবিশ্বাসী একজন নারী। কিন্তু সেও শেষ পর্যন্ত তথাকথিত শিক্ষিত পুরুষের (অংশুর স্বামী) উন্মত্ত লালসার শিকার হয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে ঘিরে যে পরিচিত পৌরাণিক কাহিনি রয়েছে, সেটিও অংশুমালার জ্ঞানের ছক (schema)-এ ওই একই সমান্তরতায় যুক্ত হয়। সরস্বতী ব্রহ্মার মানসকন্যা হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মা বিনা বিবেচনায় তাঁর প্রতি কামাসক্ত হয়েছিলেন।

সরস্বতী, সীতা, চন্দ্রাবতী, কমলাম্মা, মালিনী, অংশুমালা – সবাই এক সারিতে সমান্তরিত। সুতরাং, প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে যে সাধারণ বিষয়টি প্রমুখিত হচ্ছে তা হল –

স্বাধীন, শিক্ষিতমনস্ক নারী দেশ-কাল নির্বিশেষে পুরুষের চরম অমানবিকতার বলি হয়েও শেষ পর্যন্ত নিজের পছন্দ মতো একটা জীবন বেছে নিতে পেরেছে। সেই নতুন জীবন নারীর একলা থাকার জীবন, নিজ-নিজ দক্ষতার পরিসরে অভিনিবিষ্ট জীবন, নিজ কর্ম সাধন ও

সাধনার জীবন। সেই জীবনে কোনও পুরুষের অস্তিত্বের আর প্রয়োজন নেই। এই জাতীয় প্রমুখনের পরিণামেই ধরা দিয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারী অবদমনের অলিখিত সিস্টেমের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদী প্রতিমূর্তি।

৫.৩.২. 'শনি-রবি' উপন্যাসে বিচ্যুতি-সমান্তরতার কার্যকারিতা

'শনি-রবি' একটি পারিবারিক উপন্যাস। শনি এবং রবি এই দুদিনের কাহিনি। পারিবারিক একটি অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য ক'রে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে থাকা পরিবারের সকল সদস্য একত্রিত হয়েছে। এরই মাঝে মাঝে এসেছে সুখ-দুঃখের নানা মুহূর্ত। যেসব বিচ্যুতি, সমান্তরতা এবং প্রমুখন উপন্যাসের কাহিনির সাপেক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সেগুলি ক্রমান্বয়ে তুলে ধরা হল।

৫.৩.২.১. চিরাচরিত চিত্রকল্প (Conventional Image)-এর বিচ্যুতি

মাতৃত্বের চিরাচরিত চিত্রকল্পের বিচ্যুতি দেখা যায় 'শনি-রবি' উপন্যাসের প্রভাবতী চরিত্রে। গোটা উপন্যাসে এই বিচ্যুতি বারবার ফিরে ফিরে এসেছে। প্রভাবতী যে তাঁর সব সন্তানের প্রতি সমমনোভাবাপন্ন নন, তা তাঁর বিভিন্ন সময়ের আচরণে স্পষ্ট। কখনো আবার তাঁর সন্তানদের কথা থেকেই বোঝা যায় যে প্রভাবতীর নির্দয় উপেক্ষা তাদের কতখানি মনোকষ্টের কারণ। যেমন–

ক) প্রভাবতীর সেজ ছেলে সোমশংকরকে তার বড়মা যখন বলেন যে সে উৎসবে যোগদান না-করলে প্রভাবতীর খারাপ লাগবে, তখন সোমশংকর বলে –

> মা? মা'র আবার কেমন লাগবে? মা টেরই পাবেন না আমি এসেছি কি আসিনি[২৪]

খ) প্রভাবতী তাঁর অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ছেলেমেয়েদের সাহচর্যে থাকেন না। ধনী ছেলেমেয়েদেরকে নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট, তাদের কাছে থাকতেই তিনি ভালোবাসেন। এই প্রসঙ্গে প্রভাবতীর নাতি সুমনের মন্তব্য –

> জীবজন্তুদের নিয়মই এই। উইক অফস্প্রিংগুলোকে মা পরিত্যাগ করে। শি হ্যাজ জাস্ট বিন ফলোয়িং হার প্রাইমাল ইনস্টিংক্টস।[২৫]

সুতরাং, মাতৃত্বের মানবোচিত প্রতিমা থেকে বিচ্যুতি হচ্ছে।

গ) প্রভাবতীর মেয়ে পদ্মাবতী তার মেয়েকে বলেছে –

> "... তোমার দিদিমা যদি আমাকে আমার নিজের জায়গাটা দিত, তা হলে তো কথাই ছিল না। চিরটাকাল তোর বাবাকে সকলের সামনে অপমান করে গেল! ..." পদ্মা ফুঁপিয়ে উঠল – "মা, না ডাইনি! শুধু টাকা বোঝে, টাকা![২৬]

ঘ) পদ্মাবতী নিজের ছেলে সূর্যের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার জন্যও মা প্রভাবতীকেই দায়ী করে –

> আমার মা আমার যে ক্ষতি করেছে - ... আমার নির্দোষ ছেলেটাকে – পেছনে লেগে লেগে –[২৭]

সূর্য তার মায়ের কঙ্কন নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মতো চ'লে গেলে, পদ্মার হৃৎপিণ্ডে শলাকা বিঁধিয়ে তার মা প্রভাবতী বলেন –

> দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। দেখোগে যাও সে কোন জেলে ঢুকে বসে আছে।[২৮]

ঙ) প্রভাবতী সংসারের দায়িত্ব পদ্মর হাতে দিতে চাননি। পদ্মর গর্ভধারিণী মা হয়েও মেয়েকে আঘাত করতে তিনি দু'বার ভাবেন না। তাঁর যুক্তি –

> এমন জামাই ঘরে আনলেন উনি, সে ইচ্ছে করে যুদ্ধে গিয়ে নিষ্কম্মা হয়ে এল, যাতে বসে খেতে পারে। তাতে করে অবিশ্যি ছেলে-মেয়ে পয়দা করতে অসুবিধে নেই। মুকে আগুন নির্লজ্জ বেহায়া পদ্মর! এবার সংসারটা ওকেই ছেড়ে দিতে বলছ মেজবউমা?[২৯]

জামাইকে পরজীবী, অনাকাঙ্ক্ষিত, প্রায় ভিখারির পর্যায়ে নির্বাসিত করেছিলেন প্রভাবতী। জামাই তুষার শেষ পর্যন্ত আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

চ) মাতৃত্বের চিরবন্দিত ইমেজকে সমূলে উৎপাটন ক'রে দিয়ে প্রভাবতী নিজের মেয়েকে বলেন,

> তোর ছেলে তো তোকে কোনওদিন এমন করে ডাকবে না, কোথায় কোন জেলে পচছে সে এখন, কে জানে? তাই আমার ছেলেদের উন্নতি তোর সহ্য হয় না। আমার ছেলে আমাকে আদর করে ডাকলে তোর হিংসেয় গা জ্বলে যায় কেন তা কি আমি বুঝি নে ভেবেছিস?[৩০]

ছ) যখন সদ্য সদ্য প্রভাবতীর একটি নাতনি মারা গেল, একটি নাতি সদ্য নিখোঁজ হয়ে গেছে, জামাই রেলে কাটা পড়েছে (যা প্রকৃতপক্ষে আত্মহনন), মেয়ে শোকে পাগল হয়ে গেছে, বাড়িতে আরও দুটো ছোট ছোট নাতিনাতনি রয়েছে; তখন তিনি বড় জায়ের ওপর অস্থির সংসারের সমস্ত দায় চাপিয়ে নিজে চ'লে গিয়েছিলেন নির্ঝঞ্ঝাট মেজ ছেলের সংসারে।

সুতরাং, সন্তানসন্ততির প্রতি মায়ের স্নেহপূর্ণ মমতাময়ী যে ছবি দেখতে পাঠক চিরাভ্যস্ত, উপন্যাসে বারবার মাতৃত্বের সেই প্রথাগত চিত্রকল্পের বিচ্যুতি দেখা যায়। এই বিচ্যুতির পুনরাবৃত্তি আসলে প্রভাবতীর মতো আত্মসুখসন্ধানী মায়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রমুখন করেছে।

৫.৩.২.২. প্রয়োগতাত্ত্বিক (Pragmatic) সমান্তরতা ও আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি (Internal Deviation)

উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র সরমা যে কতখানি সদা-তৃপ্ত মনোভাবাপন্ন একজন মা, নিচের বাক্যগুলিতে তারই একটি আভ্যন্তরীণ প্যাটার্ন তৈরি করা হয়েছে –

- মান-অভিমান প্রকাশ করা সরমার স্বভাব নয়।[৩১]
- সবকিছুর ভাল দিকটা খুঁজে দেখার অভ্যেস করেছেন আবাল্যকাল।[৩২]
- তবু তো দিল্লিতে নেমেই ফোন করেছে, আসতে যে পারছে না সেটা অন্তত ফোন করে জানিয়ে দিয়েছে।[৩৩]
- আমরা তো ভারতবর্ষে থেকেও কখনও তাজমহল দেখার সুযোগ পাইনি ... দীপুর আমেরিকান বউ-বাচ্চাদের কাছে তো তাজমহলের দাম অনেক বেশি হবারই কথা।[৩৪]
- ওকে ওরা বলেছে সঙ্গে নিয়ে যেতে, তাজমহল দেখিয়ে দিতে, মণি আর 'না' বলে কেমন করে?[৩৫]
- দিল্লি আর দুবাই তো টেলিফোনে একই সরমার কাছে।[৩৬]

এই ছাঁচ বা প্যাটার্নটি প্রয়োগতাত্ত্বিক সমান্তরতা তৈরি করেছে। কারণ, প্যাটার্নের অন্তর্গত ছ'টি বাক্যেরই একটি সাধারণ লুক্কায়িত বিশেষ অর্থ আছে। প্রতিটি বাক্যের আক্ষরিক অর্থের সীমা পেরিয়ে বারবার স্পষ্ট হয় যে সরমা যেকোনো অপ্রিয় পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন, ভালো না-লাগলেও অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে চান।

কিন্তু এবার দেখা যায়, নির্মিত প্যাটার্ন থেকে আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি –

> কলকাতায় আসতে বিবির অরুচি। সরমার বুকের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় হু হু করে বাতাস বয়ে যায়। একটা সন্তান, জন্মের শোধ চোখের দেখার বাইরে। শত সাধ হলেও দৌড়ে গিয়ে একবার মুখখানা দেখে আসা যাবে না।[৩৭]

এভাবে সরমার স্বভাবসুলভ সদাতৃপ্ত মনভঙ্গির বিচ্যুতি আসলে সন্তানের প্রতি তাঁর স্নেহের টানকেই প্রমুখিত করে। এই প্রসঙ্গে ভাষাবিদ Elena Semino-র বক্তব্য স্মরণযোগ্য,

> While, as Leech and Short (1981) have shown, mind styles can be seen to vary on a scale from "normality" to "deviance", the notion is most useful where narratives involve the foregrounding of linguistic patterns that suggest some salient cognitive habit or deficit.[৩৮]

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সরমা সম্পর্কে প্রথমে যে প্রয়োগতাত্ত্বিক সমান্তরতা দেখা গিয়েছে, তা সরমার "cognitive habit"-কে স্পষ্ট করে। আর ওটাই সরমার "normality"। আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি আসলে সরমার মনোশৈলীর বিচ্যুতিকে নির্দেশ করে। আবার, প্রভাবতীর ক্ষেত্রে বারবার মাতৃত্বের প্রথাগত চিত্রকল্পের বিচ্যুতি আসলে প্রভাবতীর মনোশৈলীকে প্রকাশ করে (দ্র. ৫.৩.২.১)।

এভাবেই উপন্যাসে সরমা এবং প্রভাবতী দুই ভিন্ন প্রকার মায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। একই উপন্যাসে তৈরি হয় দুই মায়ের ভিন্ন প্রকার মনোশৈলী তথা মাতৃত্ববোধের সন্নিধি (juxtaposition), যা তাঁদের চরিত্রায়ণের কৌশলে পরিণত হয়।

৫.৩.৩. 'এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট' গল্পে বিচ্যুতি-সমান্তরতার কার্যকারিতা

'এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট' গল্পের মাধ্যমে যে বার্তা উঠে আসে, তা অনেকটা এইরকম – প্রবাসী বাঙালিরা যখন দিন কয়েকের জন্য দেশে ফেরেন, তখন তাঁদের আত্মীয়-পরিজনেরা আতিথেয়তার নামে এক প্রকার অত্যাচার শুরু করেন। অত্যাচার হয় প্রধাণত দু'ভাবে – প্রত্যেক দিন, প্রত্যেক বেলায় নানা প্রকার বিদেশী খাদ্য ও পানীয় হাজির ক'রে এবং নানাভাবে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের চেষ্টা ক'রে।

৫.৩.৩.১. রূপতাত্ত্বিক সমান্তরতার দ্বারা বিচ্যুতি প্রতিষ্ঠা

গল্পের শুরুতেই দেখা যাচ্ছে, কথক বিদেশ থেকে অনেকদিন পর দেশে ফিরেছেন এবং তাঁকে তাঁর আত্মীয়দের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বেড়াতে হচ্ছে। আমরা এই অংশটি প্রথমে দেখে নেব –

> বিদেশে থাকতে টেলিভিশনে দেখতুম ভারতবর্ষে বন্যা হচ্ছে, দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, কিন্তু সশরীরে এসে তো দেখছি উলটো! কে বলে এ দেশে দারিদ্র্য আছে? আজ লাঞ্চ, কাল ডিনার, পরশু ককটেল, আজ এই ক্লাবে খাওয়ানো, কাল সেই ক্লাবে খাওয়ানো – একেবারে সাহেবী ব্যাপারস্যাপার।[৩৯]

আমরা প্রথমে লক্ষ করব উদ্ধৃত শেষ বাক্যটিতে রূপতাত্ত্বিক সমান্তরতা। কীভাবে সমান্তরতা তৈরি হচ্ছে দেখা যাক (দ্র. সারণি ১২) –

কালবাচক বিশেষ্য	নির্দেশক	মুখ্য কর্ম	বিলোপিত স্থিতিক্রিয়া
আজ	-	লাঞ্চ	হবে (বিলোপিত)
কাল	-	ডিনার	হবে (বিলোপিত)
পরশু	-	ককটেল	হবে (বিলোপিত)
আজ	এই	ক্লাবে খাওয়ানো	হবে (বিলোপিত)
কাল	সেই	ক্লাবে খাওয়ানো	হবে (বিলোপিত)

সারণি ১২: রূপতাত্ত্বিক সমান্তরতা

এই সমান্তরতা দু'ভাবে প্রভাব বিস্তার করছে –

প্রথমত, 'একেবারে সাহেবী ব্যাপারস্যাপার' – এই অংশটির প্রমুখন হচ্ছে। কারণ, পাঁচটি মুখ্যকর্মই পৃথকভাবে সাহেবী ব্যাপারস্যাপারকে নির্দেশ করে।

দ্বিতীয়ত, এই রূপতাত্ত্বিক সমান্তরতা আসলে উদ্ধৃত অংশের প্রথম বাক্যে বক্তার জ্ঞানের ছকমূলক বিচ্যুতি (schematic deviation)-কে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বিষয়টি আরেকটু বিশদে বলা প্রয়োজন। প্রথম বাক্যে বক্তা বলছেন যে তিনি এতদিন জানতেন যে ভারতবর্ষের মানুষ দুর্ভিক্ষ আর বন্যায় জর্জরিত। সুতরাং ভারতবাসীর খাদ্যতালিকায় যে কোনো সাহেবীয়ানার ছোঁয়া থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেশে ফিরে বক্তার অভিজ্ঞতা একেবারে উলটো। এই উলটো অভিজ্ঞতাগুলিই উদ্ধৃতাংশের শেষ বাক্যের রূপতাত্ত্বিক সমান্তরতার মাধ্যমে প্রকাশিত। ফলে বক্তার জ্ঞানের কাঠামো দেশে আসার আগে যেমন ছিল, তার বিচ্যুতি হয়।

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এভাবে নবনীতা আসলে দারিদ্র্য পীড়িত ভারতবর্ষের স্বার্থান্বেষী, আত্মসুখী, ভোগী শ্রেণির নির্মম মানসিকতাকে তুলে ধরেন।

৫.৩.৪. 'জগমোহনবাবুর জগৎ' গল্পে সমান্তরতার কার্যকারিতা

গল্পটি আগাগোড়া হাস্যরসাত্মক। তাই হাস্যরস সৃষ্টির অভিপ্রায়ে লেখিকা যে জাতীয় সমান্তরতার সাহায্য নিয়েছেন, তা নিচে বিশ্লেষণ করা হল।

৫.৩.৪.১. ধ্বনিগত সমান্তরতা

কথক তার কাকার বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখেন সেখানে এক মস্ত জটলা। সেই জটলায় কারা সামিল হয়েছে, তারই বিবরণ উঠে এসেছে নিম্নরূপে –

> আফটারনুনে রিটায়ার্ড রিকশাওয়ালা, বাকশো হাতে নাপিত, চাবির গুচ্ছ হাতে চাবিওলা, ছোট খুকির হাত ধরে বিস্ফারিত নেত্র অন্ধ ভিক্ষেওলা এবং অগুন্তি ঝাড়া হাত-পা ভিড় করনেওলা – রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই দুপুর রোদে ঊর্ধ্বমুখী তপস্যা করছে।[৪০]

এবার এক এক ক'রে দেখব কীভাবে ধ্বনিগত সমান্তরতা অর্থাৎ অনুপ্রাস ধরা দিয়েছে।

- 'আফটারনুনে রিটায়ার্ড রিকশাওয়ালা' → তিনটি শব্দে /r/ ৪ বার, মূর্ধা ধ্বনি (/ʈ/ এবং /ɖ/) ৩ বার এবং /a/ ধ্বনি ৭ বার আছে।
- 'বাকশো হাতে নাপিত' → /k/ এবং /ʃ/ ধ্বনির ক্রম আগের 'রিকশাওয়ালা' শব্দের /k/ এবং /ʃ/ ধ্বনির ক্রমের সমান। এছাড়া /t/ ধ্বনি ২ বার ব্যবহৃত।
- 'চাবির গুচ্ছ হাতে চাবিওলা' → তালব্য ধ্বনি (/ʧ/ এবং /ʧʰ/) আছে ৪ বার। /a/ ধ্বনি আছে ৪ বার। এছাড়া 'চাবিওলা'-র 'ওলা' অংশটি 'রিকশাওয়ালা'-র সাদৃশ্যে ফিরে এসেছে।
- 'ছোট খুকির হাত ধরে বিস্ফারিত নেত্র অন্ধ ভিক্ষেওলা' → /r/ ধ্বনি ৪ বার। দন্ত্যধ্বনি (/t/, /n/ এবং /dʱ/) ৭ বার। এছাড়া 'ভিখারী' না-বলে 'ভিক্ষেওলা' বলা হয়েছে। এটি শাব্দিক বিচ্যুতি (lexical deviation)। আগের অংশের 'রিকশাওয়ালা' ও 'চাবিওলা'-র অন্তর্গত বদ্ধরূপ 'ওয়ালা' বা 'ওলা'-র সঙ্গে রূপতাত্ত্বিক সমান্তরতা স্থাপন করেছে 'ভিক্ষেওলা' শব্দের অন্তর্গত বদ্ধরূপ 'ওলা' এবং সেইসঙ্গে অবশ্যই ধ্বনিতাত্ত্বিক সমান্তরতাও স্থাপিত হয়েছে।
- 'অগুন্তি ঝাড়া হাত-পা ভিড় করনেওলা' → /h/ ধ্বনি এসেছে ৩ বার (/ʤ͡ / + /h/ = /ʤ͡ʱ/; h, এবং /b/ + /h/ = /bʱ/)। /ɽ/ ধ্বনি ২ বার। আবারও আগের অংশের 'রিকশাওয়ালা', 'চাবিওলা' ও 'ভিক্ষেওলা'-র অন্তর্গত বদ্ধরূপ 'ওয়ালা' বা 'ওলা'-র সঙ্গে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক সমান্তরতা স্থাপন করেছে 'করনেওলা' শব্দের অন্তর্গত 'ওলা'।

উদ্ধৃত অংশের ধ্বনিতাত্ত্বিক সমান্তরতার আধিক্য কার্যত একটা জটলায় সমপরিমাণ কৌতূহলসম্পন্ন মানুষের একত্র সমাগমকে ইঙ্গিত করে।

৫.৩.৫. 'জীবে দয়া' গল্পে সমান্তরতার কার্যকারিতা

মাদার টেরেসা নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পর কলকাতা শহরে জীবে দয়ার রমরমা পড়ে যায়। তবে মাদার টেরেসা যেমন সেবাপরায়ণ, গল্পে বর্ণিত 'জীবে দয়া'র নমুনাগুলি ঠিক সেই অর্থে সেবাপরায়ণ মানসিকতার প্রকাশক নয়। 'জীবে দয়া' কথাটি তাই এই গল্পে শ্লেষাত্মক।

৫.৩.৫.১. প্রয়োগতাত্ত্বিক সমান্তরতা

প্রসঙ্গের (context) ভিত্তিতে যখন সমান্তরতা তৈরি হয়, তখন তাকে বলে প্রয়োগতাত্ত্বিক সমান্তরতা। দেখা যাক 'জীবে দয়া' গল্পে কীভাবে এই ধরনের সমান্তরতা ধরা দিয়েছে –

- আমাদের এক প্রতিবেশী সেদিন দেখলুম একজন ভিখিরিকে ডেকে এনে ছেঁড়া লুঙ্গি দিচ্ছেন।[৪১]
- সেজপিসেমশাই একজোড়া আস্ত স্যাণ্ডেল চটি দিয়ে দিলেন রিকশাওয়ালাকে (গত বছর এক বেচারী চোর ও-বাড়িতে চুরি করতে ঢুকে চটি জোড়া ফেলে পালিয়েছিল)।[৪২]
- লতুবৌদি এক খাঁচা বদ্রীপাখি কিনে দিলেন ছেলেকে। - "... পাখিদের যত্ন করতে করতে যদি জীবে দয়া শেখে।"[৪৩]

ওপরের তিনটি ক্ষেত্রেই প্রসঙ্গ একই; জীবে দয়ার নামে মানুষের অন্তঃসারশূন্যতাই ফুটে ওঠে। প্রায় একই প্রসঙ্গে আংশিকভাবে সমান্তরিত (প্রয়োগতাত্ত্বিক) হয়েছে আরও দুটি বাক্য, যেগুলির মধ্যে প্রথমটি মা তাঁর মেয়েদেরকে বলছেন এবং দ্বিতীয়টি দিদিমা অন্যদেরকে বলছেন –

- তোমাদের যত এনার্জি সব জীবজন্তুর বেলায় – আমি কিছু বললে হাত পা নড়ে না – [৪৪]
- আমি তো একটা বুড়ো মানুষ, আমার প্রতি কি তোদের দয়ামায়া হয় না রে?[৪৫]

এই দুই প্রয়োগতাত্ত্বিক সমান্তর বাক্য থেকে স্পষ্ট যে যেখানে মমতাশীল হওয়া বেশি প্রয়োজন, আমরা অনেক সময় তাকে অবহেলা করি।

ওপরের সমান্তরতা 'জীবে দয়া' শব্দবন্ধের শ্লেষাত্মক ব্যবহারের প্রমুখন করে।

৫.৩.৬. 'হাওয়া-ই-হিন্দ' গল্পে বিচ্যুতির কার্যকারিতা

লেখিকা স্বয়ং 'হাওয়া-ই-হিন্দ' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র। বিমানে যাতায়াতের পথে তাঁর বাক্স হারিয়ে যায়। সেই বাক্স খুঁজে পাওয়ার জন্য কতরকম ঝক্কি-ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তারই গল্প 'হাওয়া-ই-হিন্দ'।

৫.৩.৬.১. বাচনিক (Discoursal) বিচ্যুতি

সাধারণত বাচনিক পরিস্থিতি হয় নিম্নরূপ (দ্র. চিত্র ১২) –

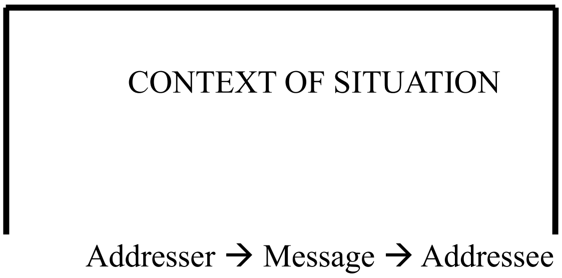

চিত্র ১২: বাচনিক পরিস্থিতি[৪৬]

একটা নির্দিষ্ট প্রসঙ্গ (context) থাকে। সেই প্রসঙ্গে বক্তা শ্রোতাকে কিছু বলেন। এটাই সাধারণ বাচন রীতি। 'হাওয়া-ই-হিন্দ' গল্পে এই প্রচলিত বাচনিক পরিস্থিতির বিচ্যুতি দেখা যায়। শুরুতে শুরু না-হয়ে গল্পটি হঠাৎ মাঝখান থেকে শুরু হয়েছে। গল্প শুরু হয় একটি সংলাপ দিয়ে –

“বার বার অত যাওয়াই বা কেন, বারবার বাক্সপ্যাঁটরাগুলো খোয়ানোই বা কেন? একেবারে কলকাতা থেকে না বেরুলেই তো সবদিক রক্ষে হয়।”

এতবড়ো দুঃসংবাদটা শুনে স্বয়ং মামণি এহেন অকরুণ মন্তব্য করলেন তখন চোখের জল বাঁধ মানতে চাইল না।[৪৭]

কোনও প্রসঙ্গ ছাড়াই সরাসরি বক্তব্য দিয়ে গল্প শুরু হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে আরও লক্ষ করব যে গল্পটি শেষ হচ্ছে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে –

ব্যাঙ্গালোরে নেমেই ব্যাগসুদ্ধ চুরি হয়ে গেল। ... রুনুদি যখন ব্যাঙ্গালোরের গল্পটা শুনবে, কী বলবে কে জানে? আর মামণিই বা বলবেন কী?[৪৮]

গল্পের এই জাতীয় সমাপ্তির ফলে পুরো গল্পটি একটি বৃত্তাকার কাঠামো নিচ্ছে। যে জাতীয় ঘটনা দিয়ে গল্পের সূচনা হয়েছিল, সেই জাতীয় ঘটনাতেই গল্পটি শেষ হয়েছে। গল্পের এই বৃত্তাকার কাঠামো কার্যত গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রের ভাগ্যবিড়ম্বনার পুনরাবৃত্তির দ্যোতক।

৫.৩.৭. ‘আমি অনুপম’ উপন্যাসে বিচ্যুতির কার্যকারিতা

রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সাংবাদিক ও অধ্যাপক অনুপম রায় ‘আমি অনুপম’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। ‘ডেইলি নিউজ’ সংবাদপত্রের ‘রয়’জ কর্নার’-কে হাতিয়ার ক’রে তিনি নিয়মিত দেশ তথা বিশ্ব-রাজনীতির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লেখেন। রেডিওতেও তাঁর মতো একজন দক্ষ পলিটিক্যাল কমেন্টেটরের আছে গুণমুগ্ধ শ্রোতাসমাজ। বাগ্মী অনুপমের দেশজোড়া এই খ্যাতি এনে দিয়েছে তাঁর জ্ঞান ও মেধা। এরই পাশাপাশি তাঁকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবেগ উন্মাদনা অধ্যাপক অনুপমের খানিক আত্মগৌরব বৃদ্ধি করে বৈকি! আর অন্যদিকে একের পর এক নারীসঙ্গ মধ্যবয়স্ক অনুপমের অবিবাহিত কর্মব্যস্ত জীবনে বিনোদনের রসদ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এই সবকিছুকে প্রেক্ষাপটে রেখে অনুপম রায়ের মনের গহন প্রদেশে বিচরণ করাই এই উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য।

৫.৩.৭.১. অর্থতাত্ত্বিক বিচ্যুতি

গোটা উপন্যাস জুড়ে বহুবার বিভিন্নভাবে অনুপমের স্বরভঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়। তাঁর গলা ভেঙে গিয়ে ঠিক ক'রে কথা বলতে না-পারার সমস্যার কথা উপন্যাসে এতবার উঠে এসেছে যে এই পুনরাবৃত্ত ব্যবহার আর কেবলমাত্র স্বরভঙ্গের আক্ষরিক অর্থকে চিহ্নিত করে না। যখন অনুপম দৃঢ়তার সাথে সংকল্প করেন, "এভাবে চলে না। স্বর ফেরত চাই"[৪৯], তার আগে থেকেই পাঠক দেখতে থাকেন যে অনুপম খুবই অস্বস্তিতে আছেন। তার বিভিন্ন কাজে ভুল হচ্ছে, 'রয়'জ কর্নারে' নিয়মিত তাঁর যে লেখা বেরোয় সেই লেখা নিজস্ব দৃপ্ত প্রতিস্পর্ধী স্বর এখন হারিয়ে ফেলছে, আগে নিজের স্বভাবগত অশালীন ইচ্ছাগুলোকে খুব সহজেই নিজের বশে রাখতে পারতেন কিন্তু এখন অন্যের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ইচ্ছাকে দমন করতে একটু যেন অসুবিধা হয়, সময়ের হিসাব থাকে না। সব মিলিয়ে অধ্যাপক অনুপম রায়ের যে নিজস্ব স্বর, তা বেশ ভালোরকম ক্ষতিগ্রস্ত। প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি এখানে 'গলা ভেঙে যাওয়া'র অর্থতাত্ত্বিক বিচ্যুতি ঘটিয়েছে। এই অর্থতাত্ত্বিক বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে উপন্যাসের মূল সুর ধরা পড়েছে। নকশাল আন্দোলনের কালপর্বে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদেরকে প্রাথমিকভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার অনুপ্রেরণা দিলেও অনুপমের মতো অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী আর তাদেরকে সহযোগিতা করেননি। বরং পরিপার্শ্বের চাপের প্রভাবে প'ড়ে এক প্রকার অসহযোগিতা করেছেন, যাতে তারা ধরা পড়ে যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে ওই কালপর্বে অনুপমের মতো বুদ্ধিজীবীদের নিজস্ব প্রতিবাদী প্রতিরোধী দৃঢ় কণ্ঠস্বরের ভাঙন ধরেছিল। পাঠকের কাছে 'স্বরভঙ্গে'র অর্থতাত্ত্বিক বিচ্যুতির মাধ্যমে আসলে অনুপম চরিত্রের ব্যক্তিত্বের ভাঙন বা অবনমনের বিষয়টিকে প্রমুখিত করা হয়েছে।

৫.৩.৮. 'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পে বিচ্যুতির কার্যকারিতা

'ভালোবাসা কারে কয়' গল্পে দেখা যায়, লেখিকা একটি পত্রিকা সম্পাদকের অনুরোধে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রেমের বিবর্তন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে চাইছেন। সেজন্য তিনি তাঁর মেয়ের বিভিন্ন বন্ধুদের ধ'রে ধ'রে জানতে চাইছেন যে তারা প্রেম সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে।

৫.৩.৮.১. ধ্বনিগত এবং লিপিগত বিচ্যুতি

গল্পে দেখা যায়, লেখিকা প্রেম বিষয়ে কে কী মনে করে, তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার অভিপ্রায়ে তাঁর বড় মেয়ে পিকোর বন্ধু টুবলু বাড়িতে এলেই অকস্মাৎ তিনি প্রশ্ন করেন, "তা টুবলু, তুই প্রেম নিয়ে ইদানীং কী ভাবছিস?"[৫০] বেচারা টুবলু ভেবেছে লেখিকা বোধহয় সন্দেহ করছেন যে টুবলুই তাঁর মেয়ের প্রেমিক। সে রীতিমতো ঘাবড়ে যায় –

> গলা ঝেড়ে নিয়ে টুবলু বললো - "আমি ঠিক পিকোর কাছে, সেভাবে...কোনোদিনই...মানে আপনি হয়তো ঠিক জানেন না আমাদের মধ্যে কিন্তু ঐসব, মানে একটুও কিন্তু...ক্ষীইই আশ্চর্য!"[৫১]

'কী আশ্চর্য'র পরিবর্তে এই 'ক্ষীইই আশ্চর্য' উচ্চারণ ভঙ্গির মধ্যে মিশে আছে একরাশ বিস্ময় আর ভয়ে গলার স্বর বুজে আসার ভাব। /ক্/ ধ্বনির পরিবর্তে উচ্চারিত হয়েছে যুক্তধ্বনি /ক্খ্/ এবং /ই/ ধ্বনি প্লুতস্বরে পরিণত হয়েছে। উচ্চারণ প্রকৃতি বোঝানোর জন্য স্বাভাবিকভাবেই বানানের ইচ্ছাকৃত বদল ঘটাতে হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে লিপিগত বিচ্যুতিও হয়েছে।

৫.৩.৯. 'বাপ রে বাপ!' গল্পে বিচ্যুতি

অনেকসময় প্রচলিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক-নৈতিক নিয়মের বিচ্যুতি দেখা যায় সাহিত্যে। এই ধরনের বিচ্যুতি আমাদেরকে পাঠের সংশ্লিষ্ট চরিত্রের ধাঁচ চিনে নিতে সাহায্য করে। এইরকম

বিচ্যুতির দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই নবনীতা দেবসেনের 'বাপ রে বাপ!' শীর্ষক গল্পটিতে। গল্পের প্রধান চরিত্র সোমেশ গঠনগতভাবে পুরুষ হলেও, নিজেকে সে নারীরূপে ভাবতে স্বচ্ছন্দ। তার আচরণ যেমন নারীসুলভ, তেমনি তার বেশবিন্যাস পুরুষের পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচনের সাংস্কৃতিক রীতিকে মানেনি। ফলে প্রচলিত রীতির বিচ্যুতি হয়েছে। এই বিচ্যুতি সোমেশকে অন্যান্য পুরুষের থেকে পৃথক ক'রে প্রমুখন করেছে। সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণ হয় যে সাংস্কৃতিক বিচ্যুতি এবং প্রমুখিত আচরণেই সোমেশের আগ্রহ, যা তার চরিত্রকে অনন্য ক'রে তুলেছে। শুধু সোমেশ চরিত্রের প্রমুখনই নয়, সেই সঙ্গে আমাদের সমাজে সোমেশের মতো যেসব মানুষেরা রয়েছেন, তাঁরাও যে ব্যক্তিত্বের জোরে সম্মানের সঙ্গে নিজেদের পছন্দ মতো এই সমাজে চলাফেরা করতে পারেন, সেটিও স্পষ্ট করে দিতে চায় এই বিচ্যুতি। এহেন সোমেশ চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে নবনীতা কীভাবে পাঠকের বোধের জগতে সাড়া ফেলতে চেয়েছেন, তা বিশ্লেষণ করা আছে সন্দর্ভের নবম অধ্যায়ে (দ্র. ৯.৩.৩)।

৫.৪. উপসংহার

নবনীতা দেবসেনের গল্প ও উপন্যাসে বিভিন্নভাবে বিচ্যুতি এবং সমান্তরতার উপস্থিতি উপলব্ধি করা যায়। নবনীতার সাহিত্যের অন্তর্গত বহুসংখ্যক দৃষ্টান্তের মধ্য থেকে সীমিত সংখ্যক দৃষ্টান্ত বেছে নিয়ে নির্দিষ্ট গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে বর্তমান অধ্যায়ে বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো হয়েছে। বিশ্লেষণ থেকে যে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তা নিচে ক্রমান্বয়ে তুলে ধরা হল –

- সমান্তরতা অপেক্ষা বিচ্যুতির পরিমাণ সংখ্যায় বেশি দেখা গেছে।
- ভাষার প্রায় সব স্তরেই (ধ্বনিগত, শাব্দিক, রূপতাত্ত্বিক প্রভৃতি) বিচ্যুতি সহজলভ্য।

- সমান্তরতার নিদর্শন সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় ভাষার সব স্তরে এর উপস্থিতি দেখা যায়নি।
- বিচ্যুতি, সমান্তরতা এবং এই দুটি থেকে প্রাপ্ত প্রমুখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমগ্র পাঠের মেজাজকে ধারণ ক'রে আছে।

অর্থতাত্ত্বিক সমান্তরতার একটা বড়ো জায়গা জুড়ে আছে মেটাফরের বৈশিষ্ট্য-বাতিলকরণ তত্ত্ব (feature-cancellation theory)[৫২]। এই সংক্রান্ত যাবতীয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে ঠিক পরবর্তী অধ্যায়ে, অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ে (দ্র. ৬.৩.৩)।

বিভিন্ন চরিত্রের উক্তিতে কিংবা আচরণেও অনেকসময় স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্যুতি দেখা যায়, যা সেই চরিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের সহায়ক। ভাষিক বিচ্যুতি ছাড়াও ব্যক্তির স্বাভাবিক মেজাজের বিচ্যুতি হতে পারে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'deviation from normal energy level'।

> Deviation from normal energy level: increase (gladness, anger), or decrease of energy (sadness, depression, calm). One important ingredient in emotions involves deviation from the normal level of energy. Joy, mirth or, for that matter, anger, consist in heightened psychic energy, whereas calm, sorrow or depression consist in a lowered level of energy. Thus, emotions also involve a lowered or heightened level of vitality.[৫৩]

ব্যক্তির আচরণবিধির বিচ্যুতি নবনীতার কলমে যেসব চরিত্রে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বামা-বোধিনী' উপন্যাসে কমলাম্মার প্রতি আসক্ত মলয়, 'স্বভূমি' উপন্যাসে সন্তানশোকপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সন্তোষ মুখোপাধ্যায়, 'মায়া রয়ে গেল' উপন্যাসে এইডসে আক্রান্ত মোনালিসার প্রেমিক শিলাদিত্য, শিলাদিত্যকে বিপথে যেতে দেখার পর তার দিদি শ্রাবন্তী, অবসর জীবনের একাকিত্বকে মেনে নিতে না-পারা প্রসেনজিত, 'শনি-রবি' উপন্যাসে নিজের

মায়ের দ্বারা মানসিকভাবে নির্যাতিত স্বামীসন্তানহারা দুঃখী পদ্মা। এরা প্রত্যেকেই নিজ-নিজ অবস্থার শিকার। তাই এরা নিজেদের আচরণের স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

৫.৫. তথ্যসূত্র

১। Shutterstock, "Mountains Flowers Foreground royalty-free images," Last seen 07.05.2023, https://images.app.goo.gl/GRhRd4D5ALPpEeWw7.

২। Jonathan Culpeper, "A Cognitive Stylistic Approach to Characterisation," in *Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis*, ed. Elena Semino and Jonathan Culpeper (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002), 270.

৩। Mick Short, *Exploring the Language of Poems, Plays and Prose* (New York: Routledge, 2013), 67.

৪। পারমিতা দাস, "আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি: সাধারণ পরিচয় ও নির্বাচিত গল্পে তার নানা মাত্রা অনুসন্ধান," *Jadavpur Journal of Languages and Linguistics* 06, Special Edition, (2024): 86, accessed December 12, 2024, https://archive.org/details/shobdo-2-final-copy/mode/2up.

৫। পারমিতা দাস, "আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি," 87-90.

৬। Craig Hamilton, "Conceptual Integration in Christine de Pizan's *City of Ladies*," in *Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis*, ed. Elena Semino and Jonathan Culpeper (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002), 9.

৭। Short, *Exploring the Language*, 34.

৮। নবনীতা দেবসেন, "বামা-বোধিনী," *দশটি উপন্যাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০০৩), ২২৪।

৯। দেবসেন, "বামা-বোধিনী," ২২৪।

১০। দেবসেন, "বামা-বোধিনী," ২২৫।

১১। দেবসেন, "বামা-বোধিনী," ২২৫।

১২। দেবসেন, "বামা-বোধিনী," ২২৫।

১৩। দেবসেন, "বামা-বোধিনী," ২২৬।

১৪। দেবসেন, "বামা-বোধিনী," ২২৬।

১৫। দেবসেন, "বামা-বোধিনী," ২৩৩।

১৬। দেবসেন, "বামা-বোধিনী," ২৩৭।

১৭। দেবসেন, "বামা-বোধিনী," ২৮০।

১৮। দেবসেন, "বামা-বোধিনী," ২৪০-৪৩।

১৯। দেবসেন, “বামা-বোধিনী,” ২৪৪, ২৫২, ২৫৪।

২০। দেবসেন, “বামা-বোধিনী,” ২৫৫, ২৫৬।

২১। দেবসেন, “বামা-বোধিনী,” ২৩৫।

২২। দেবসেন, “বামা-বোধিনী,” ২৩৬।

২৩। দেবসেন, “বামা-বোধিনী,” ২৩৮।

২৪। নবনীতা দেবসেন, “শনি-রবি,” *দশটি উপন্যাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০০৩), ৪৩৫।

২৫। দেবসেন, “শনি-রবি,” ৪৩৭।

২৬। দেবসেন, “শনি-রবি,” ৪৩৭।

২৭। দেবসেন, “শনি-রবি,” ৪৩৮।

২৮। দেবসেন, “শনি-রবি,” ৪৩৯।

২৯। দেবসেন, “শনি-রবি,” ৪৪১।

৩০। দেবসেন, “শনি-রবি,” ৪৬৬।

৩১। দেবসেন, “শনি-রবি,” ৪৪৯।

৩২। দেবসেন, “শনি-রবি,” ৪৪৯।

৩৩। দেবসেন, “শনি-রবি,” ৪৪৯।

৩৪। দেবসেন, “শনি-রবি,” ৪৪৯।

৩৫। দেবসেন, “শনি-রবি,” ৪৪৯।

৩৬। দেবসেন, “শনি-রবি,” ৪৪৯।

৩৭। দেবসেন, “শনি-রবি,” ৪৫১।

৩৮। Elena Semino, “A cognitive stylistic approach to mind style in narrative fiction,” in *Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis*, ed. Elena Semino and Jonathan Culpeper (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002), 99.

৩৯। নবনীতা দেবসেন, “এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট,” *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৯), ১১৮।

৪০। নবনীতা দেবসেন, “জগমোহনবাবুর জগৎ,” *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৯), ১৪২।

৪১। নবনীতা দেবসেন, “জীবে দয়া,” *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৯), ১৬৫।

৪২। দেবসেন, “জীবে দয়া,” ১৬৫।

৪৩। দেবসেন, “জীবে দয়া,” ১৬৫।

৪৪। দেবসেন, “জীবে দয়া,” ১৭৬।

৪৫। দেবসেন, "জীবে দয়া," ১৭৬।

৪৬। Short, *Exploring the Language*, 39.

৪৭। নবনীতা দেবসেন, "হাওয়া-ই-হিন্দ," *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৯), ১৭৯।

৪৮। দেবসেন, "হাওয়া-ই-হিন্দ," ২১৫।

৪৯। নবনীতা দেবসেন, "আমি, অনুপম," *দশটি উপন্যাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., জানুয়ারি ২০০৩), ৪২।

৫০। নবনীতা দেবসেন, "ভালোবাসা কারে কয়," *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৯), ২৯৮।

৫১। দেবসেন, "ভালোবাসা কারে কয়," ২৯৯।

৫২। Reuven Tsur, "Aspects of Cognitive Poetics," in *Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis*, ed. Elena Semino and Jonathan Culpeper (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002), 291.

৫৩। Tsur, "Aspects of Cognitive Poetics," 286.

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাঠকের বোধে বিচ্যুতি ও সমান্তরতার প্রবেশ ও প্রভাব

৬. পাঠকের বোধে বিচ্যুতি ও সমান্তরতার প্রবেশ ও প্রভাব

৬.১. ভূমিকা

বিচ্যুতি ও সমান্তরতা হল লেখকের শৈলীগত দুটি উপাদান। সন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা ইতোমধ্যেই নবনীতা দেবসেনের কলমে এই দুই উপাদানের প্রয়োগবৈচিত্র্য লক্ষ করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখে নেওয়ার পালা যে কীভাবে পাঠক কোনো একটি পাঠ মধ্যস্থ নানা ধরনের বিচ্যুতি কিংবা সমান্তরতাকে তাঁর বোধের আওতায় আনতে পারেন।

বর্তমান অধ্যায়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাঠকের বোধগম্যতা বিশ্লেষণের আলোকে দেখা যাবে। বিষয়টি হল মেটাফর এবং সমান্তরতার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে উপন্যাসের চরিত্রের অবস্থান নির্ণয়।

৬.২. পদ্ধতি

বর্তমান অধ্যায়ে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে বোধগত শৈলীবিজ্ঞানের ছকবদ্ধতা (schematicity), রূপক (metaphor) এবং সম্মুখন-পশ্চাদন পার্থক্য (figure-ground distinction)। এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথম দুটির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে [দ্র. ২.২] এবং তৃতীয় পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে [দ্র. ৪.২]।

৬.৩. বিশ্লেষণ ও আলোচনা

আমরা ক্রমান্বয়ে বিশ্লেষণ করব, কীভাবে পাঠক বিচ্যুতি এবং সমান্তরতার অস্তিত্ব টের পাওয়া থেকে শুরু করে অর্থ অনুধাবনের পর্যায়ে পৌঁছান।

৬.৩.১. বিচ্যুতি ও সমান্তরতা থেকে প্রাপ্ত প্রমুখন অনুধাবনে পাঠকের বোধগত প্রক্রিয়া

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা নবনীতার গল্প উপন্যাসে বিভিন্ন ধরনের বিচ্যুতি ও সমান্তরতার উপস্থিতি লক্ষ করেছি। কোথাও-কোথাও বিচ্যুতি ও সমান্তরতার দ্বারা কোনও বিশেষ ভাবনার প্রমুখন হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও হয়তো কেবল বিচ্যুতি ও সমান্তরতা দেখা গেছে, যা স্রষ্টার ভাষিক চয়নের বৈচিত্র্য সাধন করেছে। তবে প্রমুখন হোক কিংবা না-হোক, বিচ্যুতি ও সমান্তরতা ঠিক যে মুহূর্তে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তখনই পাঠকের বোধে সবরকম শৈলীগত বৈশিষ্ট্য দ্বারা নির্মিত একেকটি উপন্যাস-পশ্চাদন কিংবা গল্প-পশ্চাদনের ওপর বিচ্যুতি ও সমান্তরতা সম্মুখিত হয়। আর যদি বিচ্যুতি-সমান্তরতার পরিণামে প্রমুখন হয়, তবে তো বলার অপেক্ষা থাকে না যে সেই প্রমুখনটা আসলে সম্মুখন। এই প্রসঙ্গে স্টকওয়েলের উক্তি উদ্ধার করা যেতে পারে –

> The most obvious correspondence of the phenomenon of figure and ground is in the literary critical notion of foregrounding.[১]

প্রমুখন সম্পূর্ণরূপে পাঠকের মানসিক ব্যাপার। পাঠকের মনের ক্যানভাসে বাকি সবকিছুকে পিছনে রেখে স্রষ্টা একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে সামনের দিকে এগিয়ে দেন প্রমুখনের মাধ্যমে।

৬.৩.২. পাঠকের জ্ঞানের ছকে বিচ্যুতি ও সমান্তরতার প্রভাব

প্রত্যেকটি বিচ্যুতিই পাঠকের কোনও একটি বিষয়ে নির্মিত ছকের নবীকরণ করে এবং প্রত্যেকটি সমান্তরতাই পাঠকের ছক নির্মাণ করে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক।

সন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, ধ্বনিগত, লিপিগত, শাব্দিক, আন্বয়িক, রূপতাত্ত্বিক, অর্থতাত্ত্বিক, সংরূপগত, চরিত্রের ছকমূলক, চিরাচরিত চিত্রকল্পগত, আভ্যন্তরীণ ছাঁচ (pattern), বাচনিক কিংবা সাংস্কৃতিক রীতির স্তরে বিচ্যুতি সংঘটিত হতে পারে। এমনকি বিচ্যুতি হতে পারে চরিত্রের স্বাভাবিক মেজাজ অর্থাৎ মানসিক শক্তিস্তরেও। যে স্তরেই বিচ্যুতি হোক-না-কেন, পাঠক তাকে চিনে নিতে সক্ষম হন। কারণ, প্রতিটি স্তরের নর্ম বা নিয়মাবলী সম্পর্কেই পাঠকের পূর্বজ্ঞান আছে। আর সেই পূর্বজ্ঞান তৈরি হয়েছে একেকটি স্তর সম্পর্কিত তথ্যসমূহ দ্বারা নির্মিত ছকের ভিত্তিতে। তাই যখনই কোনও একটি স্তরে বিচ্যুতি সংঘটিত হয়, তখন আসলে পাঠকের সংশ্লিষ্ট ছকেও যেন একটা ধাক্কা লাগে। পাঠক বিচ্যুতির উপস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হন।

পঞ্চম অধ্যায় থেকে যথেচ্ছভাবে একটি উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা হল –

‘বামা-বোধিনী’ উপন্যাসে পাওয়া গিয়েছে সংরূপগত বিচ্যুতি [দ্র. ৫.৩.১.৩]। অর্থাৎ, উপন্যাস সংরূপটি ঠিক যেমন হয় বলে পাঠক বরাবর জানেন, এই উপন্যাসে তেমনটি দেখা যায়নি। পাঠক সাধারণত উপন্যাসের ভাষারীতি সম্পর্কে যেমনটি জানেন, তা খানিকটা নিম্নরূপ -

> কোনো একটি নির্দিষ্ট গদ্যরীতিকে উপন্যাসের এক ও অদ্বিতীয় মাধ্যমরূপে চিহ্নিত করে দেওয়া সম্ভব নয়। সাধারণভাবে বর্ণনা ও বিশ্লেষণধর্মী গদ্য উপন্যাসের বাহনরূপে স্বীকৃত হলেও কাব্যধর্মী মন্ময় গদ্য কিংবা দ্বন্দ্বমুখর নাটকোচিত সংলাপরীতি ক্ষেত্রবিশেষে উপন্যাসের উপযোগী মাধ্যম বলে গণ্য হতেই পারে।[২]

আবার ই. এম. ফর্স্টার তাঁর *Aspects of the Novel*-এর ভূমিকায় ফরাসী সমালোচক M. Abel Chevalley-কে সমর্থন জানিয়ে তাঁর বক্তব্যই উদ্ধৃত করেছেন –

> A fiction in prose of a certain extent.[৩]

সুতরাং, পাঠক নিশ্চিতভাবে জানেন যে উপন্যাস রচিত হয় গদ্যরীতিতে। অর্থাৎ, পাঠকের উপন্যাস সংক্রান্ত ছকের অন্তর্গত একটি তথ্য হল গদ্যরীতি। অথচ নবনীতা 'বামা-বোধিনী' উপন্যাসে গদ্যরীতির পাশাপাশি পদ্যরীতিও ব্যবহার করেছেন।

শুধু পদ্যরীতিই নয়, এই উপন্যাসের স্থানে স্থানে পাঠক প্রবন্ধ সংরূপের ভাষাশৈলীও দেখতে পান। পাঠক আগে থেকেই প্রবন্ধের লক্ষণ সম্পর্কে যা জানেন, তা অনেকটা নিম্নরূপ –

> ১. গদ্যই প্রবন্ধশিল্পের স্বাভাবিক মাধ্যম, ...
> ২. যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদির আশ্রয়ে প্রবন্ধের প্রাথমিক লক্ষ্য তত্ত্ব ও তথ্যের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার ;
> ৩. যৌক্তিক পারম্পর্য তথা বিশ্লেষণী ঋজুতার সঙ্গে কল্পনা ও আবেগের প্রয়োগ[৪]

প্রবন্ধের এইরূপ লক্ষণই প্রযুক্ত হতে দেখা গেছে 'বামা-বোধিনী' উপন্যাসের কয়েকটি জায়গায়। অথচ সাধারণভাবে উপন্যাস কিন্তু প্রবন্ধের ন্যায় এত প্রখরভাবে 'যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণ'-কে আশ্রয় করে না। সুতরাং, আবারও পাঠকের উপন্যাস সংক্রান্ত ছকের সঙ্গে 'বামা-বোধিনী' উপন্যাস ঠিক খাপ খায় না।

পদ্যরীতি এবং প্রবন্ধের ভাষাশৈলীর প্রয়োগ তাই পাঠকের উপন্যাস সংক্রান্ত ছকের কিছুটা নবীকরণ করে। নবীকরণের ফলে পাঠক জানলেন যে উপন্যাসের রীতি এমন মিশ্র প্রকৃতির হওয়াও সম্ভব। এরকম ভাষাশৈলী প্রয়োগের সার্থকতা কোথায় তা আগের অধ্যায়েই ব্যাখ্যাত হয়েছে [দ্র. ৫.৩.১.৩]।

অন্যদিকে সমান্তরতা অধিকাংশ সময় কোনও একটি বিষয়ে পাঠকের ছক নির্মাণ করে। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা প্রধানত যেসব স্তরে সমান্তরতা বিশ্লেষণ করেছি, সেগুলি হল – অর্থতাত্ত্বিক, প্রয়োগতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক, ধ্বনিগত এবং চরিত্রের ছকমূলক স্তর। এদের মধ্যে ধ্বনিগত সমান্তরতা অর্থাৎ অনুপ্রাস লক্ষণীয়ভাবে পাঠকের কোনোরকম ছক নির্মাণ করে বলে মনে হয় না। কিন্তু অন্যান্য স্তরের মধ্যে থেকে যেকোনো একটির সমান্তরতা কীভাবে ছক নির্মাণে সহায়তা করে, তা পঞ্চম অধ্যায় থেকে যথেচ্ছভাবে একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হবে।

[দ্র. ৫.৩.২.২] একটি আভ্যন্তরীণ প্যাটার্ন তথা প্রয়োগতাত্ত্বিক সমান্তরতা তৈরির মাধ্যমে সরমা-চরিত্র সম্পর্কে লেখিকা প্রথমে পাঠককে পুনরাবৃত্ত তথ্য প্রদান করেছেন। এই তথ্যই সরমা সম্পর্কে পাঠকের একটি জ্ঞানের ছক (schema) নির্মাণ করেছেন। তাই যখন শেষ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি ঘটল, তখন কেবল আভ্যন্তরীণ প্যাটার্নেরই বিচ্যুতি হল না, সেইসঙ্গে সরমা চরিত্র সম্পর্কে পাঠকের ছকমূলক (schematic) বিচ্যুতিও ঘটেছে।

৬.৩.৩. মেটাফরের বৈশিষ্ট্য-বাতিলকরণ তত্ত্ব, সমান্তরতা এবং চরিত্রায়ণে তার প্রভাব

সন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ের ‘ভূমিকা’ এবং ‘উপসংহার’ অংশে মেটাফরকেও এক ধরনের সমান্তরতার ফসলরূপে বিবেচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, মেটাফরের উৎসক্ষেত্র ও লক্ষ্যক্ষেত্রের মধ্যে যেমন কিছু সাদৃশ্য থাকে, তার থেকেও বেশি থাকে বৈসাদৃশ্য। ওই সাদৃশ্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলোই উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে সমান্তরতা তৈরি করে। কীভাবে তৈরি করে, তা বুঝে নেওয়া যাক।

Lakoff ও Johnson-এর *Metaphors We Live By* বই থেকে উদাহরণ নিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায় –

ARGUMENT IS WAR

> … expressions from the vocabulary of war, e.g., attack a position, indefensible, strategy, new line of attack, win, gain ground, etc., form a systematic way of talking about the battling aspects of arguing. … A portion of the conceptual network of battle partially characterizes the concept of an argument, and the language follows suit.[৫]

কিন্তু সেই সঙ্গে ভুলে গেলে চলবে না যে 'ARGUMENT' আর 'WAR' মোটেই এক জিনিস নয়। এদের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। কারণ,

> …ARGUMENT is partially structured in terms of WAR. Argument is a different kind of activity because it involves talking instead of combat. The structure is partial, because only selected elements of the concept WAR are used. Thus our criteria for metaphor were (a) a difference in kind of activity and (b) partial structuring (use of certain selected parts).[৬]

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, রেউভেন সারের (Reuven Tsur) তৈরি মেটাফরের বৈশিষ্ট্য-বাতিলকরণ তত্ত্ব (feature-cancellation theory), যার মাধ্যমে কিছু প্রমুখনকে চিহ্নিত করা যায়। এই তত্ত্ব অনুসারে,

> metaphoric contradiction deletes those features of the metaphoric term that are irrelevant to the frame, and foreground the relevant ones.[৭]

অর্থাৎ, মেটাফরের দুটি ক্ষেত্রের ওই সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যগুলিই পাঠকের মনে প্রমুখিত (foregrounded) হয়। 'তর্ক' এবং 'যুদ্ধ'-এর মধ্যে যতগুলি সাদৃশ্যসূচক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, মেটাফর কেবল সেগুলিকেই পাঠকের সামনে উজ্জ্বলভাবে মেলে ধরে।

এবার, ওপরে উদ্ধৃত মেটাফরের বৈশিষ্ট্য-বাতিলকরণ তত্ত্বের এক ধাপ পিছনে গেলে ('mentor' থেকে 'mentee', 'reply' থেকে 'ply' ইত্যাদি পশ্চাদগঠন বা back-formation-এর মতো ক'রে), যা পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ –

মেটাফরের উৎসক্ষেত্র ও লক্ষ্যক্ষেত্রের পারস্পরিক সাদৃশ্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে শাব্দিক ও অর্থতাত্ত্বিক সমান্তরতা (lexical and semantic parallelism) তৈরি করে।

সুতরাং, দুটি ধাপকে পরপর সাজালে যা হবে, তা নিম্নরূপ –

মেটাফরের উৎসক্ষেত্র ও লক্ষ্যক্ষেত্রের পারস্পরিক সাদৃশ্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে শাব্দিক ও অর্থতাত্ত্বিক সমান্তরতা (lexical and semantic parallelism) তৈরি করে।

⬇

metaphoric contradiction deletes those features of the metaphoric term that are irrelevant to the frame, and foreground the relevant ones.[৭]

এবার, পূর্বে উল্লিখিত তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি কাজে লাগিয়ে 'আমি অনুপম' উপন্যাস থেকে একটি উদাহরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখে নেওয়া যেতে পারে নবনীতা দেবসেন কীভাবে মেটাফর তৈরি করেছেন এবং মেটাফর তৈরির ফলে পাঠকের বোধগম্যতায় কতখানি সুবিধা হয়েছে আর চরিত্রায়নেই-বা কী জাতীয় প্রভাব পড়েছে।

> একটা টিকটিকি। ফরসা চিকন গা। চোখদুটো ভাবলেশহীন কাঁচের পুতির মতন। দূরে একটা পোকার দিকে বদ্ধ দৃষ্টি। পোকাটা ছাই নড়েও না। গার্গল করা বন্ধ করে অনুপম হাত নাড়েন, হুসহাস করেন। পোকা শুনল না। তাক থেকে কাগজের কোণ ছিঁড়ে গুলি পাকিয়ে ছোড়েন। টিকটিকিটা সরসরিয়ে সরে গেল। 'সরীসৃপ'। পোকা নড়ল না। আবার মুখ নিচু করলেন, জল নিলেন, ফের ঘাড় উঁচু করতেই দেখলেন টিকটিকির মুখের মধ্যে ঝাঁকুনি খাচ্ছে পোকাটা। ধুস। ঠিক হয়েছে। বোকাদের যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। এতবার সাবধান করলেন পোকা যদি না শোনে! অনুপম কী করবেন।[৮]

উপন্যাসের এই অংশের অব্যবহিত প্রসঙ্গের নিরিখে আমরা বুঝতে পারি, এখানে প্রাপ্ত দুটি মেটাফর নিম্নরূপ –

(ক) সোমশংকর দত্তরায় হল সরীসৃপ [যেখানে, সরীসৃপ হল উৎসক্ষেত্র (source domain); সোমশংকর দত্তরায় হল লক্ষ্যক্ষেত্র (target domain)]

ওপরে উদ্ধৃত অংশ থেকেই বোঝা যায়, 'সরীসৃপ' এবং 'সোমশংকর দত্তরায়' – এই দুয়ের সাদৃশ্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি হল –

- বাইরে থেকে ভালো, সুদৃশ্য, চাকচিক্যময়
- ভাবাবেগশূন্যতা
- লক্ষ্যে অবিচল
- সাময়িক স'রে গিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকা
- কৌশলী
- আকস্মিক আক্রমণ
- শিকার আয়ত্তে আনা

সুতরাং, প্রমুখিত এই সাদৃশ্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে যেসব শাব্দিক ও অর্থতাত্ত্বিক সমান্তরতা তৈরি করেছে, সেগুলি নিচে পরপর দেওয়া হল –

- সরীসৃপ বাইরে থেকে ভালো, সুদৃশ্য, চাকচিক্যময়
  সোমশংকর বাইরে থেকে ভালো, সুদৃশ্য, চাকচিক্যময়
- সরীসৃপ ভাবাবেগশূন্য
  সোমশংকর ভাবাবেগশূন্য
- সরীসৃপ সাময়িক স'রে গিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে
  সোমশংকর সাময়িক স'রে গিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে
- সরীসৃপ লক্ষ্যে অবিচল
  সোমশংকর লক্ষ্যে অবিচল
- সরীসৃপ কৌশলী

সোমশংকর কৌশলী

- সরীসৃপ আকস্মিক আক্রমণ করে

সোমশংকর আকস্মিক আক্রমণ করে

- সরীসৃপ শিকার আয়ত্তে আনে

সোমশংকর শিকার আয়ত্তে আনে

(খ) সমীর (এবং অন্যান্য অল্পবয়সী নকশালপন্থী, যারা অনুপমের ছাত্র) হল পোকা [যেখানে, পোকা হল উৎসক্ষেত্র (source domain); সমীর হল লক্ষ্যক্ষেত্র (target domain)]

উদ্ধৃত অংশটি থেকেই বোঝা যায়, 'পোকা' এবং 'সমীর ও সমীরের মতো নকশালপন্থী ছেলেরা' – এই দুয়ের সাদৃশ্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি হল –

- বোকা
- একরোখা
- বিপদের আঁচ পেলেও নিজের অবস্থান থেকে নড়ে না
- অন্যে সাবধান করে দিতে চাইলেও গ্রাহ্য করে না
- শিকারে পরিণত হয়
- মৃত্যু হয় যন্ত্রণায় 'ঝাঁকুনি খেতে খেতে' নৃশংসভাবে

সুতরাং, প্রমুখিত এই সাদৃশ্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি উভয় ক্ষেত্রের মধ্যে যেসব শাব্দিক ও অর্থতাত্ত্বিক সমান্তরতা তৈরি করেছে, সেগুলি নিচে পরপর দেওয়া হল –

- পোকা হল বোকা

  সমীরের মতো নকশালপন্থী ছাত্ররা হল বোকা
- পোকা একরোখা

  নকশালপন্থী ছাত্ররা একরোখা
- পোকা বিপদের আঁচ পেলেও নিজের অবস্থান থেকে নড়েনি

  নকশালপন্থী ছাত্ররা বিপদের আঁচ পেলেও নিজের অবস্থান থেকে নড়েনি
- পোকাকে অন্যে সাবধান করে দিতে চাইলেও গ্রাহ্য করেনি

  নকশালপন্থী ছাত্রদেরকে অন্যে সাবধান করে দিতে চাইলেও গ্রাহ্য করেনি

- পোকা শিকারে পরিণত হয়
  নকশালপন্থী ছাত্ররা শিকারে পরিণত হয়
- পোকার মৃত্যু হয় যন্ত্রণায় 'ঝাঁকুনি খেতে খেতে' নৃশংসভাবে
  নকশালপন্থী ছাত্রদের মৃত্যু হয় যন্ত্রণায় 'ঝাঁকুনি খেতে খেতে' নৃশংসভাবে

উপরোক্ত সাদৃশ্যগুলিকে বাদ দিলে মেটাফরের দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। আসলে সমীর আর সোমশংকর দুজন মানুষ এবং টিকটিকি ও পোকা যথাক্রমে সরীসৃপ ও পতঙ্গ শ্রেণির প্রাণী। কিন্তু মেটাফর এই বিরাট পার্থক্যের জায়গাটিকে আপাতত ভুলিয়ে দিয়ে পাঠকের মনে উক্ত সাদৃশ্যগুলির প্রমুখন (foreground) করেছে। এর ফলে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অধ্যাপক অনুপম রায় পড়েছেন এক মধ্যবর্তী অবস্থানে। যদিও বাথরুমে দাঁড়িয়ে তিনি পোকাটিকে তার অবস্থান থেকে নড়াতে চেষ্টা করেছেন, তবু সরীসৃপকে তার লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারেননি। কিংবা বলা ভালো, শিকারীকে তিনি সরাতে তেমন চেষ্টাই করেননি, যতটা তিনি শিকারকে সরাতে চেষ্টা করেছেন। একইভাবে সমীর যাতে তার কিটব্যাগ সমেত অনুপমের বাড়ি থেকে অন্য কোথাও চলে যায়, যাতে সে সোমশংকরের হাতে ধরা না-পড়ে, প্রাথমিকভাবে অনুপম সেই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সোমশংকরকে তিনি প্রতিহত করতে পারেননি, অনুপমের পক্ষে সেটা করা সম্ভবও নয়। অগত্যা অনুপম আত্মরক্ষার্থে সমীরের কিটব্যাগ থানায় জমা দিয়ে সমীরের মতো 'বোকা'দের নৃশংস মৃত্যুর পথকে প্রশস্ত করে এসেছেন। উদ্ধৃতাংশের শেষের কয়েকটি বাক্য আমরা বিশেষভাবে খেয়াল করব –

> ধুস। ঠিক হয়েছে। বোকাদের যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে। এতবার সাবধান করলেন পোকা যদি না শোনে! অনুপম কী করবেন।[৯]

এটি আসলে অনুপমের মতো বুদ্ধিজীবী, যাঁরা সত্তরের দশকে অল্পবয়সী ছাত্রদের বিপদের পথে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা বাঁচার তাগিদে সময় বুঝে পা টেনে নিয়েছিলেন, তাঁদের নিজেদেরকে দেওয়া সান্ত্বনা-বাক্য।

সুতরাং, 'আমি অনুপম' উপন্যাসে অনুপমের দুই পক্ষের মধ্যবর্তী সংকটময় অবস্থানকে পুরো মাত্রায় বুঝতে সাহায্য করেছে মেটাফরের দুটি ক্ষেত্রের সাদৃশ্যসূচক বৈশিষ্ট্যাবলী তথা সাদৃশ্যসূচক বৈশিষ্ট্যাবলীর পারস্পরিক সমান্তরতা, যা পাঠকের বোধে বৈশিষ্ট্যগুলির প্রমুখন করেছে।

৬.৪. তথ্যসূত্র

১। Peter Stockwell, *Cognitive Poetics: An Introduction* (London and New York: Routledge, 2002), 14.

২। কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, (কলকাতা: রত্নাবলী, ২০১৫), ২৫৮।

৩। E. M. Forster, *Aspects of the Novel* (London: Penguin Books, 2005), 25.

৪। চট্টোপাধ্যায়, *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ৩৫০।

৫। George Lakoff and Mark Johnson, *Metaphors We Live By* (Chicago: University of Chicago Press, 1980), 7.

৬। Lakoff and Johnson, *Metaphors We Live By*, 84.

৭। Reuven Tsur, "Aspects of Cognitive Poetics," in *Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis*, edited by Elena Semino and Jonathan Culpeper (Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002), 291.

৮। নবনীতা দেবসেন, "আমি অনুপম," *দশটি উপন্যাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., জানুয়ারি ২০০৩), ৩৫-৩৬।

৯। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৩৫-৩৬।

সপ্তম অধ্যায়

নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের আখ্যানকৌশল অনুসন্ধান

৭. নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের আখ্যানকৌশল অনুসন্ধান

৭.১. ভূমিকা

বর্তমান গবেষণায় পাঠক তথা পাঠকের বোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানের বিষয়। সেই পাঠকের কৌতূহলকে প্রতিনিয়ত জারিয়ে রাখার জাদুকাঠি হল আখ্যানকৌশল। কারণ, আখ্যান রচয়িতার দ্বারা গৃহীত আখ্যানকৌশলের মাধ্যমেই স্থিরীকৃত হয় যে একটি আখ্যানে কখন পাঠককে কতটুকু এবং কীভাবে জানানো হবে, আর কখন কতটাই-বা পাঠকের অজ্ঞাত থাকবে। এই আখ্যানকৌশলকে পরিচালনা করা হয় কথকের কথন বৈশিষ্ট্য, চরিত্রায়নের প্রকৃতি, স্থান, কাল, প্রেক্ষিত, প্লট নির্বাচন, ভাষারীতি প্রভৃতির সম্মিলিত কারিগরির মাধ্যমে। এইসব উপকরণের অদলবদল তৈরি করে একেকটি আখ্যানের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য। আখ্যানকৌশল লেখক ও পাঠকের মধ্যে যে সংযোগসেতু নির্মাণ করে, উপকরণগুলির সুচারু প্রয়োগবৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করেই আসলে ওই সংযোগসেতুটি সুদৃঢ় হয়। বলাবাহুল্য, কোন্ উপকরণকে কীভাবে প্রয়োগ করা হবে, তা লেখকের সিদ্ধান্ত।

এই যে বললাম 'লেখকের সিদ্ধান্ত', এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের উক্তি ধার করা যায়,

> আমার না হলেও চলত, কেবল আমি ইচ্ছা করে করচি এই যে মুক্ত কর্ত্তৃত্বের ও মুক্ত ভোক্তৃত্বের অভিমান, যে অভিমান বিশ্বস্রষ্টার এবং বিশ্বরাজ্যেশ্বরের, -- সেই অভিমানই মানুষের সাহিত্যে এবং আর্টে। [১]

সাহিত্যস্রষ্টা তাঁর আখ্যানে কেমন জগত নির্মাণ করবেন, এ তাঁর নিজস্ব অভিরুচি। অসংখ্য সম্ভাব্য আখ্যান বিশ্বের মধ্য থেকে একটিকে বেছে নেন লেখক। এই বেছে নেওয়ার প্রসঙ্গেই গুরুত্বপূর্ণ হয় সম্ভাব্য বিশ্বের আলোচনা। অসংখ্য সম্ভাব্য আখ্যান বিশ্বের ধারণা আখ্যানতত্ত্ব

আলোচনার জগতে বহু চর্চিত। ইংরেজিতে একেই বলা হয় possible worlds theory। এই তত্ত্বের মূলকথা হল –

> the world we call "actual" is only one of an infinite constellation of possible worlds, or alternative sets of states of affairs [২]

সম্ভাব্য বিশ্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও নবনীতা দেবসেনের সাহিত্যের নিরিখে তার প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ সন্দর্ভের অষ্টম অধ্যায়ে করা হয়েছে।

অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের উক্তি স্মরণ করে বলা যায়, "উপন্যাসের আখ্যান যে-বিষয় নিয়ে মগ্ন বা পল্লবিত হোক না কেন, বাচনের সম্প্রসারণশীলতা ও ভারবহন ক্ষমতার উপরেই তার সাফল্য নির্ভর করে"[৩] । বলা বাহুল্য, উপযুক্ত আখ্যানকৌশলই এর সহায়ক। তাই বর্তমান অধ্যায়ে আমাদের লক্ষ্য, নবনীতা তাঁর গল্প উপন্যাসে কী ধরনের আখ্যানকৌশল অবলম্বন করেছেন, তা দেখা। একেকটি আখ্যানের কাহিনির সঙ্গে তার বাচনের আখ্যানকৌশল কতটা সংগতিপূর্ণ হয়েছে, তা অনুসন্ধান করা।

৭.২. পদ্ধতি

আখ্যানের কী জাতীয় কলাকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে নবনীতা দেবসেন লেখক-পাঠক সংযোগ সাধন করতে চেয়েছেন, তা বোঝার জন্য আমরা তিনটি ধাপে বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি।

প্রথম ধাপে দেখা হয়েছে আখ্যানের সামগ্রিক বিষয়।

দ্বিতীয় ধাপে দেখা হয়েছে, আখ্যানের কাহিনি।

তৃতীয় ধাপে দেখা হয়েছে, আখ্যানের বাচন।

৭.৩. বিশ্লেষণ ও আলোচনা

একটি আখ্যান গড়ে ওঠে কাহিনি ও বাচনের যৌথ সমারোহে। বাচনেই ধরা থাকে কাহিনি বা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই বলা যায়, আখ্যানের কাহিনি হল বাচন তৈরির জন্য গৃহীত কাঁচামাল। সর্বোপরি থাকে আখ্যানের মাধ্যমে পরিস্ফুট দুয়েকটি সামগ্রিক বিষয়।

৭.৩.১. বিষয়

অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর 'উপন্যাস: জিজ্ঞাসার মন্থন' প্রবন্ধে বলছেন –

> জীবনে যে-সমস্ত দিক অতি প্রকাশ্য, ঔপন্যাসিকতা তাতে স্বস্তি পায় না। বরং জীবনের স্তরে স্তরে সঞ্চিত অনন্বয় ও প্রহেলিকা, ব্যাখ্যাতীত অসামঞ্জস্য ও শূন্যায়তনগুলির প্রতি লেখক বেশি আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। অতিপ্রকট পরিচয়ের আড়ালে প্রচ্ছন্ন অভাবনীয় সত্যের আবিষ্কারে তিনি বেশি আগ্রহী কেননা সেইসব কিছুতেই মানুষ নামক আশ্চর্য অস্তিত্বের উদ্ভাসন তিনি দেখতে পান।[৪]

নবনীতার কলমে সৃষ্ট উপন্যাসের বিষয়সমূহ উপরোক্ত মন্তব্যেই সিলমোহর দেয়। কয়েকটি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় পরপর খুব সংক্ষেপে দেখে নিলেই এটি স্পষ্ট হবে।

'আমি অনুপম' উপন্যাসের বিষয়: এক প্রথিতযশা অধ্যাপকের ছাত্রদেরকে বিপ্লবে বরাবর উৎসাহ দিয়ে সুযোগ বুঝে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে তাদেরকে চরম বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া এবং এর পরবর্তী আত্মবিশ্লেষণ। এই আত্মবিশ্লেষণের পরতে পরতে ধরা দেয় মানুষ হিসেবে অনুপমের মতো ব্যক্তিদের জীবনব্যাপী সাফল্য-ব্যর্থতার খতিয়ান।

'ফিনিক্স' উপন্যাসের বিষয়: যৌবন ও মেধার শক্তিতে নিজের জীবনপথকে কার্যত নির্মাণ করতে করতে এগিয়ে চলেন এক নারী। তাঁর একটি সন্তান আছে ঠিকই, কিন্তু প্রথাগত মাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা নেই। তিনি অন্তরে বাইরে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আক্ষরিক অর্থেই স্ব-অধীন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চোখে এসবকিছু যারপরনাই অসামঞ্জস্য বলে চিহ্নিত হতে পারে। সেই তথাকথিত অসামঞ্জস্যের জয়গান হয়ে উঠেছে এই উপন্যাস।

‘শনি-রবি’ উপন্যাসের বিষয়: একটি পারিবারিক মিলনোৎসব। কিন্তু যাবতীয় বিত্ত, বৈভব, গৌরবের ভাঁজে ভাঁজেই যে লুকিয়ে থাকে ব্যক্তিগত কিছু দুঃখ, ব্যথা, যন্ত্রণা, তাকেই ভিতর থেকে বের করে আনে এই উপন্যাস।

‘মায়া রয়ে গেল’ উপন্যাসের বিষয়: আধুনিক জীবনের বেশ কয়েকটি সমস্যা একত্রে উপন্যাসের বিষয়রূপে পরিগণিত হয় – বিদেশে চাকরিরত সন্তানের বাবার অসহায়তা, অবসরজীবনের একাকিত্ব, পুত্রবধূর ওপর শাশুড়ির মানসিক নির্যাতন, রক্ষণশীলতার বাইরে পা রাখার নানা প্রতিকূলতা, ড্রাগের নেশা, এইডস আক্রান্ত মানুষের সংকট।

‘অভিজ্ঞান’ উপন্যাসের বিষয়: নারীর স্বনির্মিত অভিজ্ঞান অর্থাৎ পরিচয় (identity)। আধুনিক নারীজীবনের কয়েকটি বড়ো সমস্যা –সমকামীরূপে নারীর (পুষ্পা) আত্মোপলব্ধি জনিত ব্যক্তিগত প্রাথমিক সমস্যা ও উত্তরণ, সমকামীরূপে নারীর (পুষ্পা) আত্মপ্রকাশের দরুণ চারপাশের সমাজ-পরিবেশের বিরোধিতাজনিত সমস্যা, উদারপন্থী নারী-লেখকের (অংশুমালা) বিরুদ্ধে ফ্রি স্পিচের দোহাই দিয়ে সমালোচনার নামে অশ্রাব্য ভাষায় তাঁর নারীত্বকে আক্রমণের ফলে নারীজীবনের সমস্যা, নিজের পারিবারিক বৃত্তের সমকামিতাকে ঘিরে নারীর (অংশুমালা) নিজস্ব মনোশৈলী বনাম আদর্শগত দৃষ্টিকোণের দ্বন্দ্ব।

‘ঘূর্ণি’ এবং ‘অ্যালবাট্রস’ উপন্যাসের বিষয়: দুটি উপন্যাসের মধ্যে কাহিনি ও উপস্থাপনাগত পার্থক্য থাকলেও, মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে সাদৃশ্য অনুভূত হয়। এক কথায় দুটি উপন্যাসেরই বিষয় হয়েছে, পুরুষশাসিত সমাজের বিধিনিষেধের পরোয়া না-করে নারীর অবাধ, স্বাধীন, যা-ইচ্ছে-তাই উপভোগ করা জীবনযাপন।

‘স্বভূমি’ উপন্যাসের বিষয়: মানবজীবনের বেশ কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক। যেমন – প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মানুষের রুচির বদল, আমেরিকার সঙ্গে তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতবর্ষের

প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা ও জীবনদর্শনের বিস্তর পার্থক্যের চেহারা, স্বদেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মানুষের প্রতি অবিচ্ছেদ্য টান, নারীর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের গ্রহণের স্বাধীনতা এবং জীবনের অনিশ্চয়তার কাছে, আকস্মিকতার কাছে মানুষের নির্মম পরাজয়।

লেখনীসংক্ষেপের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত আরও দুটি উপন্যাস ('বামা-বোধিনী' ও 'দ্বিরাগমন')-এর বিষয় উল্লেখ করা হল না ঠিকই। তবে সন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা থেকে এই দুই উপন্যাসের বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। উপন্যাসগুলির বিষয় খুব বেশি রকম তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে যখন পাঠক বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন কিংবা আখ্যান-বিশ্বে ধৃত জীবন-বাস্তবতা থেকে নব অর্জিত জ্ঞান দ্বারা ঋদ্ধ হন।

উপন্যাসের বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে একথা বলা যায় যে এগুলি সমসাময়িক অভিজ্ঞতার ছাপ বহন করছে। তা হতে পারে সত্তরের দশকের উত্তাল পরিস্থিতি, হতে পারে সমকামী মানুষের সামাজিক অবস্থান কিংবা হতে পারে অভিবাসী ভারতীয়দের সুখ-দুঃখ। কিন্তু এইসব উপন্যাস কেবলমাত্র সাময়িকতার প্রতিবেদনমাত্র নয়। সাময়িকতাকে ছাপিয়ে সর্বকালের হয়ে ওঠে। গোটা উপন্যাস জুড়ে সমকাল এবং সর্বকালের এক আশ্চর্য দ্বিবাচনিকতা চলতে থাকে যেন। আর এখানেই ধরা থাকে উপন্যাসের সার্থকতা। এরকম দেশকালের সীমা পেরিয়ে যাওয়া শাশ্বতের চিহ্নবাহী কিছু উপাদান চরিত্রদের কথায় শোনা যায়। যেমন – 'মায়া রয়ে গেল' উপন্যাসের আদিত্য রায় তাঁর এইচ.আই.ভি. আক্রান্ত ছেলেকে চিঠিতে বলেন,

> একটা মাত্র জীবন আমাদের। বড়ই শীগগির ফুরিয়ে যায়। তার মধ্যে যে ক'টি প্রাণের সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে পারি, সেটুকুই লাভ। ... এই মৃত্যুশাসিত জীবনে ক্ষতি শুধু একটাই। অপ্রেমে। বিচ্ছেদে। ঘৃণায়।[৫]

প্রতিটি উপন্যাস শেষ পর্যন্ত জীবনের রূপ-রস-গন্ধের প্রতি, তার আপন ঐশ্বর্যের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়।

নবনীতা গল্প রচনার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় অবলম্বন করেছেন, তা বহুবিচিত্র। তারই মধ্যে সিংহভাগ জুড়ে আছে পরিবারের ঘটনাবহুল দৈনন্দিন চিত্র এবং মহাকাব্যিক কাহিনির বিনির্মাণ।

৭.৩.২. কাহিনি

কাহিনি হল ঘটনাক্রম। কাহিনি মধ্যস্থ ঘটনাগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকে তাদের কালানুক্রম এবং কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে। আর এভাবেই একটি কাহিনি অর্থবহ হয়ে ওঠে। আমরা দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি উপন্যাসের প্রধান প্রধান ঘটনাক্রম তথা কাহিনি দেখে নেব।

'আমি অনুপম' উপন্যাসের প্রধান ঘটনাক্রম: স্বরাজের স্ত্রী কমলকলির সঙ্গে অনুপমের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন, অনুপমের গলার অসুখ ও তার চিকিৎসার প্রস্তুতি, অনুপমের বাড়িতে সমীর কিটব্যাগ রেখে যায়, পুলিশ অফিসার সোমশংকর দত্তরায়ের প্রচ্ছন্ন হুমকি, ভীত অনুপম কিটব্যাগটা থানায় জমা দিয়ে আসে এবং তার পরিণামে সমীরের অ্যারেস্ট হওয়া ও সোমেনের খুন হওয়া।

'বামা-বোধিনী' উপন্যাসের প্রধান ঘটনাক্রম: সঞ্জয়-রবির সমপ্রেম, সঞ্জয়-মালিনী ও রবি-অংশুমালার বিচ্ছেদ, মলয়ের সাথে অংশুমালার বিবাহ, যুগ যুগব্যাপী সমাজে নারীর অবস্থান ও সম্মান বিষয়ে অংশুমালার গবেষণা করা, অংশুমালার সঙ্গে মলয়ের বিশ্বাসঘাতকতা, মানসিকভাবে মলয়ের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে অংশুমালার কর্মজগতে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন।

'অভিজ্ঞান' উপন্যাসের প্রধান ঘটনাক্রম: অংশুমালার 'দলিত-প্রীতি', 'মুসলমান-প্রেম', 'নারী-জাগরণ', 'গে-রাইটস' বিষয়ক উদারপন্থী বিদগ্ধ লেখনীর প্রতিবাদে হিন্দুত্ববাদীদের তাঁর নারীত্বের প্রতি কুরুচিকর আক্রমণ, অশীতিপর বৃদ্ধা ওয়েন্ডির ইংল্যান্ড থেকে কলকাতায় ঘুরতে

আসা, পুষ্পার সমকামী হিসেবে অন্তোপলব্ধি, পুষ্পাকে অনীশের মলেস্টেশনের চেষ্টা, সালমার অনীশকে ডিভোর্স দেওয়া, পুষ্পা ও সালমার মিলন।

'স্বভূমি' উপন্যাসের প্রধান ঘটনাক্রম: আলোর ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় আলো ও কালো দুই ভাইবোনের বিদেশে পড়তে যাওয়া, একজন বিদেশীকে আলোর বিয়ে করা এবং একজন ভারতীয় নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা নারীকে কালোর বিয়ে করা, বিদেশে তাদের স্থায়ী বসতি স্থাপন, মাঝে মাঝে কলকাতাবাসী বাবা-মায়ের বিদেশে যাতায়াত এবং বিদেশবাসী আলোর সপরিবার দেশে যাতায়াত, প্লেন দুর্ঘটনায় আলোর মৃত্যু।

'ফিনিক্স' উপন্যাসের প্রধান ঘটনাক্রম: সত্তরের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পুলিশের হাত থেকে মেয়েকে বাঁচাতে চেয়ে জোর করে বিপাশার বাবার বিপাশাকে বিদেশে পাঠানো, বিদেশে বিপাশার পড়াশোনা, বিদেশের বিভিন্ন পরিবেশে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও সর্বক্ষণ সমীরকে মনে করা, সাত বছর পর কলকাতায় ফিরে আসা, সমীরের থেকে মানসিক আঘাত পাওয়া, বিদেশে ফিরে গিয়ে বিবাহ ও রোহিণীর জন্ম, বিপাশার কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছানো, তার তিনটি বিবাহবিচ্ছেদ ও একের পর এক প্রণয়-সম্পর্ক স্থাপন, প্রথাগত মাতৃত্বের ছায়া থেকে বঞ্চিত ছোট রোহিণীর মায়ের প্রতি অভিযোগ-অনুযোগ, মায়ের সাহচর্য পরিত্যাগ করে কিশোরী রোহিণীর বিদেশে চলে গিয়ে বাবার পরিবারে বড়ো হয়ে ওঠা, কর্মজগতে রোহিণীর আত্মপ্রতিষ্ঠা, বিপাশা-রোহিণী সম্পর্কের তিক্ততার অবলুপ্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়া।

'ঘূর্ণি' উপন্যাসের প্রধান ঘটনাক্রম: রিমঝিমের একের পর এক বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে স্বেচ্ছায় লিপ্ত হওয়া, স্বামী ঋতবানের বারবার আঘাত পাওয়া ও তাকে ফিরিয়ে আনা, ঋতবানের বন্ধু আদিত্যর সঙ্গে রিমঝিমের পালিয়ে যাওয়া, ঋতবানের যুগপৎ বিস্ময় ও আঘাতপ্রাপ্তি, আদিত্যর সংসারে ফিরে আসা, রিমঝিমের আর কোনোদিন সংসারে ফিরে না-আসা ও সন্ন্যাসগ্রহণ।

‘দ্বিরাগমন’ উপন্যাসের প্রধান ঘটনাক্রম: শ্রীনন্দার স্বামীর অকালমৃত্যু, শ্রীনন্দাকে তার গবেষণা-তত্ত্বাবধায়কের বিরক্ত করা, শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে তার দ্বিতীয় বিবাহের উদ্যোগ, তার শাশুড়ি মানসীর বিবাহ বহির্ভূত আকস্মিক ক্ষণস্থায়ী প্রেম, শ্রীনন্দার দ্বিতীয় বিবাহের ও কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্তগ্রহণ।

‘অ্যালবাট্রস’ উপন্যাসের প্রধান ঘটনাক্রম: মিস ব্যানার্জি মানসিকভাবে অসুস্থ ও চিকিৎসাধীন, তার স্মৃতিতে বারবার ধরা দেয় পদ্মিনীমাসির তথাকথিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনকাহিনি, যা পদ্মিনীমাসিই তাকে বলেছে। পদ্মিনীমাসির জীবনকাহিনির মধ্যেও আছে বিভিন্ন ঘটনা। শেষে মিস ব্যানার্জি সুস্থ হয়।

এছাড়া, ‘শনি-রবি’ ও ‘মায়া রয়ে গেল’ উপন্যাসদুটি পারিবারিক হওয়ায় ঘটনার ঘনঘটা লক্ষ করা যায়।

কাহিনি প্রসঙ্গে যেকথাটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে, তা হল এই যে, কাহিনিতে কোনো একটি ঘটনার অবস্থান ও গুরুত্ব অনুসারে মুখ্য ঘটনা ও গৌণ ঘটনাকে আখ্যানতাত্ত্বিক সেমুর চ্যাটম্যান বলেছিলেন যথাক্রমে ‘কার্নেল’ (kernel) ও ‘স্যাটেলাইট’ (satellite)। রলাঁ বার্থের পরিভাষা অনুযায়ী এই দুটি হল যথাক্রমে ‘cardinal function’ বা ‘nucli’ এবং ‘catalyser’।

> ‘কার্নেল’-কে চ্যাটম্যান বলেছেন আখ্যান-কাঠামোর প্রেক্ষিতে এমন এক আখ্যান মুহূর্ত, যা মোড় ফেরানো বা গ্রন্থি স্বরূপ, যেখানে দুই বা তার অধিক অভিমুখে কাহিনির অগ্রগতির সম্ভাবনা তৈরি হয়, এবং যে-কোনও একটি অভিমুখে কাহিনির অগ্রগমন ঘটে।[৬]

সন্দর্ভের অষ্টম অধ্যায়ে আমরা উক্ত “দুই বা তার অধিক অভিমুখে কাহিনির অগ্রগতির সম্ভাবনা” এবং শেষ পর্যন্ত “একটি অভিমুখে কাহিনির অগ্রগমন”-এর সার্থকতা বিশ্লেষণ করব। দশম অধ্যায়ে অনুসন্ধান করব সংশ্লিষ্ট ভাবাদর্শ।

৭.৩.৩. বাচনের প্রকৃতি

এবার বুঝে নেবার পালা উপরোক্ত বিষয়গুলি বিভিন্ন উপন্যাসের বাচনে কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বাচন হল কাহিনির উপস্থাপন। আমরা নবনীতার সাহিত্যে সেই উপস্থাপনার শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করব। আখ্যানকৌশল অন্বেষণ বলতে বাচনের প্রকৃতি অন্বেষণকেই মূলত বোঝায়।

৭.৩.৩.১. স্থান বা পটভূমি নির্বাচন

আখ্যানে স্থানের বহুস্তরিকতাকে নির্দেশ করতে গিয়ে আখ্যানতাত্ত্বিক রায়ান পাঁচ রকম স্থানের কথা বলেছেন। এগুলি হল[৭] –

(ক) স্থানিক কাঠামো (spatial frame): ঘটনার আশু স্থান; যেমন – রান্নাঘর, বৈঠকখানা।

(খ) সংস্থান (setting): ঘটনার সামাজিক-ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পরিবেশ; যেমন – কলকাতা শহর।

(গ) কাহিনি-স্থান (story-space): বাচনে উল্লিখিত হলেও, যে-স্থানে কাহিনির কোনো ঘটনা ঘটেনি।

(ঘ) আখ্যান-বিশ্ব (narrative world): কাহিনির সমস্ত ঘটনার ক্ষেত্র ও সমস্ত চরিত্রের বিচরণ ক্ষেত্র।

(ঙ) আখ্যান-মহাবিশ্ব (narrative universe): উপরোক্ত আখ্যান-বিশ্ব এবং চরিত্রদের যাবতীয় অপূর্ণ ইচ্ছা, অবাস্তবায়িত পরিকল্পনা, অধরা স্বপ্ন মিলে তৈরি করে আখ্যান-মহাবিশ্ব।

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা কেবলমাত্র প্রথম দুই প্রকার স্থানের ওপর জোর দেব। তৃতীয় প্রকার স্থান অনালোচিত থাকবে। কারণ এটি আখ্যানে, অন্তত নবনীতার সাহিত্যে, কোনো বিশেষ অবদান রাখেনি। শেষ দুই প্রকার স্থান, অর্থাৎ আখ্যান-বিশ্ব ও আখ্যান-মহাবিশ্ব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে সন্দর্ভের অষ্টম অধ্যায়ে।

নবনীতা দেবসেনের উপন্যাসে চরিত্রের মনোজগৎ উদ্ঘাটনের স্বার্থে পটভূমি কখনো কখনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। যেমন –

'আমি অনুপম' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক ঝড়ের প্রাক্‌মুহূর্তের যে প্রাকৃতিক পটভূমি নির্মাণ করেছেন, তা আসলে অনুপমের আভ্যন্তরীণ ঝড় এবং সেই সঙ্গে অখন্ড নিখিল বিশ্বভুবনের বিপুলতার নিরিখে অনুপমের স্বীয় অস্তিত্বের তুচ্ছতার বোধের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছে –

> কী বিপুলতা। কী অবকাশ। কত নক্ষত্র। গ্রহতারায় পরিপূর্ণ অপার অখন্ড নিখিল বিশ্বভুবন, এই অবিকার, অনিবার্য, অনতিক্রম্য, নিসর্গনির্দিষ্ট ব্রহ্মাণ্ড বিস্ময় – চরাচরব্যাপী প্রবল চন্দ্রালোকে যেন সহসা অনুপমের শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে চাইল। ... গ্রহগ্রহান্তরে পরিব্যাপ্ত এই ত্রিভুবন পরিকীর্ণ সংগতির মধ্যে শুধু তিনিই মূর্ত অসংগতি। কী দৈন্য? কী তুচ্ছতা। ... জোরে ঝড় উঠল। অনুপমের মুখে অকস্মাৎ আছড়ে পড়ল কাঁকর মেশানো ঝোড়ো বাতাসের শীতল প্রবল চাবুক।[৮]

উপন্যাসের বিষয় (দ্র. ৭.৩.২.১)-এর সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেছে উপরোক্ত পটভূমি। কারণ, অনুপমের মানসিক ঝড় তথা আত্মগ্লানিকে প্রতীকায়িত করেছে এমন এক প্রাকৃতিক দৃশ্যপট। সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রকাশক চিত্রকল্প বিশ্লেষিত হয়েছে (দ্র. ১.৩.২.৬.৩)। সেখানেও আমরা দেখেছি, কীভাবে প্রাকৃতিক পটভূমি একজন বিশ্বাসঘাতক পথপ্রদর্শকের বিবেকদংশনকে সূচিত করে।

এছাড়াও, এই উপন্যাসে নির্বাচিত স্থান হিসেবে ধরা দিয়েছে কলকাতা শহরের বিভিন্ন জায়গা। যেমন - অনুপমের বাড়ি, এ বি সি ক্লাব, কমলকলির বাড়ি, সৌগতর বাড়ি, ডাক্তারের চেম্বার, বার, গঙ্গার ধার। এই সবকটি জায়গাই উপন্যাসে অনুপমের আত্মবিশ্লেষণের

পটভূমিরূপে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। এইসব স্থানে অনুপমের অবস্থানের সাথে তাল মিলিয়ে তাঁর মানসিক টানাপোড়েন আমাদেরকে অনুপম চরিত্রটিকে বুঝতে অনেকখানি সাহায্য করে।

'অভিজ্ঞান' উপন্যাসেও পটভূমি আসলে পারিবারিক বৃত্তে সমকামিতার মতো বিষয়কে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে অংশুমালার যাবতীয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-উদ্বেগকে অতিক্রম করতে পারার অনুভূতিকে ব্যক্ত করে –

> খুব ধীরে ধীরে সকাল হচ্ছে। অংশুমালা স্থির হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে, অন্যমনস্ক চোখ মেলে রেখেছেন সামনের ভাঙা বাড়িটার স্তূপীকৃত রাবিশের দিকে। কী ভাবে তৈরি বাড়িটাকে হাতুড়ির ঘা মেরে মেরে ভাঙল এরা! শক্তপোক্ত, আস্ত বাড়ি, সহজে ভাঙেনি, গুঁড়ো হতে চায়নি বাড়িটা। বাধা দিচ্ছিল ভিতর থেকে। জমির ভিত থেকে জোর করে টেনে নিচ্ছিল গাছের মতো। তবু ভেঙে গেল। ...
>
> ভাঙা বাড়িটার হতমান চূর্ণাবশেষের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন অংশুমালা। সূর্য দেখা দিচ্ছেন মিত্র কুটিরের সবুজ পাতাগুলোর পিছনে। রং ধরছে আকাশের গায়ে।[৯]

এই চিত্রকল্প আসলে পুরনো ধ্যান-ধারণাকে শিকড় থেকে উপড়ে ফেলে নতুনের অভ্যুদয় তথা নতুন প্রজন্মের হাতছানিতে অংশুমালার সাড়া দেওয়াকে দ্যোতিত করছে।

'দ্বিরাগমন' উপন্যাসে ধরা দিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ার জঙ্গলে ট্রী-হাউজের নির্জনতা। সেই নৈসর্গিক নির্জনতায় রাত্রিবাস দুজন প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় পৌঁছে যাওয়া নরনারীকে ক্ষণকালের জন্য অতীত-ভবিষ্যৎ ভুলিয়ে দিয়ে পরস্পরকে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে দিয়েছে। পটভূমি সৃষ্টি করেছে ম্যাজিক-মুহূর্তের।

তবে স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে আরেকটি কথা উল্লেখের দাবি রাখে। অধিকাংশ উপন্যাসের এবং কোনো কোনো গল্পেরও একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, এগুলিতে বারবার আসে স্বদেশ ও বিদেশের সমান্তরাল উপস্থিতি। স্বদেশ বা বিদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট সুন্দর স্থানের বিবরণ পাঠককে ভ্রমণতুল্য মনোরম অভিজ্ঞতা দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'ঘূর্ণি', 'দ্বিরাগমন',

কিংবা ‘স্বভূমি’ উপন্যাসের নাম করা যায়। শুধু প্রাকৃতিক শোভাই নয়, অনেকসময় ‘বামা-বোধিনী’-র মতো উপন্যাসে এসেছে বিদেশের বিখ্যাত লাইব্রেরীর বিবরণ।

৭.৩.৩.২. কাল বিষয়ক চিন্তা

৭.৩.৩.২.১. অতীতচারিতা বা ‘ফ্ল্যাশ ব্যাক’ পদ্ধতি

অতীতচারিতা বা ‘ফ্ল্যাশ ব্যাক’ পদ্ধতি সব উপন্যাসেই কম-বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে সীমিত সময়কে অবলম্বন করে উপন্যাস রচিত হলেও তার পরিসর অনেকখানি ছড়িয়ে পড়েছে। এই পদ্ধতিতে সময়ের যাতায়াত উপন্যাসে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, তা ‘অভিজ্ঞান’ উপন্যাসের সাপেক্ষে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এই উপন্যাসে নিম্নরূপে সময়ের বিপর্যাস লক্ষ করা যায় –

১ম থেকে ৩য় পরিচ্ছেদ – বর্তমান সময় (সমকামীরূপে পুষ্পার আত্ম-আবিষ্কারের প্রাথমিক পর্যায়, লেখিকা অংশুমালার নারীত্বকে এক শ্রেণীর পাঠকের কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ)

৪র্থ পরিচ্ছেদ – অতীত সময় (অংশুমালা, মলয়, সঞ্জু, রবি, মালিনী, ওয়েন্ডি সম্পর্কে পুরনো দিনের কথা পাঠককে স্মরণ করানো, যা আসলে ‘বামা-বোধিনী’ উপন্যাসে দেখা গিয়েছিল)। তারপর অতীত থেকে বর্তমানে গড়িয়ে আসে কাহিনি (অংশুমালা, সঞ্জু, রবি, মালিনীর বর্তমান অবস্থা জানানো হয়েছে)

৫ম পরিচ্ছেদ – অতীত সময় (অশীতিপর বৃদ্ধা ওয়েন্ডির জীবনব্যাপী কারেজ আর স্পিরিটের কথা, যার অনেকটাই ‘বামা-বোধিনী’ উপন্যাসে পাওয়া গিয়েছিল)

৬ষ্ঠ থেকে ৯ম পরিচ্ছেদ – বর্তমান সময় (পুষ্পার সেক্সুয়াল প্রেফারেন্স নিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরে সমস্যা)

১০ম পরিচ্ছেদ – বর্তমান সময়ের মধ্যে বিগর্ভিত অতীত সময় (পুষ্পার সেক্সুয়াল প্রেফারেন্সের সঙ্গে আগের প্রজন্মের অংশু, সঞ্জয়, রবি, মলয়ের সেক্সুয়াল প্রেফারেন্স ও সেগুলির পরিণতি মিলিয়ে দেখা)

সময়ের এই বিপর্যাস নিঃসন্দেহে উপন্যাসের বিষয়গত উদ্দেশ্যকে সফল করেছে। বর্তমান সময়ের ফাঁকে ফাঁকে অতীতচারিতা কার্যত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সমকামিতার প্রবহমান ধারাকে সূচিত করেছে। শুধু তাই নয়, এই পদ্ধতির প্রয়োগ পাঠককে যেহেতু বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় 'বামা-বোধিনী' উপন্যাসের ঘটনাক্রম, তাই উভয় উপন্যাস ('বামা-বোধিনী' ও 'অভিজ্ঞান') জুড়ে মুখ্যচরিত্র অংশুমালার একটি সার্বিক অভিযোজন পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট হয়। অংশুমালার সেই অভিযোজন হল, 'বামা-বোধিনী' এবং 'অভিজ্ঞান' উপন্যাসে যথাক্রমে তার প্রেমিক রবির সমপ্রেম এবং কন্যাসম পুষ্পার সমপ্রেমকে নিরীক্ষণের ফলে ব্যক্তিগত জীবনে সমপ্রেমের অস্তিত্বকে সহজে মেনে নেওয়ার সদর্থক অভিযোজন, যা লেখিকার নারীবাদের ভাবাদর্শকে উজ্জ্বল করে। কারণ, নারীবাদের অন্যতম লক্ষ্য সমপ্রেমের স্বীকৃতি। এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে সন্দর্ভের দশম অধ্যায়ে (দ্র. ১০.৩.১.৪)।

৭.৩.৩.২.২. একই সময়ে বিভিন্ন স্থান এবং একই স্থানে বিভিন্ন সময়

সময় সংক্রান্ত আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার প্রকাশ নবনীতা দেবসেনের উপন্যাসের আখ্যানকৌশলে দেখা গেছে। একটি হল একই সময়ে বিভিন্ন স্থান বদলে চরিত্রদের মানসিকতা ও মূল্যবোধকে ফুটিয়ে তোলা এবং আরেকটি হল একই স্থানে সময় বদলে দিয়ে চরিত্রের

মানসিক সংঘাতকে তুলে ধরা। প্রথমটির সন্ধান পাওয়া যায় 'স্বভূমি' উপন্যাসে এবং দ্বিতীয়টির সন্ধান আছে 'ফিনিক্স' উপন্যাসে। 'স্বভূমি'-তে আলোর প্লেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর আসার অব্যবহিত আগের ও পরের মুহূর্তকে ধারণ করে আছে সমগ্র উপন্যাস। এই একই সময়ে তিনটি ভিন্ন দেশে থাকা আলোর বাবা-মা, আলোর স্বামী-কন্যা এবং আলোর ভাই পৃথক পৃথকভাবে আলোকে নিয়ে উদ্বেগ মিশ্রিত স্মৃতিচারণায় মগ্ন। তাদের এই ভাবনার মধ্য দিয়েই ধরা দেয় বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মানসিকতা ও মূল্যবোধ।

অপরদিকে 'ফিনিক্স' উপন্যাসে একই কলকাতা শহরে বিপাশার আজন্ম চেনা মানুষগুলো সময়ের ব্যবধানে বদলে গেছে। সেইসঙ্গে আমূল বদল ঘটেছে তার চিরপরিচিত ভালোবাসার মানুষটির আচরণেও, তাদের পারস্পরিক সহজ নৈকট্যে ভাঙন ধরিয়েছে দীর্ঘদিনের অদেখা আর ভুল বোঝাবুঝি। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বিপাশার নিরন্তর মানসিক সংঘাত বদলে দিয়েছে তার ভবিষ্যৎ জীবনের রূপরেখা। বিপাশার জীবন যেমন হতে পারত এবং শেষ পর্যন্ত যেমন হল, এই দুইয়ের মাঝে যে আখ্যানকৌশলের মোচড় আছে, তাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে গবেষণা সন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়ে।

৭.৩.৩.২.৩. সময়ের পৌনঃপুনিকতা

ঘটনার পুনরাবৃত্তি সময়ের পৌনঃপুনিকতা তৈরি করে। কিন্তু অনেকসময় হুবহু একই ঘটনার পরিবর্তে সমজাতীয় ঘটনা পুনরাবৃত্ত হতে দেখা যায়। তখন এই সাদৃশ্যধর্মিতার জন্যই ঘটনাগুলির ধরন পুনরাবৃত্তিমূলক হয়। এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে 'বামা-বোধিনী' উপন্যাসে। এই উপন্যাসের বাচনে যে কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে, সেখানে পাওয়া যায় দেবী সরস্বতী, সীতা, রামায়ণ-রচয়িতা চন্দ্রাবতী, উপন্যাসের মুখ্যচরিত্র অংশুমালা, গৌণচরিত্র কমলাম্মার সঙ্গে

ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা। আর সেই পরস্পর সদৃশ প্রত্যেকটি ঘটনার সাদৃশ্য তৈরি করেছে ঘটনাগুলির সাধারণধর্মের মাধ্যমে। সেই সাধারণধর্মটি হল পুরুষ কর্তৃক নারীর অপমান।

যুগের পর যুগ ধরে পুরুষ কর্তৃক নারীর অপমানের ঘটনার এইরূপ পুনরাবৃত্তি নিশ্চিতরূপে পাঠকমনে উৎকণ্ঠা তৈরি করে। কিন্তু সেই উৎকণ্ঠাকে প্রশমিত করেছে কাহিনির পরিণতি। অংশুমালা নিজের কর্মজগতে আত্মনিবেদন করেছে। শুধু অংশুই নয়, নিজকর্মে আত্মনিবেদনের মাধ্যমে আত্মমর্যাদার পথ বেছে নিয়েছে পূর্বোক্ত নারীরাও।

সুতরাং, সমজাতীয় ঘটনা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে সময়ের পৌনঃপুনিকতা এই উপন্যাসে একইসঙ্গে নারীবাদ এবং জীবনের সমস্ত তুচ্ছতা, অপ্রাপ্তিকে সরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলার ভাবাদর্শকে প্রতিষ্ঠা দিতে সহায়তা করেছে।

৭.৩.৩.৩. প্লট নির্বাচন

উপন্যাসের প্লট হতে পারে সরল, জটিল কিংবা যোগিক ধরনের। সাধারণভাবে বলা যায়, সরল প্লটের উপন্যাসে একটি কাহিনিরই উদ্ভব, বিবর্তন ও পরিণতি ঘটে। প্রত্যেক ঘটনাকে আগের ঘটনার অনিবার্য ফল বলে মনে হয়। জটিল ও যৌগিক প্লটে থাকে একাধিক কাহিনি। তবে জটিল প্লটে সেই একাধিক কাহিনির মধ্যে একটি কাহিনিই হয় প্রধান এবং অন্যান্য কাহিনি হয় প্রধান কাহিনির শাখা কাহিনি বা উপকাহিনি। এক্ষেত্রে প্রধান কাহিনির সাপেক্ষে শাখা কাহিনি বা উপকাহিনি সৃষ্টির তাৎপর্য কতখানি, তা বিবেচনাধীন হয়। প্রধান কাহিনিকে স্ফুটতর করে তুলতেই অপ্রধান কাহিনির চরিত্রদেরকে মূল কাহিনির চরিত্রদের বৈপরীত্যে বা সমর্থনে গড়ে তোলা হয়। অপ্রধান কাহিনিতে ধরা দেয় মূল কাহিনির সাপেক্ষে স্থানগত বা কালগত বৈচিত্র্য। অন্যদিকে যৌগিক প্লটে যে একাধিক কাহিনি থাকে সেগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সমান্তরাল। এখানে প্রতিটি কাহিনিই স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অভিন্ন উপন্যাসের কাহিনি হবার যোগ্যতা রাখে।

এইরকম প্লট নির্মাণের সার্থকতা পাওয়া যায় সাধারণত চরিত্রপ্রধান উপন্যাসের চরিত্রের সামগ্রিক জীবনবোধের উদ্ঘাটনে অথবা বিভিন্নতার মধ্যে সাদৃশ্যের অনুভূতি সঞ্চারে। সুতরাং, কোনো এক বিশেষ তাৎপর্যে যৌগিক প্লটের কাহিনিগুলি পরস্পর সংবদ্ধ থাকে।

নবনীতা দেবসেনের যে দশটি উপন্যাস বর্তমান গবেষণার জন্য নির্বাচন করে হয়েছে, সেগুলির মধ্যে 'আমি অনুপম' উপন্যাসে দেখা গেছে যৌগিক প্লট। এই উপন্যাসে একদিকে আছে অধ্যাপক হিসেবে ছাত্র সমীরদের আন্দোলনে অনুপমের সহযোগিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করার কাহিনি এবং অন্যদিকে আছে পরস্ত্রী কমলকলির সঙ্গে অনুপমের সম্পর্কের কাহিনি। এই দুই কাহিনিস্রোত পরস্পর বিচ্ছিন্ন। দুটিতেই সাধারণ চরিত্র হিসাবে আছেন অনুপম। আসলে দুটি পৃথক স্বাদের কাহিনি অনুপমের চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে দুটি ভিন্ন দিক থেকে উপস্থাপন করেছে। শেষ পর্যন্ত উভয় কাহিনিই যেন একযোগে অনুপমের চারিত্রিক শৈথিল্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

'ফিনিক্স' উপন্যাসে এসেছে জটিল প্লট। এখানে প্রধান কাহিনি বিপাশার জীবনের গতিপথকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। এর শাখা কাহিনিরূপে এসেছে বিপাশার মেয়ে রোহিণীর বেড়ে ওঠার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। উভয় কাহিনির কালগত পার্থক্য আছে। প্রজন্মগত ব্যবধানের ফলে চিন্তাভাবনার গুণগত তফাৎ ঘটে যায় মা ও মেয়ের মধ্যে। কিন্তু রোহিণীর সাফল্যের কাহিনি শেষ পর্যন্ত বিপাশার জীবনদর্শনকেই কৃতিত্ব দেয়। সুতরাং, শাখাকাহিনি মূল কাহিনিকেই প্রকারান্তরে পরিপুষ্টি প্রদান করেছে।

'স্বভূমি' এবং 'বামা-বোধিনী' উপন্যাসে আছে সরল কাহিনি। দুটি উপন্যাসে যথাক্রমে বিধৃত হয়েছে আলো এবং অংশুমালা কাহিনি। এছাড়া উপন্যাসগুলিতে আরও কয়েকটি কাহিনির আভাস পাওয়া যায় বটে, তবে সেগুলি আভাসমাত্র, স্বতন্ত্র বিস্তৃত কাহিনি হতে পারেনি। যেমন – 'স্বভূমি' উপন্যাসে মায়ার বিবাহ পূর্ববর্তী জীবন, ফ্রেডরিকের পারিবারিক

কাহিনি, ল্যারির শৈশবের কাহিনি। 'বামা-বোধিনী' উপন্যাসে আছে কমলাম্মার জীবনকাহিনির আভাস। এগুলিকে ছায়াকাহিনি বলা যায়।

'অভিজ্ঞান' উপন্যাসে এসেছে অংশুমালা, রবি, সঞ্জয় ও মালিনীর পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণজনিত একটি উপকাহিনি। মূলকাহিনি হল পুষ্পাঞ্জলির সমপ্রেমের কাহিনি। মূলকাহিনির ভিতরে ভিতরেই ঔপন্যাসিক বুনে দিয়েছেন উপকাহিনিকে, যা মূলকাহিনিকে পরিপুষ্টতা দিয়ে চলেছে। ক্ষণে ক্ষণে এই উপকাহিনির উপস্থিতি না থাকলে, একদিকে সঞ্জয়ের সমকামী প্রবণতা কীভাবে তার মেয়ে পুষ্পাঞ্জলির মধ্যে অজান্তে বাহিত হয়ে যায় এবং অন্যদিকে প্রজন্মগত ব্যবধান কীভাবে সমকামিতাকে মেনে নেবার ক্ষেত্রে অন্তত পারিবারিক পরিসরকে কিছুটা নমনীয় করে দেয়, সেই রহস্য পাঠকের কাছে অধরা থাকত।

'শনি-রবি' যৌগিক প্লটের উপন্যাস। একটি পদ্মাবতীর কাহিনি, অপরটি শ্রীময়ীর কাহিনি। দুটির মধ্যে আপাতভাবে কোনো সংযোগ নেই ঠিকই, কিন্তু কাহিনি দুটির পরিণাম লক্ষ করলে বোঝা যায়, এরা পরস্পর বিপরীতধর্মী। শ্রীময়ীর জীবন অন্ধকার থেকে আলোর অভিমুখী কিন্তু পদ্মাবতীর জীবন আলো থেকে ক্রমশ অন্ধকারে নিমজ্জিত। মানবজীবনের এই সম্ভাব্য দুই বিপরীতমুখী পরিণতি প্রদর্শনেই এই উপন্যাসের প্লট নির্বাচনের সার্থকতা।

নির্বাচিত বাকি চারটি উপন্যাস অর্থাৎ 'মায়া রয়ে গেল', 'অ্যালবাট্রস', 'ঘূর্ণি' এবং 'দ্বিরাগমন' উপন্যাসে গৃহীত হয়েছে জটিল প্লট। চারটি উপন্যাসের প্রধান চারটি কাহিনি হল যথাক্রমে সুরমা-আদিত্য-শিলাদিত্যের কাহিনি, পদ্মিনীর জীবনকাহিনি, রিমঝিম- ঋতবানের ব্যতিক্রমী দাম্পত্য সম্পর্কের কাহিনি এবং শ্রীনন্দার কাহিনি। এই চারটি উপন্যাসের অপ্রধান কাহিনিগুলি হল যথাক্রমে সুষমা-প্রসেনজিতের দাম্পত্য কাহিনি, মিস ব্যানার্জির জীবনকাহিনি, আদিত্য-ভাস্বতীর দাম্পত্যজীবনের কাহিনি এবং মানসী- নীলাঞ্জনের প্রৌঢ় বয়সের আকস্মিক

প্রেমের কাহিনি। এইসব গৌণ কাহিনি মূলকাহিনিকে কখনো সমর্থন ক'রে, কখনো-বা বৈপরীত্য সৃষ্টি ক'রে উপন্যাসের বক্তব্যকে সুদৃঢ় করেছে।

৭.৩.৩.৪. কথনরীতি

আখ্যানের অন্তর্গত কোনো ঘটনা, ব্যক্তি, বস্তু ইত্যাদিকে যে নিরীক্ষণ করে, সে-ই হল নিরীক্ষক। এই নিরীক্ষক সংশ্লিষ্ট আখ্যানের সাপেক্ষে কেমন ভূমিকা পালন করছে, তার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় আখ্যানের প্রেক্ষিত এবং কথনরীতি। স্ট্যানজ়েল (Stanzel) প্রদর্শিত এই সংক্রান্ত ধারণা[১০] সারণির সাহায্যে নিচে দেখানো হল –

আত্মকথন:	নিরীক্ষক একই সঙ্গে কথক এবং কাহিনীতলে অবস্থান করে। ফলে অন্তঃপ্রেক্ষিত গড়ে ওঠে।
সর্বজ্ঞকথন:	নিরীক্ষকই কথক কিন্তু সে কাহিনীতলে অবস্থান করে না। ফলে বহিঃপ্রেক্ষিত গড়ে ওঠে।
ভূমিকানুগ কথন:	এ ক্ষেত্রে নিরীক্ষক কখনও কথক, কখনও কাহিনীতলের কোনো চরিত্র বা ভূমিকা। কথক কাহিনীতলে অবস্থান করে না। ফলে কথকের বহিঃপ্রেক্ষিত এবং কাহিনীতলের ভূমিকাদের অন্তঃপ্রেক্ষিত দিয়ে গড়ে ওঠে ভূমিকানুগ কথন। ফলত অন্তঃপ্রেক্ষিত ও বহিঃপ্রেক্ষিতের অনবরত বিনিময় চলতে থাকে।

আর আছে চেতনাপ্রবাহমূলক পদ্ধতি, যা ভূমিকানুগ কথনেরই একটি মাত্রা। 'উপন্যাস পাঠের ভূমিকা' গ্রন্থে শিশির চট্টোপাধ্যায় এই পদ্ধতির যে ভাষাবৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করেছেন, সেগুলি নিম্নরূপ –

ক) তির্যক বাক্‌বিন্যাস বা Oblique writing,
খ) অনুচ্চ বচঃপ্রবৃত্তি বা Mental prattle,
গ) স্বগতোক্তি, অর্থাৎ Soliloquy, এবং
ঘ) অনুচ্চারিত আত্মকথন বা Internal monologue [১১]

নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে প্রধানত আত্মকথন, ভূমিকানুগ কথন এবং মিশ্রকথন রীতির প্রয়োগ দেখা গেছে এবং নিরীক্ষণও হয়েছে সেই অনুযায়ী।

৭.৩.৩.৪.১. ভূমিকানুগ কথন

'আমি অনুপম' উপন্যাস শুরু হচ্ছে নিম্নরূপে –

> না, এবার ফিরতেই হয়।
> কমলকলির এলোচুলের পিছনে পাশবদ্ধ বাঁ হাতের মণিবন্ধটি একটু উঁচু করে দেখে নিলেন তিনি – সাড়ে ন'টা বাজে।[১২]

ওপরের অংশ থেকে বোঝা যাচ্ছে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে ভূমিকানুগ কথনরীতিতে। প্রথম বাক্য থেকে স্পষ্ট যে কাহিনির অন্তর্গত চরিত্র বা ভূমিকার নিরীক্ষণবিন্দু ব্যবহৃত হয়েছে। গোটা উপন্যাসের কাহিনিতলে ভূমিকার (অনুপমের) নিরীক্ষণ গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু চরিত্রটি কথক নয়। দ্বিতীয় বাক্যেই তা স্পষ্ট। কথক কাহিনিতলে অবস্থান করছে না। ফলে অন্তঃপ্রেক্ষিত ও বহিঃপ্রেক্ষিতের অনবরত বিনিময় চলতে থাকে এই উপন্যাস জুড়ে।

ভূমিকানুগ রীতির শর্ত মেনেই মুক্ত পরোক্ষ চিন্তন (Free Indirect Thought বা FIT) পদ্ধতি প্রযুক্ত হতে দেখা যায় –

> সরকার স্টার্ন অ্যাটিচ্যুড নিলে অনুপম কি স্টার্নার অ্যাটিচ্যুড নিতে পারেন না? না। পারেন না। আফটার অল, তিনি ব্যক্তিমাত্র, ওনলি অ্যান ইনডিভিজুয়াল। তিনি তো একটা ইনস্টিট্যুশন নন।[১৩]

এভাবে আমরা অনুপমের চেতনাস্রোত বুঝতে পারি। ভূমিকানুগ কথনেরই একটি মাত্রা চেতনাপ্রবাহমূলক রীতি (stream of consciousness)[১৪]। বলা বাহুল্য, উপন্যাসে বারবার চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির ব্যবহার অনুপমের মনস্তাত্ত্বিক পরিসর নির্ধারণে সহায়তা করে। এর আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই অধ্যায়েরই অন্যত্র পাওয়া যাবে (দ্র. ৭.৩.৩.৬)।

ভূমিকানুগ কথনরীতি অবলম্বন করা হয়েছে বলেই কথকের সাথে সাথে পাঠকও কাহিনির অন্তর্বহিঃপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে অনুপমের মনের গতি প্রকৃতি বুঝতে পারেন। কথকের বহিঃপ্রেক্ষিতের সঙ্গে ভূমিকার (বিশেষত অনুপমের) অন্তঃপ্রেক্ষিতের বিনিময় ঘটেছে অনবরত। এই প্রক্রিয়ায় গোটা উপন্যাস জুড়ে অনুপম চরিত্রের প্রমুখন (foregrounding) হয়েছে, যা উপন্যাসের কথাবস্তুকে সার্থক করেছে। অনুপমের আত্মগরিমা কতখানি সঙ্গত আর কতখানি শূন্যগর্ভ, সেটিই উপন্যাসের কথাবস্তু। অনুপম চরিত্রের প্রমুখনের আরও একটি প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করা হয়েছে সন্দর্ভের নবম অধ্যায়ে।

৭.৩.৩.৪.২. মিশ্রকথন

দশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত 'অভিজ্ঞান' উপন্যাসে প্রথম ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে মূলত সর্বজ্ঞ কথন, চতুর্থ ও দশম পরিচ্ছেদে সর্বজ্ঞ কথনের ফাঁকে ফাঁকে বিগর্ভিত (embedded) ভূমিকানুগ কথন এবং বাকি ছ'টি পরিচ্ছেদে ভূমিকানুগ কথন রীতি অনুসৃত হয়েছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, সর্বজ্ঞ কথন এবং বিগর্ভিত ভূমিকানুগ কথন রীতিতে রচিত এই উপন্যাস। অতএব মিশ্ররীতির কথন। এর ফলে পাঠক সর্বজ্ঞকথকের সঙ্গে কাহিনির বহিঃপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে নিজের সামাজিক অবস্থান থেকে প্রত্যেকটি চরিত্রকে দেখতে পারে। আবার বিগর্ভিত ভূমিকানুগ কথন রীতি সেই পাঠককে অন্তর্বহিঃপ্রেক্ষিতে হাজির করে ব'লে সংশ্লিষ্ট চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, চেতনাপ্রবাহ অনেক বেশি অনুধাবনযোগ্য হয়ে ওঠে। যেহেতু সমাজ-মানসিকতায় এবং ব্যক্তি-মানসিকতায় সমকামিতার স্বীকৃতি কিংবা অস্বীকৃতি উপন্যাসের বিষয়বস্তু, তাই দুই ধরনের কথনরীতির প্রয়োগ কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে।

ভূমিকানুগ কথনে নির্বাচিত ভূমিকা বেশিরভাগ সময় অংশুমালা। দুয়েকটি জায়গায় অন্যান্য চরিত্র, যেমন – নবম পরিচ্ছেদে সৌম্যর ভূমিকায় কথন পাওয়া যায়।

৭.৩.৩.৪.৩. আত্মকথন

আত্মকথনরীতির দৃষ্টান্ত হিসাবে 'স্বভূমি' উপন্যাসের নাম করা যায়। এইসব আত্মকথন হল ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছেদে পাঁচটি চরিত্রের আত্মকথন। দুটি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হল –

আলোর মেয়ে লালীর কথায়,

> মা'র সঙ্গে তো এই নিয়েই আমার ঝগড়া। বাংলা বলতে হবে, শাড়িও পরতে হবে, কলকাতাকে ভালোবাসতেই হবে – এ কী জুলুম? এ যে অত্যাচার! তোমার সেটা জন্মভূমি হতে পারে আমার তো নয়। ... মা শুনবে না। লাভ মি, লাভ মাই সিটি।[১৫]

আলোর স্বামী ফ্রেডরিকের কথায়,

> আলো তবুও ঈশ্বরে বিশ্বাস করবেই। অত বুদ্ধিমতী মেয়ের এই দিকটা আমি সত্যি বুঝতে পারি না। আলোর প্লেন যদি হাইজ্যাক হয় তবে সে নির্ঘাত সত্যের ও ন্যায়ের হয়ে যুদ্ধ করতে যাবে, যাবেই, এবং প্রাণটি খোয়াবে, খোয়াবেই। প্রাণের ভয় বলে কিছুই নেই যে আলোর – যা দুর্দান্ত দস্যি মেয়ে সে।[১৬]

এই উপন্যাসে প্রকৃতপক্ষে আত্মকথনের যৌগিক রীতি দেখা গেছে, যেখানে প্রত্যেকের কথনেই বারবার একটি চরিত্র বা ভূমিকা প্রকট হয়েছে। সেই চরিত্রের নাম আলো। অথচ আলোর কোনও কথন উপন্যাসে দেখা যায়নি। অন্য পাঁচজন কথক ও নিরীক্ষকই তাকে প্রধান চরিত্র বা মুখ্য ভূমিকায় পরিণত করেছে।

নবনীতার এমন অনেক গল্প আছে, যেখানে তিনি স্বনামে কাহিনির প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ। সেইসব গল্পে খুব স্বাভাবিকভাবেই আত্মকথন রীতির ব্যবহার দেখা যায়। নাট্যারম্ভ, পরীক্ষা, মসিয়ে হুলোর হলিডে, জরা হটকে জরা বাঁচকে ইয়ে হ্যায় নোবেল মেরি জান, 'সীতা

থেকে শুরু'র মাতৃয়ার্কি পর্ব, ভালোবাসা কারে কয় প্রভৃতি গল্পে আত্মকথনের মাধ্যমে নবনীতা তাঁর দীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন সময়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতার টুকরো টুকরো ছবি তুলে ধরেছেন।

৭.৩.৩.৪.৪. কথকবিহীন আখ্যান-পরিস্থিতি

কথকের উপস্থিতি নিয়ে কিছুটা পরীক্ষামূলক বাচনের সন্ধান পাওয়া যায় 'ঘূর্ণি' এবং 'অ্যালবাট্রস' উপন্যাসে। বলাবাহুল্য, এই দুটি উপন্যাসের সার্বিক আবেদন ঔপন্যাসিকের অন্যান্য উপন্যাসের থেকে অনেকটাই ব্যতিক্রমী। আখ্যানের বিষয় (দ্র. ৭.৩.১) এবং প্রযুক্তি (দ্র. ৭.৩.৩.৮.২) আলোচনাকালে আমরা একথা বুঝেছি এবং পরবর্তী অধ্যায়েও তা আবারও স্পষ্ট হবে।

'ঘূর্ণি' উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদ কথকবিহীন। বইটি (মুদ্রণ সাল ২০১৭)-র এগারো পৃষ্ঠা জুড়ে সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদটি সংলাপের আকারে বিধৃত। ঋতবানের স্ত্রী রিমঝিম এবং ভাস্বতীর স্বামী আদিত্যর সংলাপ। দৃষ্টান্ত হিসাবে উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ থেকেই ছোট একটি অংশ নিচে উদ্ধৃত করা হল –

> --যেভাবেই দ্যাখো জীবন কিন্তু একটাই, ইউ হ্যাভ জাস্ট ওয়ান চান্স, এখন জীবনটাকে নিয়ে কে কী করব, আয়ুর রহস্যটাকে কে কীভাবে নাড়াচাড়া করবে, কীভাবে পান করবে জীবনের মদিরা, সেটা তোমার নিজের ওপরে। সেই যে কবি গাহিয়াছেন, ভাঁড়ে কিম্বা রুপোর গেলাসে?
>
> --সর্বদা ভাঁড় যেমন কারও ভালো লাগে না, তেমনি সর্বদা রুপোর গেলাসও সুখপ্রদ নয়।
>
> --বা, দারুণ! সুখপ্রদ? তোমার চয়েস অফ ওয়রডস তো দিনকে দিন ঝলমলিয়ে উঠছে।
>
> --উঠবে না? আমার চয়েস অফ মেন যত ডাল, যত ছায়াময় হচ্ছে, কনকমিট্যান্টলি চয়েস অফ ওয়রডস তত ঝিলিক দিচ্ছে বোধ হয়।
>
> --ডোন্ট টেল মি ইউ আর সরি ফর ইয়োর চয়েস?
>
> --আমি কদাচ আমার কৃতকর্মের জন্য সরি হই না।[১৭]

রিমঝিমের ছকভাঙা জীবনের তথাকথিত সৃষ্টিছাড়া খেয়াল অপ্রত্যাশিতভাবে ঘরছাড়া করেছে রিমঝিম আর আদিত্যকে। তারা দুজনেই নিজেদের জীবনসঙ্গীদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে একে অপরের প্রেমের সাময়িক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। রিমঝিমের জীবনে এমনটা প্রথমবার নয়, সে স্বেচ্ছায় বারবার স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গ উপভোগ করেছে। উপন্যাসের কথকবিহীন মুহূর্ত আসলে রিমঝিমের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যকেই উজ্জ্বল করতে চেয়েছে দু'ভাবে –

প্রথমত, আখ্যানের প্রথাভাঙা এই শৈলী যেন রিমঝিমের ছকভাঙা জীবনের দ্যোতক।

দ্বিতীয়ত, কাহিনির উপস্থাপনায় বাধাহীন গতি প্রদানের লক্ষ্যে কথকের সামান্যতম উপস্থিতিও বর্জন করা হয়েছে। এই গতি প্রকারান্তরে রিমঝিমের জীবনের অনিবার গতিকেই মর্যাদা দেয়।

'অ্যালবাট্রস' উপন্যাসে কথকের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ব্যাপারটা খুব বেশি পরীক্ষামূলক বলে মনে হয়। পাঁচটি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ এই উপন্যাসের কোথাও এসেছে মনরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে চিকিৎসাধীন মিস্ ব্যানার্জির সংলাপ, কোথাও এসেছে মানসিকভাবে অসুস্থ মিস্ ব্যানার্জির অনুচ্চারিত আত্মকথন (internal monologue), আবার কোথাও এসেছে সেই অনুচ্চারিত আত্মকথনের মধ্যে মধ্যে বিগর্ভিত পদ্মিনীমাসি ও মিস্ ব্যানার্জির সংলাপ। সরাসরি সংলাপের পদ্ধতি আসলে আলাদা একজন কথকের অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কাহিনিকাল ও বাচনকালকে সমকালিক (co-temporal) করে দেয়। অন্যদিকে, অসুস্থ মিস্ ব্যানার্জির অনুচ্চারিত আত্মকথনে এসেছে মানসিকভাবে অতীত-বর্তমানে নিরবধি যাতায়াত। সুতরাং, আমরা বুঝতে পারি যে এই উপন্যাসে সময়ের অহরহ বিপর্যাস বা আরও স্পষ্টভাবে বললে সময়ের গোলমাল করে দেওয়ার প্রচেষ্টা আছে। সময়ের এই গোলমাল প্রকৃতপক্ষে মিস্ ব্যানার্জির মানসিক ভারসাম্যহীনতাকে প্রকট করে।

কিন্তু কেন এইরকম কথনশৈলী বেছে নেওয়া হল? আসলে মুখ্য চরিত্র পদ্মিনীর জীবনের যেরূপ ছবি উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে, তাকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে হয় 'উচ্ছৃঙ্খল জীবন'। সেই জীবনশৈলীকে পাঠকের দরবারে অকপটে হাজির করতে গেলে, উপরোক্ত কথনশৈলীর মাধ্যমে সময়ের গোলমালের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আরও বিশ্লেষণ ও আলোচনা রয়েছে সন্দর্ভের দশম অধ্যায়ে (দ্র. ১০.৩.১.৩)।

নিরীক্ষণ বা অভিকেন্দ্রীকরণের আখ্যানকৌশল নবনীতার উপন্যাসে কীভাবে ভাবাদর্শের ধারক হয়ে উঠেছে, সেটিও দশম অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে (দ্র. ১০.৩.১.৮)।

৭.৩.৩.৫. চরিত্রায়ণ

সাধারণভাবে বলা যায়, আখ্যানে কথকের উপস্থাপনার দ্বারাই চরিত্রায়ণ সম্ভূত হয়। কথক নিজের বক্তব্যের দ্বারা কিংবা নিজের বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে চরিত্রের উক্তি সরাসরি উপস্থাপনার দ্বারা চরিত্রায়ণ করে। তবে একটু আগেই যেমনটা দেখলাম, কথকবিহীন আখ্যান বা আখ্যানাংশ, সেখানে চরিত্রায়ণ হয় সরাসরি সংলাপ থেকে। পাঠক বাচনের সেই চরিত্রায়ণ থেকে একেকটি চরিত্রকে নির্মাণ করেন। চরিত্র অর্থাৎ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করার জন্য পাঠকের সহায়ক হয় তাঁর নিজের চারপাশের বাস্তব বিশ্ব থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা।

নবনীতার উপন্যাস মূলত চরিত্রপ্রধান। দেখা গেছে, গৌণ চরিত্রগুলি অধিকাংশ সময়েই একমাত্রিক ও অপরিবর্তিত থেকেছে। তারা বাচনে কম পরিসর নিয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল হয়ে প্রধান চরিত্রের প্রাধান্য বৃদ্ধি করেছে। তাই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রের চরিত্রায়ণকৌশলই আমাদের আলোচ্য।

৭.৩.৩.৫.১. চরিত্রের ক্রিয়ার মাধ্যমে চরিত্রায়ণ

বাচনে চরিত্রায়ণের বিবিধ প্রক্রিয়ার একটি হল চরিত্রের ক্রিয়া। আখ্যানতাত্ত্বিক রিমন-কেনান (Rimmon-Kenan) তাঁর *Narrative Fiction: Contemporary Poetics* গ্রন্থে চরিত্রের ক্রিয়াকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন – কর্ম-সম্পাদন মূলক ক্রিয়া, কর্ম-বর্জনমূলক ক্রিয়া এবং কর্ম-সংক্রান্ত বিবেচনামূলক ক্রিয়া[১৮]। যেমন –

'আমি অনুপম' উপন্যাসে অনুপমের চরিত্রায়ণ হয়েছে তার কর্ম-সম্পাদন মূলক এবং একইসঙ্গে কর্ম-বর্জনমূলক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। বিয়ের সাজে সজ্জিত ভ্রাতৃবধূর ছবি আর সেই সঙ্গে কেবলমাত্র সম্বোধনসূচক শব্দ 'Darling' লেখা একটি অসমাপ্ত মিথ্যে চিঠি ইচ্ছা ক'রে বইখাতার তলায় আলগাভাবে রেখে দিয়েছিলেন অনুপম যাতে সেগুলি মারিয়ার হাতে পড়ে এবং অনুপম খুব সহজেই এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। এই অংশের সংলাপ আমরা লক্ষ করব।

> সামনে হাঁটু মুড়ে বসে, যখন তাঁর কাঁধ দুই হাতে ধরে ঝাঁকাচ্ছে আত্মহারা মারিয়া – 'কেন বলোনি, দেশে তোমার বউ ছিল? কেন বলোনি? কেন? কেন? বলো, কেন বলোনি আমাকে?' তখন কেবলই ছত্রাকার ছড়ানো শার্ট, প্যান্ট, জুতো, খাতা বইগুলো ঝেড়ে বেছে ভাঁজ করে গুছিয়ে সুটকেসে তুলছেন অনুপম 'রয়', আর সংযত, শান্ত, ভদ্র গলায় পুনঃ পুনঃ বলছেন – 'আহাঃ ! হে মধুহৃদয়া, আমার প্রতি কর্ণপাত করো। প্রেয়সী, আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও। লেট মি এক্সপ্লেইন, ডার্লি লিসন টু মি, সুইটহার্ট!'
>
> কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলেন না।[১৯]

অনুপমের ধূর্ত চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে চিনে নিতে পাঠকের ভুল হয় না। প্রথমে 'Darling' লেখা ও চিঠি রাখার কর্ম-সম্পাদন ও পরে প্রকৃত ব্যাখ্যা দেওয়ার কর্ম-বর্জনমূলক ক্রিয়া সংঘটনের দ্বারা চরিত্রায়ণ দেখা যায়।

৭.৩.৩.৫.২. চরিত্রের বাগ্‌ভঙ্গির মাধ্যমে চরিত্রায়ণ

চরিত্রের বাগ্‌ভঙ্গি চরিত্রায়ণের আরেকটি কৌশল। ওপরের উদ্ধৃতিতেই অনুপমের ক্রিয়ার পাশাপাশি ফুটে ওঠে তার বাগ্‌ভঙ্গি, যা পুনরায় তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে। ওই দৃষ্টান্তে আমরা দেখি, বিশ্বাসভঙ্গের আকস্মিক আঘাতে আত্মহারা মারিয়ার বিপরীতে অনুপমের "সংযত, শান্ত, ভদ্র গলায় পুনঃ পুনঃ" বাগ্‌ভঙ্গি, যা অনুপমের শঠতার স্বভাবলক্ষণ প্রকাশক।

৭.৩.৩.৫.৩. চরিত্রের মনোশৈলীর মাধ্যমে চরিত্রায়ণ

পাঠক একটি চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে ধরতে পারেন, যদি আখ্যানের বাচন থেকে সেই চরিত্রের মনোশৈলী (mind style) সন্ধান ক'রে তার স্বভাবলক্ষণকে বুঝে নেওয়া সম্ভব হয়। অনুপম চরিত্রের বোধগত প্রক্রিয়া কীভাবে তার মনোশৈলীকে প্রকাশ ক'রে চরিত্রায়ণের সহায়ক হয়েছে, তা সন্দর্ভের নবম অধ্যায়ে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে (দ্র. ৯.৩.১)। সেখানে আমরা বারবার অশ্বরজ্জুর টান ও সেই টান আলগা হয়ে যাওয়ার রূপকার্থক অভিব্যক্তি দেখতে পাব। অনুপম জীবনের প্রতিটি দিককে ওই অশ্বরজ্জু টানের মতো স্বনিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে আগামীর অভিমুখে লক্ষ্য স্থির করেছে। অনুপমের চরিত্রায়ণের এই শৈলী যে ভাবাদর্শের ধারক, তাও ব্যাখ্যাত হয়েছে সন্দর্ভের নবম অধ্যায়ে।

৭.৩.৩.৫.৪. চরিত্রায়ণের গৃহীত অন্যান্য পদ্ধতি

নবনীতার সাহিত্যে চরিত্রায়ণের আরও পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। যেমন –

- ‘শনি-রবি’ উপন্যাসে আছে মাতৃত্বের প্রথাগত ইমেজের বিচ্যুতি এবং সমান্তরতা ধর্মকে কাজে লাগিয়ে দুটি চরিত্রের মনোশৈলীর সন্নিধি সৃষ্টির মাধ্যমে চরিত্রায়ণ (দ্র. ৫.৩.২)।
- ‘স্বভূমি’ উপন্যাসে দেখা গেছে অন্যান্য চরিত্রের ভাবনার মধ্য দিয়ে প্রধান চরিত্রের চরিত্রায়ণ (দ্র. ৭.৩.৩.৪.৩)।
- বিভিন্ন উপন্যাসে চরিত্রের স্বাভাবিক মেজাজের বিচ্যুতি চরিত্রায়ণের গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হয়েছে (দ্র. ৫.৪-এর শেষ অনুচ্ছেদ)।
- ‘ফিনিক্স’ (দ্র. ৮.২.১), ‘দ্বিরাগমন’ (দ্র. ৮.২.২) কিংবা ‘ঘূর্ণি’ (দ্র. ১০.৩.১.৭) উপন্যাসে একেকটি সম্ভাব্য বিশ্বকে বাস্তবায়িত হতে না-দিয়ে চরিত্রগুলি যেভাবে আসন্ন বাস্তব বিশ্বের পথে পা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার মধ্যে মিশে আছে একেকটি দৃঢ়চেতা নারীচরিত্রের চরিত্রায়ণের কৌশল।
- সন্দর্ভের প্রথম, তৃতীয় এবং পঞ্চম অধ্যায়ে যথাক্রমে চিত্রকল্প, আন্তর্বয়ান এবং বিচ্যুতি ও সমান্তরতার যেসব দৃষ্টান্তের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই চরিত্র কিংবা কথকের বাগ্‌ব্যবহারের অঙ্গীভূত হয়ে চরিত্রায়ণের সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

৭.৩.৩.৬. ভাষারীতি ও কথকের বাকভঙ্গি

সমস্ত কাহিনিতেই রয়েছে চলিত গদ্যের ব্যবহার। ব্যতিক্রম অবশ্য ‘বামা-বোধিনী’ উপন্যাস। এই ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য একটু পরেই আলোচনা করা হয়েছে (দ্র. ৭.৩.৩.৭)।

চরিত্রদের মুখের ভাষায় ধরা পড়েছে বিশ শতকের শেষ - একুশ শতকের শুরুর পর্বের শহর কলকাতার উচ্চমধ্যবিত্ত পরিসরের উচ্চশিক্ষিত নারীপুরুষের চলতি ভাষা। তাদের কেউ কেউ বিদেশে উচ্চশিক্ষালাভ করেছে কিংবা বিদেশেই কর্মরত। এদের ভাষিক চয়নে প্রায়শই ইংরেজির ব্যবহার অর্থাৎ কোড মিশ্রণ ও কোড সরণ দেখা যায়, যা থেকে চরিত্রগুলির শ্রেণিগত

পরিচয় সহজে চেনা যায়। চরিত্রের আত্মকথন হোক অথবা কথকের ভূমিকানুগ কথনই হোক, কথনভঙ্গিতে ধরা পড়েছে চরিত্র থেকে চরিত্রের সামাজিক শ্রেণিগত তফাৎ। নিচে দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল –

নবনীতা তাঁর 'আমি অনুপম' উপন্যাসে বস্তুত বিশেষ একটি সামাজিক শ্রেণিকে তুলে ধরতে চেয়েছেন, যাঁরা সমাজে প্রোথিতযশা, বিদ্বান এবং বহু অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের দুঃসাহসিক কাজে অনুপ্রেরণা প্রদানকারী অথচ সময়ের বেগতিক বুঝলে তাঁরাই হয়ে যান সুবিধাবাদী ও প্রবঞ্চক। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র অধ্যাপক অনুপম রায় সমাজের এই শ্রেণিভুক্ত। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই শ্রেণির মানুষের কণ্ঠস্বর শোনা যায় উপন্যাসের ভূমিকানুগ কথনে –

> অনুপম রায় কি আইনের চেয়ে শক্তিমান হয়ে উঠতে পারেন না? সরকার স্টার্ন অ্যাটিচ্যুড নিলে অনুপম কি স্টার্নার অ্যাটিচ্যুড নিতে পারেন না? পারেন না। আফটার অল, তিনি ব্যক্তিমাত্র, ওনলি অ্যান ইনডিভিজুয়াল। তিনি তো একটা ইনস্টিট্যুশন নন।
> -- কিটব্যাগটা -- [২০]

(ক) নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দাবলীর ব্যবহার নির্দেশ করে কথকের উচ্চশিক্ষিত শ্রেণিকে।

(খ) প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গি তাঁর যুক্তিবাদী মনের পরিচায়ক।

(গ) 'কিটব্যাগটা' শব্দের অব্যবহিত আগে এবং পরে ড্যাস (--) চিহ্নের ব্যবহারে যে না-বলাটুকু রয়েছে, তার মধ্যে নিহিত থাকে সমীরের রেখে যাওয়া কিটব্যাগের জন্য অনুপমের সম্ভাব্য বিপদের অব্যক্ত আশঙ্কা ও পরিণামচিন্তা, যা অনুপমের মতো একজন সচেতন বুদ্ধিদীপ্ত স্বার্থচিন্তামগ্ন মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

আরও একটি উদাহরণ নিচে তুলে ধরা হল, যেখানে পুলিশের হাতে সমীরের ধরা পড়ার ব্যবস্থা করে এসে অনুপমের অপরাধবোধ ফুটে ওঠে। সমাজে নিজের প্রতিষ্ঠিত অবস্থানকেও তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর ছাত্র সমীর ও তার সহযোদ্ধাদের নির্মম

পরিণতি তিনি কখনোই চাননি। অথচ থানায় কিটব্যাগ জমা দিয়ে তিনি কার্যত তাদেরকে মৃত্যুমুখেই ঠেলে দিয়ে এসেছেন। তাই অনিবার্যভাবে সমাজের এক বিশিষ্ট শ্রেণির প্রতিনিধি চরিত্র হিসেবে অনুপমের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ আত্মগ্লানি লক্ষ করা যায় চেতনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে –

> সমীর, তুমি এসো। তুমি আমার বিছানাতে শোবে এসো। আমি সারা রাত তোমাকে পাহারা দিয়ে বসে থাকব। আমি জেগে থাকব, সমীর। তোমার কিটব্যাগ আমি দিয়ে এসেছি, অমন ত্রুটি আর হবে না। আর হবে না, সমীর, তুমি এসো ভাই। যিশুর সেই ভবিষ্যদ্বাণী "বিফোর দ্য কক্ ক্রোওজ দাও শ্যালট ডিনাই মি থ্রাইস" আমি মিথ্যে করে দেব। একবার হয়েছে, আর নয়। আমি পিটারের মতো তিনবার বলব না – "আই নো দিস ম্যান নট।" আমি যে সব সময় ঠান্ডা মাথায় আগে পেছনে ভেবে চলি সমীর, তাই তো আমার ভুল হল। ভাবনা করার সময় পেলেই আমি কিটব্যাগ জমা দিয়ে ফেলি। তুমি আমাকে ভাববার সময় দিয়ো না।[২১]

(ক) বাইবেল থেকে গৃহীত আন্তর্বয়ান সম্বলিত নিম্নরেখাঙ্কিত বাক্যগুলির ব্যবহার অনুপমের বিদগ্ধ সামাজিক শ্রেণিকে আরও বেশি করে চিহ্নিত করে।

(খ) সেইসঙ্গে প্রাজ্ঞ পাঠকের স্মরণ হয় বিশ্বাসঘাতকতার এক সুপ্রাচীন পাঠ। মানবসভ্যতা যুগের পর যুগ অতিবাহিত করলেও, সেই বাইবেলের প্রাচীন পাঠকেই আমরা নতুন পাঠের আধারে পুনর্বার অবলোকন করি। সময় বদলায় তবু বিশ্বাসঘাতকের স্বরূপ বদলায় না। এভাবে এক পাঠের সঙ্গে সংযুক্ত হতে থাকে আরেক পাঠ।

'আমি অনুপম' থেকে পরপর উদ্ধৃত দুটি অংশের প্রথমটি হল স্বগতোক্তি এবং দ্বিতীয়টি অনুচ্চারিত আত্মকথন। এই দুই ভঙ্গির পার্থক্য নিরূপিত হতে পারে ডোরিট কোনের (Dorrit Cohn) উক্তি থেকে –

> …the interior monologue is described as associative, illogical, spontaneous; the soliloquy as rhetorical, rational, deliberate.[২২]

অনুচ্চারিত আত্মকথনকে আখ্যানতাত্ত্বিক চ্যাটম্যান বলেছেন "Free Direct Thought"[২৩]।

উল্লেখ্য, ওপরের অনুচ্চারিত আত্মকথনের দৃষ্টান্তে আমরা যেমন আন্তর্বয়ানের প্রয়োগ দেখলাম, তেমনি করেই বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে কিংবা কথকের বাক্ ব্যবহারে ধরা দিয়েছে আগের অধ্যায়গুলিতে বিশ্লেষিত বহুবিধ চিত্রকল্প, আন্তর্বয়ান ও বিচ্যুতি-সমান্তরতার মতো বৈশিষ্ট্য, যা চরিত্রায়ণে সহায়তা করেছে।

'স্বভূমি' উপন্যাসের হেমনলিনী অথবা 'শনি-রবি' উপন্যাসের সরমা ও প্রভাবতীর মতো নারীচরিত্র আমরা পেয়েছি, যাঁরা দুই প্রজন্ম পিছনের মানুষ, তথাকথিত উচ্চশিক্ষিত নন বটে, কিন্তু উচ্চশিক্ষিত পরিবারের গৃহবধূ। এঁদের ভাষিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা মেয়েলি ধরন আছে। যেমন, হেমনলিনী বলেন –

> না না ! ওসব কুকথা আমি ভাবতেই পারব না – অ নগেন, যা তো বাবা মোড় থেকে রাধারমণকে ধরে নিয়ায়, তোর বাবুর প্রেশারটা দেখে দিয়ে যাক। নারায়ণ ! নারায়ণ ! ঠাকুর ! রক্ষে করো ঠাকুর ![২৪]

আবার, 'শনি-রবি' উপন্যাসে প্রভাবতীর ভাষাভঙ্গিতেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মেলে –

> বিয়ে হয়ে আমি এখেনে এইচি, এই আমার শ্বশুরের ভিটে। আমি এখেনেই মত্তে চাই। তোমাদের যখনই ইচ্ছে করবে, আমার কাছে আসবে। আমি বাপু কোত্থাও যাব না।[২৫]

প্রজন্মগত ব্যবধান যে মানুষের রুচি-সংস্কৃতির আমূল পার্থক্য ঘটিয়ে দিতে পারে, তা আমরা এই দুই উপন্যাসে দেখেছি। বয়স্ক গৃহবধূর মুখের ভাষায় মেয়েলি ভাষারীতির প্রয়োগ নিঃসন্দেহে সেই প্রজন্মগত ব্যবধানের ভিত রচনা করেছে।

বাক্‌নির্মাণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক খুব বেশি তথ্যনিষ্ঠ নন এবং আলঙ্কারিক কাব্যিক ভাষা প্রয়োগের পক্ষপাতীও নন। তার চেয়ে তিনি ঢের বেশি মননধর্মী – চরিত্রের মনোজগতের নানা গতিপ্রকৃতি পাঠকের কাছে উপস্থিত করার প্রয়াসী।

৭.৩.৩.৭. উপন্যাসের আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য

'বামা-বোধিনী' উপন্যাসের সংরূপগত বিচ্যুতি সন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে ইতোমধ্যেই আলোচিত (দ্র. ৫.৩.১.৩)। বিষয়ের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এই উপন্যাসের গঠনেও একধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় মেলে। দেখা যায়, গদ্যের ফাঁকে ফাঁকে বারবার এসেছে পদ্যের ব্যবহার। প্রথমে দেখে নেওয়া যাক, উপন্যাসে পদ্যের ব্যবহার কোথায় কোথায় এসেছে –

> দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'কমলাম্মার কথা'[২৬]।
>
> তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'সীতার গর্ভলক্ষণ'[২৭]।
>
> চতুর্থ পরিচ্ছেদে মৈমনসিংহ-গীতিকার চন্দ্রাবতী পালা থেকে উদ্ধৃত বেশ কিছু সংখ্যক পদ্যাংশ[২৮]।
>
> ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'মারাঠি গান।। সীতার গর্ভলক্ষণ।।'[২৯]।
>
> দ্বাদশ তথা অন্তিম পরিচ্ছেদে গদ্যরীতির ফাঁকে ফাঁকে পয়ার ছন্দে রচিত পদ্য এসেছে পাঁচবার[৩০]। এগুলির মধ্যে শেষেরটি শিরোনামযুক্ত – 'অংশুমালার পালা'।

উপন্যাসে এই পদ্যরীতির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যবাহী। কেবলমাত্র পদ্যগুলির দিকে পরপর দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়, প্রাচীন যুগের সীতা, মধ্যযুগের চন্দ্রাবতী আর আধুনিক যুগের অংশুমালা ও কমলাম্মা এক সূত্রে গাথা পড়েছে। ভারতীয় মেয়েদের গহন হৃদয়ের খোঁজ দেয় এইসব অংশ। পুরুষের দ্বারা নিগৃহীত নারীর দুঃখ ও সেই দুঃখ থেকে উত্তরণের পথ হিসেবে কর্মযোগে মনোনিবেশ করার সুরও শোনা যায় 'অংশুমালার পালা'তে –

> তুমিও একাকী মাগো বীণা পুঁথি লইয়া
> আপনি বিজনে আছো সর্বশুক্লা হইয়া
> তোমারেই হৃদিমূলে করিয়া আশ্রয়
> চন্দ্রা-কমলাম্মা-অংশু সীতার গীতি গায়[৩১]

এই গানে ধ্রুবপদ হয়ে ফিরে ফিরে আসে একটি পংক্তি – 'ও গঙ্গা বইয়া যাও গো ধীরে –', যা জীবনের নিত্যবহমানতাকেই ইঙ্গিত করে। সেইসঙ্গে আছে বন্দনা অংশ এবং শেষে আছে পালার রচয়িতা অংশুমালার ভণিতা। একেবারেই মধ্যযুগীয় কাব্যশৈলী।

এই উপন্যাসের আখ্যানরীতি সম্পর্কে নবনীতার নিজের বক্তব্য,

> এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু এবং নির্মাণপদ্ধতি দুটিই পরস্পরনির্ভর, পরস্পরসম্পৃক্ত। কাঠামো এখানে বক্তব্যের অবিচ্ছিন্ন অংশ। সচরাচর বাংলা উপন্যাস যেভাবে লেখা হয়, এটি সেভাবে লেখা হয়নি, এর গড়নপেটন আলাদা, চলনবলনও একটু অভ্যস্ত পরিধির বাইরে।[৩২]

শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে পুরুষের দ্বারা নারীর অপমান ও নিগ্রহের বাস্তব জটিলতা কেবল আজকের সমাজের নয়। তা চিরকালব্যাপী হয়ে আসছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের পালাগানের কাব্যশৈলী ও ভাষাছাঁদের অনুসরণে রচিত বিভিন্ন পদ্য যেন জীবনের এই জটিলতার প্রাচীনতাকেই পরিস্ফুট করতে চায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গদ্যসাহিত্যের মাঝে মাঝে পদ্যের ব্যবহার ভারতীয় সাহিত্যশৈলীর ঐতিহ্যে অতি প্রাচীন। যেমন, বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' আখ্যায়িকা। তাই এই পদ্ধতির অনুসরণও যেন উপন্যাসের বিষয় ও গঠনের পারস্পরিক নির্ভরতাকেই পুনরায় দ্যোতিত করে।

পদ্যের ব্যবহার ছাড়াও বিভিন্ন পরিচ্ছেদে মাঝে মাঝেই এসেছে '[অংশুমালার খাতা]' শীর্ষক অংশ, যেখানে অংশুমালার নিজস্ব চিন্তার প্রকাশ বিধৃত। আর এসেছে '[NOTES]' শীর্ষক কিছু অংশ। উপন্যাসের এইসব অংশে দেখা গিয়েছে যুক্তির ঠাসবুনোনে তৈরি প্রবন্ধের গঠনশৈলী। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অংশুমালার আড়ালে এ আসলে ঔপন্যাসিক নবনীতার চন্দ্রাবতী ও তাঁর রামায়ণ কেন্দ্রিক নিজস্ব গবেষণাকর্মের ফসল। যুক্তির শাণিত গদ্যই পারে মেয়েদেরকে নিজেদের মর্যাদা ও ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে। এভাবে সার্থক হয় উপন্যাসের 'বামা-বোধিনী' নামকরণ।

সুতরাং, নবনীতা উপন্যাসের গতানুগতিক আঙ্গিকে বদল এনে আঙ্গিককে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দিয়েছেন উপন্যাসের বিষয়ের সঙ্গে।

৭.৩.৩.৮. উপন্যাসে গৃহীত আখ্যানপ্রযুক্তি

আখ্যানের প্রযুক্তিকে (technique)[৩৩] আমরা আখ্যান নির্মাণের শৈল্পিক হাতিয়ার বলতে পারি। নবনীতা দেবসেনের উপন্যাসে মুখ্যত দুটি প্রযুক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে।

৭.৩.৩.৮.১. প্রথম প্রযুক্তি : সদর্থক অভিযোজন

নবনীতার লেখা উপন্যাসে এই প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটেছে নিম্নরূপে –

চরিত্রের কোনো একধরনের মনোভাব পোষণ
(প্রাথমিকভাবে অধিকাংশকেই সংকীর্ণ/উদ্ধত/অবদমিত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়)

↓

উদ্ভূত মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিস্থিতি

↓

বিবর্তন

↓

সদর্থক অভিযোজন

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় 'অভিজ্ঞান' উপন্যাসের চরিত্র অংশুমালার কথা। বিদগ্ধমহলে অংশুমালা তাঁর কলমের ডগায় প্রতিনিয়ত সমকামীদের সমর্থন জানালেও, নিজের পারিবারিক বৃত্তে সমকামিতাকে মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁর প্রথম জীবনের প্রেমিক অন্য এক পুরুষকে ভালোবেসেছিল বলে অংশুমালার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। সেই নিদারুণ আঘাতের স্মৃতি প্রৌঢ় বয়সে এসেও নিজের কন্যাসম পুষ্পার সমকামিতাকে মেনে নিতে বাধা সৃষ্টি করে। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ চলতে থাকে। যুদ্ধ চলতে থাকে সমকামীদের সামাজিক হেনস্থার বিপক্ষে কলম ধরা অংশুমালার সঙ্গে আরেক অংশুমালার, যিনি ক্রমশ বুঝতে পারছেন নিজের ঘরের মধ্যে সমকামিতার ফলে মেয়ের বদলে যাওয়া সামাজিক পরিচয়কে। কিন্তু এই মানসিক

দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়েই হতে থাকে অংশুমালার বিবর্তন, যার পরিণামে দেখা যায়, তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের পারিবারিক পরিসরেও সমকামিতাকে স্বাগত জানাতে পেরেছেন। একটা সদর্থক অভিযোজন ঘটেছে অংশুমালা চরিত্রের।

সদর্থক অভিযোজন নিঃসন্দেহে উপন্যাসের জগতে একটি প্রচলিত ও প্রত্যাশিত প্রযুক্তি। কিন্তু সেক্ষেত্রে উপন্যাস থেকে উপন্যাসে পার্থক্য তৈরি হয় এই প্রযুক্তি রূপায়নের জন্য গৃহীত আখ্যানকৌশলে। এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এমন উদাহরণ হিসেবে নবনীতার বিভিন্ন উপন্যাস থেকে আরও যেসব চরিত্রের নাম করা যায়, তাদের মধ্যে রয়েছে – অনুপম ('আমি অনুপম'), অংশুমালা ('বামা-বোধিনী'), বিপাশা ও রোহিণী ('ফিনিক্স'), সুরমা ও আদিত্য ('মায়া রয়ে গেল'), হেমনলিনী ও সন্তোষ মুখোপাধ্যায় ('স্বভূমি') এবং শ্রীনন্দা ('দ্বিরাগমন')।

৭.৩.৩.৮.২. দ্বিতীয় প্রযুক্তি : বহিষ্করণ

আখ্যানের দ্বিতীয় প্রযুক্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে 'ঘূর্ণি' উপন্যাসের রিমঝিম এবং 'অ্যালবাট্রস' উপন্যাসের পদ্মিনী চরিত্রকে ঘিরে। প্রযুক্তিটি নিম্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে –

আগাগোড়া স্বাধীন একটি নারীচরিত্র

↓

তাকে প্রচলিত সমাজের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় (সন্ন্যাস অথবা আত্মহননের মাধ্যমে)

'ঘূর্ণি' উপন্যাসের শেষে দেখা যাচ্ছে রিমঝিম সন্ন্যাস নিয়ে নিচ্ছে এবং 'অ্যালবাট্রস' উপন্যাসের শেষে জানা যাচ্ছে পদ্মিনী আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, গোটা উপন্যাস জুড়ে যারা ডানা মেলে ওড়ার মতো স্বাধীন জীবন যাপন করল, সেই রিমঝিম এবং পদ্মিনীর জীবনের পরিণতি সন্ন্যাস আর আত্মহননে কেন হল?

আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুরুষের বহুগামিতাকে অনেকাংশে স্বাভাবিক চোখে দেখলেও, একজন নারীর বহুগামিতা এই সমাজের কাছে ঘৃণ্য অপরাধ। তাই রিমঝিম এবং পদ্মিনীর ছক-ভাঙা জীবন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বেড়ে ওঠা পাঠককে খুব বেশি মাত্রায় টলিয়ে দিতে পারে। সম্ভবত এমন আশঙ্কা থেকেই বা বলা যায় পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যতার কথা ভাবনায় রেখেই হয়তো ঔপন্যাসিক এমন পরিণতির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পোয়েটিক জাস্টিস দেখা গিয়েছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে সন্দর্ভের দশম অধ্যায়ে।

৭.৩.৩.৯. বিভিন্ন গল্পের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আখ্যানতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

নবনীতা দেবসেনের আত্মজীবনীমূলক গল্পগুলির আখ্যানশৈলীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, গল্পগুলির কথক কাহিনি বলার মাঝে মাঝে পাঠককেও জুড়ে নেন। কথক কখনো পাঠককে প্রশ্ন করেন, আবার কখনো পাঠকের উত্তর অনুমান করেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক –

‘পরীক্ষা’ গল্পের উপসংহারে গিয়ে কথককে পাঠকের উদ্দেশে বলতে শোনা যায় –

> এরপর নিশ্চয় স্কোরবোর্ডটা দেখতে চান? যেমন খেলোয়াড়, যেমন পিচ, তেমনি খেলা; আর তেমনই রেজাল্ট।[৩৪]

এই গল্পেরই আরেকটি অংশ নিচে উদ্ধৃত করা হল, যেখানে মনে হয় কথক পাঠকের সঙ্গে কথোপকথন করছেন –

> এ সাবান কিন্তু গায়ে মাখার নয়। নীল, হলুদ, গোলাপী, লোভনীয় স্বপ্রিল প্যাস্টেল রঙে, ফ্রী পাওয়া যায়। আমাদের বাড়িতে এখনও গোটা দশেক আছে। চাই?[৩৫]

‘মঁসিয়ো হুলোর হলিডে’ গল্পের শেষে যুক্ত হয়েছে একটি নীতিকথা, যেখানে লেখিকা পাঠকদেরকে সাবধান ক’রে বলেন –

দমকলকে অকারণে বিরক্ত করবেন না। করলে হাতে-নাতে তার প্রতিফল পাবেন। "ধর্মের কল" ইত্যাদি মনে থাকে যেন।[৩৬]

'প্রজেক্ট চর্মচটিকা' গল্প শুরুই হচ্ছে পাঠককে যুক্ত ক'রে নিয়ে –

আর যাই করুন আপনারা, খবর্দার চামচিকে পুষবেন না।[৩৭]

এরপর গল্প ক্রমশ এগোতে থাকে এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে পাঠকের সঙ্গে কথোপকথনের ভঙ্গি চোখে পড়ে। যেমন –

এত তো সার্কাস দ্যাখেন, চামচিকের সার্কাস কেউ দেখেছেন কখনো? হুঁ বাবা, সেটি পাবেন না।[৩৮]

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ করবার বিষয় হল, কথক পাঠককে প্রশ্ন করেন এবং তার উত্তর অনুমান ক'রে পরবর্তী উক্তি করেন। এভাবে পাঠকও যেন এক প্রকার ভূমিকায় পরিণত হন। গল্পের শেষেও থাকে পাঠকের উদ্দেশে প্রশ্নের ছলে সদুপদেশ –

এর পরেও কি আপনারা কেউ চামচিকে পুষতে চাইবেন? ওরা সত্যি-সত্যিই মনুষ্যেতর, অর্থাৎ মানুষের চেয়েও ইতর প্রাণী। জগতে যা দুর্লভ।[৩৯]

'ডক্টর দেবসেনের বিদেশ যাত্রা' গল্পেও আছে পাঠকের সাথে কথোপকথনের ভঙ্গি। গল্পের শুরু নিম্নরূপে –

আচ্ছা, ছোট একটা প্রাণের কথা আমাকে গোপনে বলবেন? [৪০]

পাঠকের প্রাণের কথা গোপনে বলতে বলার আহ্বানে নিঃসন্দেহে মিশে থাকে পাঠককে আপন করে নেবার সহজ আন্তরিকতা। গল্পের পরিশিষ্টে পাই –

এইবারে টের পেলেন তো হরিদাস পালেদের বিদেশ যাত্রা কেমন ধরনের হয়? [৪১]

এইভাবে গল্পে উদ্ভূত বিবিধ পরিস্থিতিকে পাঠক যেন আরও ঘনিষ্ঠরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

আখ্যান যে আসলে কথক-শ্রোতা বা লেখক-পাঠকের যৌথ নির্মাণ, সেটিই যেন দৃষ্টান্তগুলি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়।

নবনীতা দেবসেনের গল্পগুলি বেশিরভাগই ঘটনাপ্রধান। সেখানে একটার পর একটা ঘটনা ঘটে চলে, যা অধিকাংশ গল্প হাস্যরসাত্মক হয়ে ওঠার পিছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ব্যতিক্রম অবশ্য নেই, তা নয়। যেমন – 'গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ' গল্পে যেমন নেই ঘটনার ঘনঘটা, তেমনি একটিমাত্র চরিত্রের আত্মকথনের মাধ্যমে এটি একটি চরিত্রপ্রধান গল্পের কোঠায় উপনীত হয়েছে।

ঘটনার পুনরাবৃত্তির মতো আখ্যানকৌশল গল্পেও দেখা গিয়েছে। 'হাওয়া-ই-হিন্দ' গল্প অবলম্বনে সন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কাহিনির পুনরাবৃত্ত ঘটনা কীভাবে বাচনে পুনরাবৃত্ত হয়েছে (দ্র. ৫.৩.৬.১)।

৭.৪. উপসংহার

Joseph Conrad-এর কথা অনুসরণ করে বলা যায়, একটি উপন্যাস সার্থক হয়ে উঠতে পারে –

> …Only through complete, unswerving devotion to the perfect blending of form and substance…[৪২]

কাহিনি হল বিমূর্ত। তাকে মূর্ত আকার দেওয়া হয় বাচনের মাধ্যমে। তাই এই অর্থে আখ্যানকৌশল বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় বাচনের বিশ্লেষণ।

নবনীতা দেবসেন তাঁর একেকটি আখ্যানের স্থান, কাল, চরিত্রায়ণ, কথন ইত্যাদি উপাদানকে কাজে লাগিয়ে যেসব কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং কাহিনির রূপায়ণ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে তাঁর লেখনীকে পাঠকের কাছে সমাদৃত করে তোলার উপযুক্ত। কাহিনির রূপায়ণ আখ্যানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কেও স্পষ্ট করেছে।

৭.৫. তথ্যসূত্র

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জাপান-যাত্রী* (কলিকাতা: ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ), ৭।

২। Elena Semino, "Text Worlds," In *Cognitive Poetics: Goals, Gains and Gaps*, edited by G. Brone and J. Vandaele (Berlin: Mouton de Gruyter, 2009), 39.

৩। তপোধীর ভট্টাচার্য, “উপন্যাস: জিজ্ঞাসার মন্থন,” উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব, অঞ্জন সেন ও উদয় নারায়ণ সিংহ সম্পাদিত, (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০), ৮১।

৪। ভট্টাচার্য, “উপন্যাস: জিজ্ঞাসার মন্থন,” ৮১।

৫। নবনীতা দেবসেন, "মায়া রয়ে গেল," *দশটি উপন্যাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., জানুয়ারি ২০০৩), ৪২৫।

৬। অলোক চক্রবর্তী, *আখ্যানের তত্ত্বভুবন* (কলকাতা: আশাদীপ, ২০২৩), ১১৯।

৭। চক্রবর্তী, *আখ্যানের তত্ত্বভুবন,* ১৭৯-১৮১।

৮। নবনীতা দেবসেন, "আমি অনুপম," *দশটি উপন্যাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., জানুয়ারি ২০০৩), ৪৭।

৯। নবনীতা দেবসেন, *অভিজ্ঞান* (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০১২), ৭৭।

১০। অমিতাভ দাস, *আখ্যানতত্ত্ব* (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৯), ৭৬।

১১। হীরেন চট্টোপাধ্যায়, *উপন্যাসের রূপরীতি* (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ), ১৭০।

১২। দেবসেন, "আমি অনুপম," ১৩।

১৩। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৩১।

১৪। দাস, *আখ্যানতত্ত্ব,* ১০২।

১৫। নবনীতা দেবসেন, "স্বভূমি," *দশটি উপন্যাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., জানুয়ারি ২০০৩), ৯৯।

১৬। দেবসেন, "স্বভূমি," ১১২।

১৭। নবনীতা দেবসেন, *ঘূর্ণি* (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৮), ৪০।

১৮। চক্রবর্তী, *আখ্যানের তত্ত্বভুবন,* ১৪৭-১৪৮।

১৯। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৮৪।

২০। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৩১।

২১। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৩৬-৩৭।

২২। চক্রবর্তী, *আখ্যানের তত্ত্বভুবন,* ৪১১।

২৩। চক্রবর্তী, *আখ্যানের তত্ত্বভুবন,* ৪১১।

২৪। দেবসেন, "স্বভূমি," ১১১।

২৫। নবনীতা দেবসেন, "শনি-রবি," *দশটি উপন্যাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., জানুয়ারি ২০০৩), ৪৪২।

২৬। নবনীতা দেবসেন, "বামা-বোধিনী," *দশটি উপন্যাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., জানুয়ারি ২০০৩), ২৩৩।

২৭। দেবসেন, "বামা-বোধিনী," ২৩৭।

২৮। দেবসেন, "বামা-বোধিনী," ২৪০-২৪৩।

২৯। দেবসেন, "বামা-বোধিনী," ২৫৩।

৩০। দেবসেন, "বামা-বোধিনী," ২৭৭-২৮১।

৩১। দেবসেন, "বামা-বোধিনী," ২৮১।

৩২। নবনীতা দেবসেন, "ভণিতা," *দশটি উপন্যাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., জানুয়ারি ২০০৩), ৫২৬।

৩৩। ছন্দম চক্রবর্তী, "শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক আখ্যান: স্বপ্ন, আশা ও দিব্যদৃষ্টি" (Lecture, Seminar on *Understanding Text and Discourse from Stylistic Perspective*, University of Calcutta, Kolkata, September 25, 2024).

৩৪। নবনীতা দেবসেন, "পরীক্ষা," *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৯), ১৬৫।

৩৫। দেবসেন, "পরীক্ষা," ১৬১।

৩৬। নবনীতা দেবসেন, "মঁসিয়ো হুলোর হলিডে," *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৯), ১৭।

৩৭। নবনীতা দেবসেন, "প্রজেক্ট চর্মচটিকা," *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৯), ১৭।

৩৮। দেবসেন, "প্রজেক্ট চর্মচটিকা," ১৯।

৩৯। দেবসেন, "প্রজেক্ট চর্মচটিকা," ২৬।

৪০। নবনীতা দেবসেন, "ডক্টর দেবসেনের বিদেশ যাত্রা," *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৯), ৩৪।

৪১। দেবসেন, "ডক্টর দেবসেনের বিদেশ যাত্রা," ৪৯।

৪২। চট্টোপাধ্যায়, *উপন্যাসের রূপরীতি*, ২৫।

অষ্টম অধ্যায়

আখ্যানের সম্ভাব্য বিশ্ব, বাস্তব বিশ্ব এবং পাঠকের বোধগত প্রক্রিয়া ও কাঠামো

৮. আখ্যানের সম্ভাব্য বিশ্ব, বাস্তব বিশ্ব এবং পাঠকের বোধগত প্রক্রিয়া ও কাঠামো

৮.১. ভূমিকা

> As a means of calculating the truth-value of a sentence, philosophers of language developed the notion of possible worlds. You might think that a sentence like 'The Allies defeated the Axis in the Second World War' is obviously true. However, it is only true in our actual world. The actual world is only one of a multitude of possible worlds which could provide a context for the sentence, and some of these possible worlds would alter the truth-value of that sentence. For example, in the Philip K. Dick novel The Man in the High Castle (and numerous other science-fiction stories), an imaginary world is presented in which Japan and Germany defeated the US and Britain. Within the possible world of that novel, the sentence above is false.[১]

সন্দর্ভের সপ্তম অধ্যায়ে আমরা নবনীতার উপন্যাসের আখ্যানগত কাঠামো নির্ধারণ করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি, নবনীতা তাঁর একেকটি উপন্যাসের বিষয়গত নিজস্ব দাবি অনুসারে ভাষা উপাদান, স্থান, কাল, ঘটনা, চরিত্র, কথনরীতি নির্বাচন করেছেন এবং উপন্যাসের কাহিনি-বিশ্ব নির্মাণ করেছেন। এই যে বললাম "নির্বাচন করেছেন", এখানেই প্রশ্ন আসে –

- লেখিকা কোথা থেকে নির্বাচন করেছেন?
- যেখান থেকে নির্বাচন করেছেন, সেখানে আর কত সংখ্যক বিকল্প ছিল?

অসংখ্য সম্ভাব্য বিশ্ব (possible world)-এর মধ্য থেকে একটিকে নির্বাচন করেছেন এবং সেই নির্বাচিত সম্ভাব্য বিশ্বই হয়েছে কোনো একটি উপন্যাস বা গল্পের কাহিনি-বিশ্ব (text-world)।

সম্ভাব্য বিশ্ব অসীম সংখ্যক হতে পারে। তাই আখ্যানের কাহিনি-বিশ্ব নির্বাচনের বিকল্পও অসীম সংখ্যক। কারণ, অসীম সংখ্যক সম্ভাব্য ঘটনা, চরিত্র, স্থান, কাল, ভাষা উপাদান, কথনরীতির গাণিতিক সমবায় (combination) হতে পারে অসীম সংখ্যক।

প্রচুর সংখ্যক সম্ভাব্য বিশ্বের কথা বলা হলেও, বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বিশ্লেষণের স্বার্থে বিশেষ এক জাতীয় সম্ভাব্য বিশ্বকে বেছে নেব। আমরা দেখব, বেশ কিছু সম্ভাব্য বিশ্ব উপন্যাসের চরিত্রদের ভাবনার জগতে থেকে গেছে, যেগুলো উপন্যাসে বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ, সেইসব ভাবনা বা সেইসব সম্ভাব্য বিশ্ব কাহিনির সাপেক্ষে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কাহিনি-বিশ্বে (অর্থাৎ, উপন্যাসে) যা কিছু বাস্তবায়িত হয়েছে, সেই সবকিছু মিলিয়ে তৈরি হয় কাহিনির বাস্তব বিশ্ব (textual actual world)। আর যা কিছু বাস্তবায়িত হল না, কেবলমাত্র চরিত্রদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, কল্পনা, নৈতিকতা, বিশ্বাস, পরিকল্পনা হয়ে ভাবনার জগতে থেকে গেল, সেগুলি মিলিয়ে তৈরি হয় কাহিনির অবাস্তব বিশ্ব (non-actual world)। এই বাস্তব বিশ্ব এবং অবাস্তব বিশ্ব নিয়ে যেটা তৈরি হয়, তাকে ভাষাতাত্ত্বিক Elina Semino 'text-world' না-বলে 'text-universe' বলে চিহ্নিত করেছেন।[২] সুতরাং, বিষয়টি নিম্নরূপ –

- কাহিনির অন্তর্গত বাস্তব বিশ্ব = কাহিনি-বিশ্ব
- কাহিনির অন্তর্গত বাস্তব বিশ্ব + কাহিনির অন্তর্গত অবাস্তব বিশ্ব = কাহিনি-মহাবিশ্ব

রায়ান (Ryan) কাহিনির অন্তর্গত এই অবাস্তব বিশ্বকেই বলেছেন 'textual alternative possible worlds'।[৩] কারণ, যা কিছু বাস্তবায়িত হল না, সেগুলি যদি আখ্যানে রূপায়িত হত, তাহলে অন্য আরেকটি আখ্যানের জন্ম হতো। রায়ানরে মতে, চরিত্রদের মনের ৬টি বিশেষ অবস্থা কাহিনির অন্তর্গত ওই অ-বাস্তবায়িত সম্ভাব্য বিশ্ব তৈরির জন্য দায়ী। এগুলি নিম্নরূপ –

beliefs (Knowledge worlds)
expectations (Prospective Extensions of Knowledge worlds)
plans (Intention worlds)

moral commitments and prohibitions (Obligation worlds)
wishes and desires (Wish worlds)
dreams or fantasies (Fantasy Universes) [8]

এবার কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝে নেব নবনীতার আখ্যানে অবাস্তব বিশ্ব অর্থাৎ অবাস্তবায়িত সম্ভাব্য বিশ্ব ঠিক কীভাবে ধরা দিয়েছে এবং সেইসব সম্ভাব্য বিশ্ব বাস্তবায়িত না-হবার ফলে প্রাপ্ত কাহিনি বিশ্ব কতখানি উপকৃত বা অপকৃত হয়েছে।

৮.২. নবনীতা দেবসেনের উপন্যাসে নিহিত সম্ভাব্য বিশ্বের অবাস্তবায়নের সার্থকতা

আমাদের প্রত্যেকের বাস্তব জীবনে যেমন অনেকরকম ইচ্ছা, স্বপ্ন, পরিকল্পনা থাকে, যা আর কোনোদিনই বাস্তবায়িত হয় না, তেমনই প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেও চরিত্রদের এমন অনেক ইচ্ছা, স্বপ্ন থাকে, যেগুলো উদ্ভূত পরিস্থিতির চাপে শেষ পর্যন্ত চির-অধরা থেকে যায়। এইসব ইচ্ছা বা স্বপ্নগুলো যদি বাস্তবায়িত হত, তাহলে কাহিনির যে বাস্তব বিশ্ব পাওয়া যেতে পারত, সেইটিই হল বর্তমানে প্রাপ্ত কাহিনির অন্তর্গত সম্ভাব্য বিশ্ব। এখন এই যে এক বা একাধিক সংখ্যক সম্ভাব্য বিশ্ব কাহিনিতে বাস্তবায়িত হল না এবং এর ফলে কাহিনি অন্য পথে বাঁক নিল বলে পাঠক সম্পূর্ণ অন্যরকম একটি বাস্তব বিশ্ব প্রত্যক্ষ করলেন, এর মাধ্যমে ঔপন্যাসিক নবনীতা দেবসেন কীভাবে পাঠকের বোধকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন, আমরা তা বোঝার চেষ্টা করব।

৮.২.১. 'ফিনিক্স' উপন্যাসে প্রাপ্ত সম্ভাব্য বিশ্ব ও বাস্তব বিশ্ব

'ফিনিক্স' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিপাশা এবং ঠিক তার পরেই দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র বিপাশার মেয়ে রোহিণী। সম্ভাব্য বিশ্বের ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকা বিপাশার অপূর্ণ ইচ্ছাগুলিকে তার জীবনের ধারাবাহিকতা অনুসারে পরপর প্রথমে দেখে নেওয়া যাক –

- সম্ভাব্য বিশ্ব ১-এর ইঙ্গিত →

> ... নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কুড়ি বছর বয়স থেকে একা বিদেশে। নিজের ইচ্ছেমতো চললে সে মেয়ে তখন থাকত পশ্চিমবঙ্গের কোনও জেলে [৫]

বাস্তব বিশ্ব →

উক্ত সম্ভাব্য বিশ্ব বাস্তবায়িত না হয়ে যে বাস্তব বিশ্ব পাওয়া গেল, তাতে দেখা গেল, বিপাশা কেম্ব্রিজের এক নামী কলেজের ছাত্রী হয়েছে, যা ভবিষ্যতের স্বনামধন্য অধ্যাপক বিপাশা হয়ে ওঠার পথ প্রশস্ত করেছে।

- সম্ভাব্য বিশ্ব ২-এর ইঙ্গিত →

প্রথমবার বিদেশ থেকে কলকাতায় ফিরে বিপাশা কলকাতাতেই পাকাপাকিভাবে থাকতে চেয়েছিল এবং বাংলা ভাষার কবি হতে চেয়েছিল। তার জন্য নানাভাবে চেষ্টারও ত্রুটি রাখেনি।

বাস্তব বিশ্ব →

বাস্তবে দেখা গেল, "বিপাশাকে বুঝি কবি বলে মনেই করে না এরা কেউ"[৬]। বিপাশাও বুঝে নিয়েছে বাংলা ভাষার কবি হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। সাফল্য আসবে না। তাই সাফল্যের পথ হিসেবে সে ইংরেজিকেই মাধ্যম করেছে এবং প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

- সম্ভাব্য বিশ্ব ৩-এর ইঙ্গিত →

> জেল থেকে বেরিয়ে তুই দেখবি তোর বি ফিরে এসেছে তোর কাছে আগের মতো, কিন্তু আগের মতো নয়, আগের চেয়ে ভালো, আগের চেয়ে বড় মেয়ে হয়ে। তুই আমার ওপরে যতই রেগে থাকিস না কেন, আমি আদর করে সব রাগ তোর ভেঙে দেব।[৭]

বাস্তব বিশ্ব →

বাস্তবায়িত হয়নি বিপাশার তৃতীয় ইচ্ছেটাও। বিপাশা সমীরের জীবনে ফিরে আসতে চাইলেও, সমীর তাকে আগের মতো করে গ্রহণ করতে পারেনি। এর ফলে আশাহত বিপাশাকে পুনরায়

চলে যেতে হয়েছে বিদেশেই। জীবনকে সে অন্য পথে প্রতিষ্ঠা দেবার কাজে মন দিয়েছে। পুরনো সবকিছুর মায়া কাটিয়ে এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। শুধু তাই নয়, সমীরের থেকে পাওয়া আঘাতই তার সম্পর্কের একনিষ্ঠতার ধারণাকেই সমূলে উৎপাটন করে দিয়েছে। কোনো পুরুষকেই বিপাশা জীবনে স্থায়ী আসন দেয় না। অবশ্য বিপাশা নিজে তার এই বারবার প্রণয়ী বদলের প্রবণতা সম্পর্কে যথেষ্ট উৎসাহী এবং গর্বিত।

- সম্ভাব্য বিশ্ব ৪-এর ইঙ্গিত →

মাতৃত্ব মানেই বন্ধন।
বন্ধন চায়নি বিপাশা।[৮]

এই ইচ্ছা পূরণ হলে, যে সম্ভাব্য বিশ্ব বাস্তব রূপ পেত, সেখানে বিপাশা হত মুক্ত বিহঙ্গের মতো পরিপূর্ণ স্বাধীন জীবনের অধিকারী।

বাস্তব বিশ্ব →

ভ্রূণ বিনষ্টির সর্বোচ্চ সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিপাশাকে মা হতে হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই মাতৃত্বের দায়ভার সে একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। আর পাঁচজন নারীর তুলনায় অনেক গুণ বেশি স্বাধীন জীবন যাপন করলেও মা হবার কারণে বিপাশা ভিতরে ভিতরে নিজেকে একটু কম কম স্বাধীন অনুভব করে। মাতৃস্নেহের প্রকাশও তার মধ্যে বড় একটা দেখা যায় না। এমনকি মেয়ের তেরো বছর হলে তাকে বিপাশা জানিয়ে দেয় যে আসলে সে মায়ের অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান। মেয়ের মনে কেমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা নিয়ে বিপাশা একটুও ভাবেনি। তবে উপন্যাসের শেষ লগ্নে গিয়ে মেয়ের প্রতি তার মাতৃসুলভ দুর্বলতার ক্ষণিক প্রকাশ লক্ষিত হয়।

এভাবে প্রতিটি সম্ভাব্য বিশ্বকে রূপায়িত হতে না-দিয়ে ঔপন্যাসিক কাহিনির যে বাস্তব বিশ্ব পাঠকের সামনে হাজির করেছেন, তাতে শেষ পর্যন্ত এক ভীষণরকম আত্মবিশ্বাসী, স্বাধীন,

উচ্চশিক্ষিত, কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অ্যাকাডেমিক সমাজে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নারী নির্মিত হয়েছে। প্রতিটি সম্ভাব্য বিশ্বের ব্যর্থতাই এই নারীকে নির্মিত হতে ইন্ধন জুগিয়েছে। মাতৃত্বের ক্ষেত্রেও 'টিপিক্যাল ভারতীয় মায়ের পরাকাষ্ঠা' সে কোনোদিনই হয়নি বটে, তবে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে আগের চেয়ে কিছুটা মাতৃত্ব অনুভব করেছে বৈকি।

এবার সম্ভাব্য বিশ্বের ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকা রোহিণীর অপূর্ণ ইচ্ছাকে দেখে নেওয়া যাক –

- সম্ভাব্য বিশ্বের ইঙ্গিত →

রোহিণী চেয়েছিল, তার বন্ধুদের মায়েদের মতো তার মা-ও তার প্রতি মনযোগী হোক, তার ব্যাপারে 'সেন্সিটিভ' হোক।

বাস্তব বিশ্ব →

যে বাস্তব বিশ্ব কাহিনিতে পাওয়া গেল, সেখানে দেখা গেল, রোহিণীর মা বিপাশা কোনও মূল্যেই চিরাচরিত মাতৃমূর্তি হয়নি। তার মায়ের অ্যাকাডেমিক জগতে অনেক কাজ। রোহিণী চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত মায়ের কাছে থেকেও কোনোদিনই প্রথাগত অর্থে মায়ের স্নেহ পায়নি। সেইসঙ্গে দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ করেছে মায়ের যথেচ্ছ প্রণয়ী বদলের উদ্দাম স্বাধীন জীবন। একটা সময় মায়ের কাছ থেকেই জেনেছিল, সে আসলে মায়ের অনাকাঙ্ক্ষিত অবহেলিত সন্তান। তীব্র অভিমান আর মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে মায়ের ঘর ছেড়ে কিশোরী মেয়েটি চিরদিনের মতো চলে গিয়েছিল বিদেশে বাবার কাছে।

প্রাপ্ত বাস্তব বিশ্বের পরিণামে আমরা এমন এক রোহিণীকে পেলাম, যে স্বীয় প্রচেষ্টায় আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইন্সিনারেটরে ফেলে দেওয়া মায়ের অসম্পূর্ণ উপন্যাসকে সম্পূর্ণ ক'রে সেটিকে বিশ্ববাসীর কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছে সে। ছাইয়ের থেকে ফিনিক্স পাখির মতো সেই উপন্যাসটির জন্ম। ঠিক একইভাবে বলা যায়, রোহিণী নিজেই যেন এক ফিনিক্স। মায়ের

অবাঞ্ছিত সন্তান, চিরদিন মায়ের দ্বারা অবহেলিত, তার মায়ের ভাষানুসারে 'লেজুড়'। সেই চিরকালের অমনোযোগ, অনাকাঙ্ক্ষা, অবহেলার ছাইয়ের স্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মতোই আকস্মিক আত্মপ্রকাশের ঝলকানি এনে দিয়েছে রোহিণী। উপন্যাসে শোনা যায়,

> আজকে যে রোহিণী এতটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্বভাবের হয়েছে, এমনকী কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে একা একা একটি শিশুসন্তানের দায়িত্ব নিয়ে ফেলল, এতে কি কোনওই ভূমিকা নেই বিপাশার?[৯]

নিঃসন্দেহে ভূমিকা আছে। সেদিনের মায়ের অবহেলার ছাইয়ের স্তূপে মায়ের প্রবল স্বাধীনমনস্কতার ধিকি-ধিকি আগুন ছিল।

৮.২.২. 'দ্বিরাগমন' উপন্যাসে প্রাপ্ত সম্ভাব্য বিশ্ব ও বাস্তব বিশ্ব

'দ্বিরাগমন' উপন্যাসের দুই প্রধান চরিত্র শ্রীনন্দা এবং মানসীকে ঘিরে দুরকম সম্ভাব্য বিশ্ব গড়ে উঠতে পারত। নিচে দেখানো হল –

- শ্রীনন্দা কেন্দ্রিক সম্ভাব্য বিশ্বের ইঙ্গিত →

স্বামী সুবীরের আকস্মিক মৃত্যুর পর থেকে শ্রীনন্দার পুনর্বিবাহ না-করে ল্যাবরেটরিতে নিজের গবেষণা নিয়ে ভুলে থাকার সংকল্প শ্রীনন্দার কথায় স্পষ্ট –

> আমার তো ভিতরে ভিতরে মৃত্যুক্ষত – এমনিতেই নিরন্তর রক্তক্ষরণ হয়। ল্যাব নিয়ে আমি সেটা ভুলে থাকতে চেয়েছিলাম।[১০]

এই সংকল্প যদি শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হত, তবে আমরা কেবলমাত্র সারস্বত সাধনায় মগ্ন শ্রীনন্দাকে ঘিরে গড়ে ওঠা এক কাহিনি বিশ্ব পেতাম।

প্রাপ্ত বাস্তব বিশ্ব →

শ্রীনন্দাকে তার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ডক্টর জনাথনের ধর্ষকামী উত্যক্ত কথাবার্তার সঙ্গে প্রতিনিয়ত মানসিকভাবে যুদ্ধ করতে হয়। সে ক্লান্তি বোধ করে। এই নিত্য মানসিক ক্লান্তি তাকে সংকল্পচ্যুত করে এবং একটি উপযুক্ত মানুষকে পুনর্বিবাহ করার ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে।

এবার মধ্যবয়স্কা মানসীকে কেন্দ্র ক'রে যে সম্ভাব্য বিশ্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেটি দেখে নেওয়া যাক। তারপর উপন্যাসে উভয় প্রকার সম্ভাব্য ও বাস্তব বিশ্বের অবতারণার ফলাফল আলোচিত হবে।

- মানসী কেন্দ্রিক সম্ভাব্য বিশ্বের ইঙ্গিত →

মানসীর সাথে একটি রাত্রের আকস্মিক শারীরিক মিলনের পর নীলাঞ্জন নিজের ইচ্ছার কথা মানসীকে জানায় –

> মানসীদি আমি চল্লিশ বছর ধরে একটি মেয়েকে ভালবেসেছি – তুমি সেই মেয়ে – আজ আমি তোমাকে পেয়েও হারাই কেমন করে? না মানসীদি, আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না ...[১১]

প্রাপ্ত বাস্তব বিশ্ব →

মানসী নীলাঞ্জনের প্রস্তাবে রাজি হয়নি। সে ফিরে গেছে তার স্বামীর কাছেই।

একই উপন্যাসে দুই নারীর বিপরীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন হতে দেখা যায়। মানসী সাময়িক আবেগকে প্রশ্রয় না-দিয়ে সংযমী ব্যক্তিত্বের পরিচয় রেখেছে। অন্যদিকে ভিতরে ভিতরে শেষ হয়ে যেতে থাকা শ্রীনন্দা পুনর্বিবাহের সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন নতুন এক পুরুষকে জীবনে অভ্যর্থনা জানায়, তখনই তার দুঃখময় জীবনে আলোর প্রবেশদ্বার উন্মোচিত হয়।

বলা বাহুল্য, প্রতিটি উপন্যাসেই বিভিন্ন সম্ভাব্য বিশ্ব ও সেগুলিকে প্রতিহত ক'রে কাহিনির বাস্তব বিশ্ব প্রতিভাত হয়। কিন্তু আমরা মাত্র দুটি উপন্যাসের সম্ভাব্য ও বাস্তব বিশ্বের প্রয়োগ

সার্থকতা বিশ্লেষণ করলাম। কারণ, এই দুটি উপন্যাসের সম্ভাব্য বিশ্বের বাস্তবায়নকে প্রতিহত ক'রে বাস্তব বিশ্বের প্রকাশ স্রষ্টার এক বিশেষ প্রবণতাকে ইঙ্গিত করছে। আর সেটি হল নারীবাদী ভাবাদর্শের প্রতি ঔপন্যাসিক নবনীতার ঝোঁক। সম্ভাব্য বিশ্বকে অঙ্কুরেই দমন ক'রে যে বাস্তব বিশ্বকে তিনি কাহিনিতে তুলে ধরেন, তাতে নারীর স্বাধীনমনস্কতা এবং স্বসিদ্ধান্তে জীবনের গতিপথ নির্ধারণের বলিষ্ঠতাই বারবার ফুটে ওঠে। নারীবাদী ভাবাদর্শের প্রকাশ নবনীতার 'ঘূর্ণি' এবং 'অ্যালবাট্রস' উপন্যাসের সম্ভাব্য বিশ্ব ও বাস্তব বিশ্বের গ্রন্থনায় আরও বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। আমরা তাই এই সংক্রান্ত বিস্তৃত বিশ্লেষণ সন্দর্ভের দশম অধ্যায়ে করেছি (দ্র. ১০.৩.১.৭)।

৮.৩. নবনীতা দেবসেনের আত্মজীবনীমূলক গল্পের বাস্তব বিশ্ব ও পাঠকের বোধ

নবনীতার আত্মজীবনীমূলক গল্পগুলির মধ্যে যেগুলির বিষয় তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ পরবর্তী সময়ের সাংসারিক বিবিধ কর্মকাণ্ড, সেইসব গল্পের প্রধান চারটি চরিত্র – লেখিকা স্বয়ং, তাঁর বয়স্কা মা এবং তাঁর ছোট ছোট দুটি মেয়ে। এই পরিবারে কোনও পুরুষ সদস্য নেই। গবেষণার জন্য নির্বাচিত গল্পগুলির মধ্যে আত্মজীবনীমূলক গল্পের তালিকায় রয়েছে 'পরীক্ষা', 'জীবে দয়া', 'নিমন্ত্রণরক্ষা', 'ভরতকথা', 'ভালোবাসা কারে কয়', 'আবার এসেছে আষাঢ়', 'মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর' এবং 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের মাতৃয়ার্কি পর্বের বারোটি স্কেচ।

উপরোক্ত গল্পগুলি পড়ার সময় পাঠকের বাস্তব বিশ্ব থেকে পাওয়া দুই ধরনের জ্ঞান সক্রিয় হয় –

(১) পুরুষবিহীন কোনও পরিবারের সমস্যাসঙ্কুল অবস্থা সংক্রান্ত জ্ঞান

(২) নবনীতা দেবসেনের ব্যক্তিগত জীবনের বিবাহবিচ্ছিন্নতা পর্বের মানসিক যন্ত্রণা সংক্রান্ত জ্ঞান, যা তাঁরই বিভিন্ন সাক্ষাৎকার এবং প্রবন্ধ থেকে পাওয়া যায়। যেমন – কল্যাণ মৈত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকার, সুদেষ্ণা বসুকে দেওয়া সাক্ষাৎকার, 'আমার রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ। সাক্ষাৎকারগুলির প্রাপ্তি-উৎস গ্রন্থপঞ্জিতে নির্দেশিত।

দ্বিতীয়টির জ্ঞান সব পাঠকের না-থাকলেও প্রথমটির জ্ঞান প্রায় সব প্রাপ্ত বয়স্ক পাঠকের মধ্যে বিদ্যমান। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় চিরকাল মেয়েদের জন্য কেবল ঘরের কাজ এবং পুরুষদের জন্য বাইরের কাজ নির্ধারিত। যুগের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যদিও মেয়েরা এখন বাইরের দুনিয়াতেও কর্মক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করছে, তবু আমাদের অধিকাংশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজপোষিত চিন্তাধারা প্রায়শই খুব বেশি প্রগতিশীল হতে পারেনি। এইরকম অবস্থায় কোনও একটি পরিবার যদি পুরুষশূন্য হয়, তবে সেই পরিবারের তথাকথিত অবলা নারীরা অতিশয় দুর্বিপাকে পড়বে, তাদের ভারি দিশাহারা অবস্থা হবে, এমনটাই আমাদের প্রত্যাশিত এবং শুধু প্রত্যাশিতই নয়, আমাদের চারপাশের বাস্তব বিশ্বে বেশিরভাগ সময় এমনটাই এখনো হতে দেখা যায়।

ওপরে উল্লিখিত গল্পগুলি নিঃসন্দেহে একেকটি হাস্যরসের ভাণ্ডার। কিন্তু একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে পাঠক গল্পগুলি পাঠকালে হাস্যরসে নিমজ্জিত হলেও, উপরোক্ত দুই ধরনের জ্ঞান এবং সংশ্লিষ্ট বাস্তব বিশ্ব সম্পর্কে বিস্মৃত হবেন না। বরং গল্পগুলি পড়তে পড়তে পাঠকের মনে বাস্তব বিশ্ব ও কাহিনির বাস্তব বিশ্বের নিরন্তর তুলনা চলতে থাকে এবং পাঠক যেন এক ধরনের বিস্ময় অনুভব করেন। কারণ, গল্পগুলির বিষয়, চরিত্রদের বাচনভঙ্গি, শব্দচয়ন কোনোকিছুই পাঠকের উপরোক্ত বাস্তব বিশ্বের জ্ঞানকে সমর্থন করে না। দুয়েকটি উদাহরণ দিলেই এটি স্পষ্ট হবে –

- মা বললেন – "খুকু, এই তো দিব্যি রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেছে। যা এইবেলা মেয়ের কাছে চট করে মোপেড চালানোটা শিখে নে বরং।" আমারও পছন্দ হল কথাটা। বয়েস হয়ে, মা দিনে ঘুমোন, রাতে জাগেন। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও অনেক রাত্তির অবধি জেগে জেগে গুলতানি করি।[১২]
- ভারতবর্ষে নাকি গণতন্ত্র চালু। এ বাড়িতে ঘোর রানীতন্ত্র। আগে একজন রাজামশাই ছিলেন, তিনিই ছিলেন মহারানীর মুখ্য প্রজা। আর গৌণ প্রজা ছিলাম আমি। এখন রাজামশাই নেই, মহারানী আছেন, আর আছেন তাঁর দুই সখী, দুটি খুদে রাজকন্যে। ট্রেনিং পিরিয়ড চলছে তাঁদের, আপাতত অ্যাপ্রেন্টিস আছেন। এঁরা রাজদণ্ড হাতে নিয়েই জন্মেছেন, তাই এঁদের ন্যাচারাল ওয়ানডার বলা যায়। তিনজনের কিন্তু মোট প্রজা মাত্র একটিই। আমি। গৌণ বলতেও আমি, মুখ্য বলতেও আমি।

  আমি আবার প্রজা বাই নেচার। প্রজা বাই বার্থ। বশংবদ, প্রভুভক্ত।[১৩]
- হোলনাইট প্রোগ্রামগুলো আমাদের মা-মেয়ের এখন যুগলবন্দী হয়ে গেছে। ঠিক লুচি ভাজার প্রসেসে কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। বেলা, ভাজা, খাওয়া। লুজশীটে আমি একটা একটা প্রশ্নের গরম গরম উত্তর লিখে এগিয়ে দিচ্ছি, আর শেষে লুফে নিয়ে একটা একটা প্রশ্নোত্তর কপাকপ গিলে ফেলছে।[১৪]

বিবাহবিচ্ছেদের পর নবনীতা যখন কলকাতার বাড়িতে থাকতেন, তখন তাঁর বৃদ্ধা মা আর দুটি ছোট ছোট মেয়ে – এঁদের নিয়েই ছিল তাঁর সংসার। পুরুষবিহীন সংসারের ছবি কেমন হতে পারে, তা আমরা চিত্রকল্পের অধ্যায়ে এইসব গল্প আলোচনাকালে দেখেছি। এইসব গল্পে আমরা দেখেছি, একটা সংসার পুরুষহীন হলেও সেখানে কোনোকিছুর ঘাটতি নেই, জীবন তার নিজস্ব ছন্দে বয়ে চলছে। লেখিকার নিজের বক্তব্যেই এইসব গল্পের সারকথা উঠে এসেছে –

> ... একক মায়ের সংসারের ছবিটাও প্রচলিত ধারণার বিপরীতে গিয়ে, মেয়েদের শক্তির ছবি। তিন প্রজন্মের পরিবারে সবাই মেয়ে। পুরুষ নেই, তবুও কিন্তু তারা সুস্থ মনে, হাসিখুশি জীবনে, হইচই করে, খেটেখুটে, হোঁচট খেয়ে, দাঁড়িয়ে উঠে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে-বর্তে থাকতে পারে।[১৫]

নবনীতা আসলে বাস্তব বিশ্বের ওপর কাহিনির বাস্তব বিশ্বকে চাপিয়ে দিয়ে (superimposed) পাঠকের ছক নবীকরণ (schema refreshment) করতে চেয়েছেন। বেশিরভাগের ধারণাতেই পরিবার মানে তা পুরুষযুক্ত এবং তা যদি না হয়, তাহলে সেই পারিবারিক পরিসর সদা দুঃখময়। কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও যে সম্ভব, তা পাঠকের ধারণায় এনে দিয়েছেন নবনীতা।

তিনি একটি বিকল্প পারিবারিক চিত্র উপস্থাপন করেছেন। সম্ভাব্য বিশ্ব, বাস্তব বিশ্ব সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনার অন্যতম বিশিষ্ট তাত্ত্বিক Ryan-এর মতে,

> The pragmatic purpose of counterfactuals is not to create alternate possible worlds for their own sake, but to make a point about AW. [১৬]

AW = Actual World

নবনীতা কার্যত বাস্তব বিশ্বের এমনই একটা 'point' তৈরি করতে চেয়েছেন। তাই ওইসব গল্পের অন্তর্গত বাস্তব বিশ্ব পাঠককে ভাবতে শেখায় যে আমাদের চারপাশের বাস্তব বিশ্বেও এমনটা হওয়া সম্ভব। পুরুষহীন পরিবারও আর পাঁচটা পরিবারের মতোই রীতিমতো পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকতে পারে।

উল্লেখ্য, Cambridge Dictionary অনুযায়ী, 'superimpose' শব্দের অর্থ –

> to put especially a picture, words etc. on top of something else, especially another picture, words etc. so that what is in the lower position can still be seen, heard, etc.[১৭]

এবার চিত্র ১৩-এর সাহায্যে পাঠকের বোধে বাস্তব বিশ্বের ওপর গল্পগুলির অন্তর্গত বাস্তব বিশ্ব কীভাবে চেপে (superimposed) আছে, তা দেখানো হল –

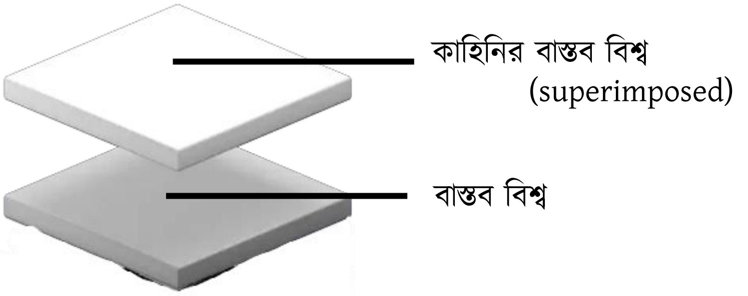

চিত্র ১৩: গল্প পাঠকালে পাঠকের পুরুষবিহীন পরিবারের সাংসারিক পরিসর সংক্রান্ত বোধ

এভাবে পাঠকের বোধের জগতে বাস্তব বিশ্বের স্তরের ওপর যখন কাহিনির বাস্তব বিশ্ব চাপতে থাকে, তখন কিন্তু মোটেই বাস্তব বিশ্ব সংক্রান্ত পুরনো জ্ঞান তলিয়ে যায় না। বরং পাঠক দুটি

বিশ্বকেই একসাথে বুঝতে থাকেন এবং তুলনা করতে থাকেন। গল্পের নির্মিত বাস্তব বিশ্ব আমাদের চারপাশের বাস্তব বিশ্ব থেকে কীভাবে ভিন্নধর্মী হয়ে উঠেছে, তা পাঠক বুঝতে পারেন এই superimposition-এর মাধ্যমে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাহিনির বাস্তব বিশ্ব (textual actual world)-এর superimposition-এর তত্ত্ব নিয়ে আসেন R. Raghunath তাঁর "Possible Worlds Theory and Counterfactual Historical Fiction" শীর্ষক গ্রন্থে।[১৮] তবে সেটি ছিল প্রধানত বিপ্রতীপ ঐতিহাসিক আখ্যানের (counterfactual historical fiction) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমরা বর্তমান গবেষণায় দেখলাম, বাস্তব বিশ্বের ওপর কাহিনির বাস্তব বিশ্বকে চাপিয়ে দেওয়ার তত্ত্ব নবনীতা দেবসেনের আত্মজীবনীমূলক গল্পগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কাহিনিতে প্রদর্শিত বাস্তব বিশ্ব আসলে আমাদের জ্ঞাত বাস্তব বিশ্বের সাপেক্ষে একটি সম্ভাব্য বিশ্ব, যাকে ইচ্ছা করলেই আমরাও বাস্তবায়িত করতে পারি। এমন এক সূক্ষ্ম বার্তা যেন প্রতিটি গল্পের মাধ্যমের পাঠকের কাছে পৌঁছে যায়।

৮.৪. 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের পৌরাণিকী পর্বের সম্ভাব্য বিশ্বের গুরুত্ব ও পাঠকের বোধ

'সীতা থেকে শুরু' গ্রন্থের ভণিতা অংশেই লেখিকা জানিয়েছেন যে তিনি 'পৌরাণিকী' পর্বে মহাকাব্যের কাহিনিকেই অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কেবল কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে কিছু সম্ভাব্য উপকাহিনি পরিবেশন করেছেন। আমরা সেসব এর আগে বিভিন্ন আলোচনা সূত্রে দেখেছি। আমরা বলতে পারি, এই সম্ভাব্য কল্পকাহিনিগুলো আসলে মূল মহাকাব্যের সম্ভাব্য বিশ্ব ছিল, যা 'সীতা থেকে শুরু'-র অন্তর্গত বাস্তব বিশ্বে পরিণত হয়েছে। 'পৌরাণিকী' পর্বের 'মূল রামায়ণ' থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল –

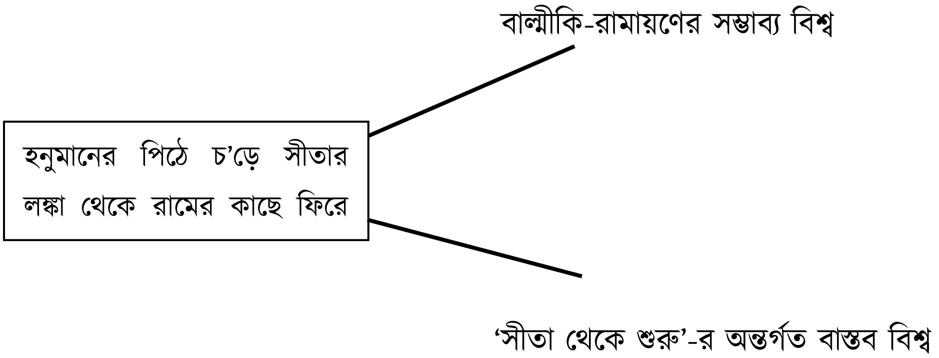

আবার, একইভাবে 'সীতা থেকে শুরু'-র মধ্যেও রয়েছে বিভিন্ন সম্ভাব্য বিশ্ব। সেগুলির মধ্য থেকেই একটিকে বেছে নিয়ে নিচে দেখানো হল যে পাঠক কীভাবে সেই সম্ভাব্য বিশ্বকে উপলব্ধি করেছেন। এর থেকে বোঝা যাবে লেখিকা কীভাবে পাঠকের বোধের জগতে সাড়া ফেলতে চেয়েছেন। পাঠকের মনো-পরিসর (mental space) এক্ষেত্রে কীভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়, সেটি বিশ্লেষণ করলেই পাঠকের বোধের প্রকৃতি ও লেখিকার উদ্দেশ্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

> Mental spaces are defined as short-term cognitive representations of states of affairs, constructed on the basis of the textual input on the one hand, and the comprehender's background knowledge on the other [১৯]

'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের 'রাজকুমারী কামবল্লী' গল্প পাঠকালে একজন পাঠকের কাছে একদিকে আছে রামায়ণ সংক্রান্ত তাঁর এতদিনের পটভূমিক জ্ঞান (background knowledge) এবং অন্যদিকে আছে নব-পঠিত 'রাজকুমারী কামবল্লী' গল্পে রামায়ণ সংক্রান্ত কয়েকটি আদান (input), নবনীতার ভাষায় যা 'বিকল্প সম্ভাবনা'। এই পটভূমিক জ্ঞান এবং আদানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে পাঠকের ক্ষণস্থায়ী মনো-পরিসর (mental space)।

> Mental space theory offers a unified and consistent means of understanding reference, co-reference, and the comprehension of stories and descriptions whether they are currently real, historical, imagined, hypothesised or happening remotely.[২০]

'সীতা থেকে শুরু'-র অন্তর্গত 'রাজকুমারী কামবল্লী' গল্পে শূর্পণখা সীতাকে বলেছে –

এই স্বামী, এই দেবরটি, এরা কিন্তু তোমার **লোক মোটেই ভালো নয়**, সীতা। এরা কেউ তোমার উপযুক্ত নয়। তোমার স্বামী আমার রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছিলেন, যখন তুমি স্নানে গিয়েছিলে। ... **চলো তুমি আমার সঙ্গে**, যেকোনো **রাক্ষসভাইকে বিয়ে করে অনেক সুখী হবে**। সীতা দুই কানে হাত দিয়ে শিউরে উঠে বললেন – "... আমার এ-জীবনে আর **দ্বিতীয় স্বামী সম্ভব নয়**।"[২১]

আমরা বুঝতে পারছি যে শূর্পণখা যে-কথা বলেছে, তা সম্পূর্ণরূপে তার নিজস্ব ইচ্ছা, যা কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু যদি বাস্তবায়িত হতো, তাহলে গল্পের বাস্তব বিশ্ব একেবারে বদলে যেত। শূর্পণখার এই ইচ্ছার ফলে তৈরি হয়েছে গল্পের অন্তর্গত সম্ভাব্য বিশ্ব। এই সম্ভাব্য বিশ্ব পাঠকের মনে উপলব্ধ হয় পরপর কতকগুলি মনো-পরিসর তৈরির মাধ্যমে। রামায়ণ সংক্রান্ত 'background knowledge' এবং উদ্ধৃতাংশে মোটা হরফে চিহ্নিত একেকটি 'textual input' কীভাবে পাঠকের মনো-পরিসর তৈরি করেছে, তা ক্রমান্বয়ে নিচে দেখানো হল, যা থেকে পাঠকের বোধের ক্রম স্পষ্ট হয়েছে –

(১) রামায়ণের রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, শূর্পণখা সংক্রান্ত পটভূমিক জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ভিত্তি পরিসর :

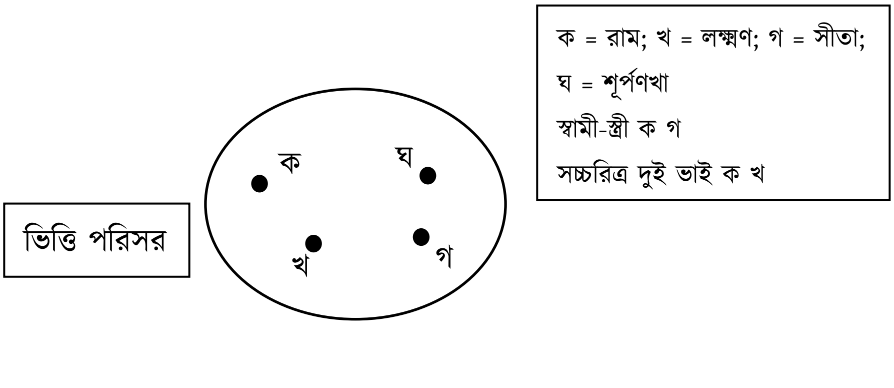

চিত্র ১৪: পাঠকের মনো-পরিসর

(২) "এই স্বামী, এই দেবরটি, এরা কিন্তু তোমার লোক মোটেই ভালো নয়"

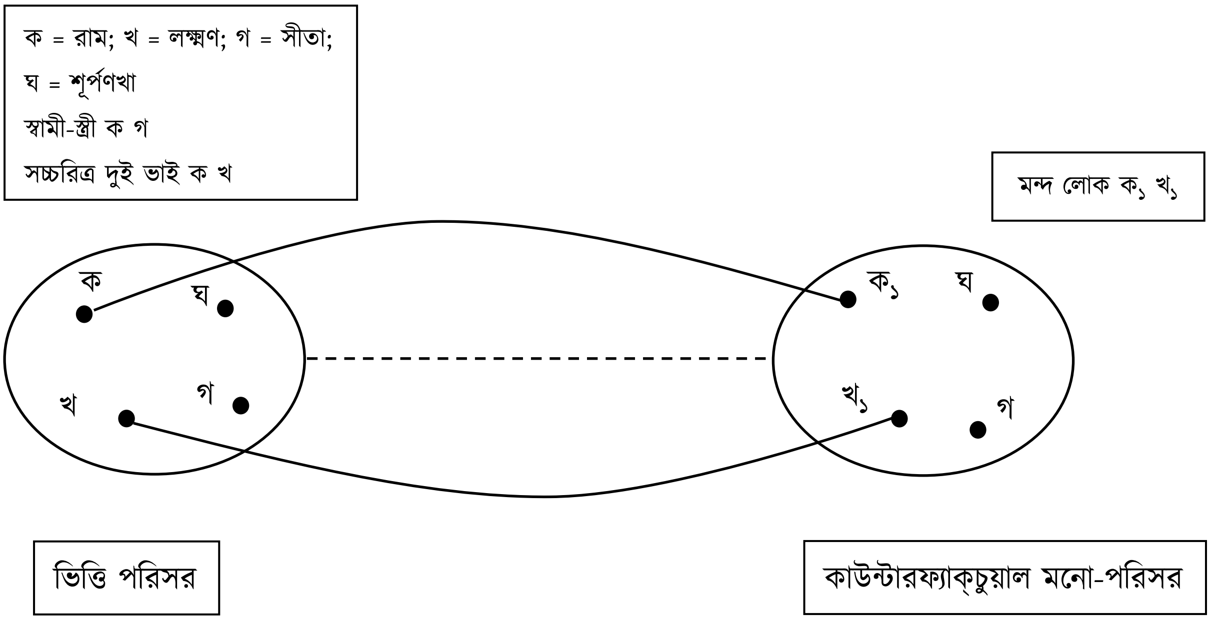

চিত্র ১৫: পাঠকের মনো-পরিসর

(৩) “চলো তুমি আমার সঙ্গে”

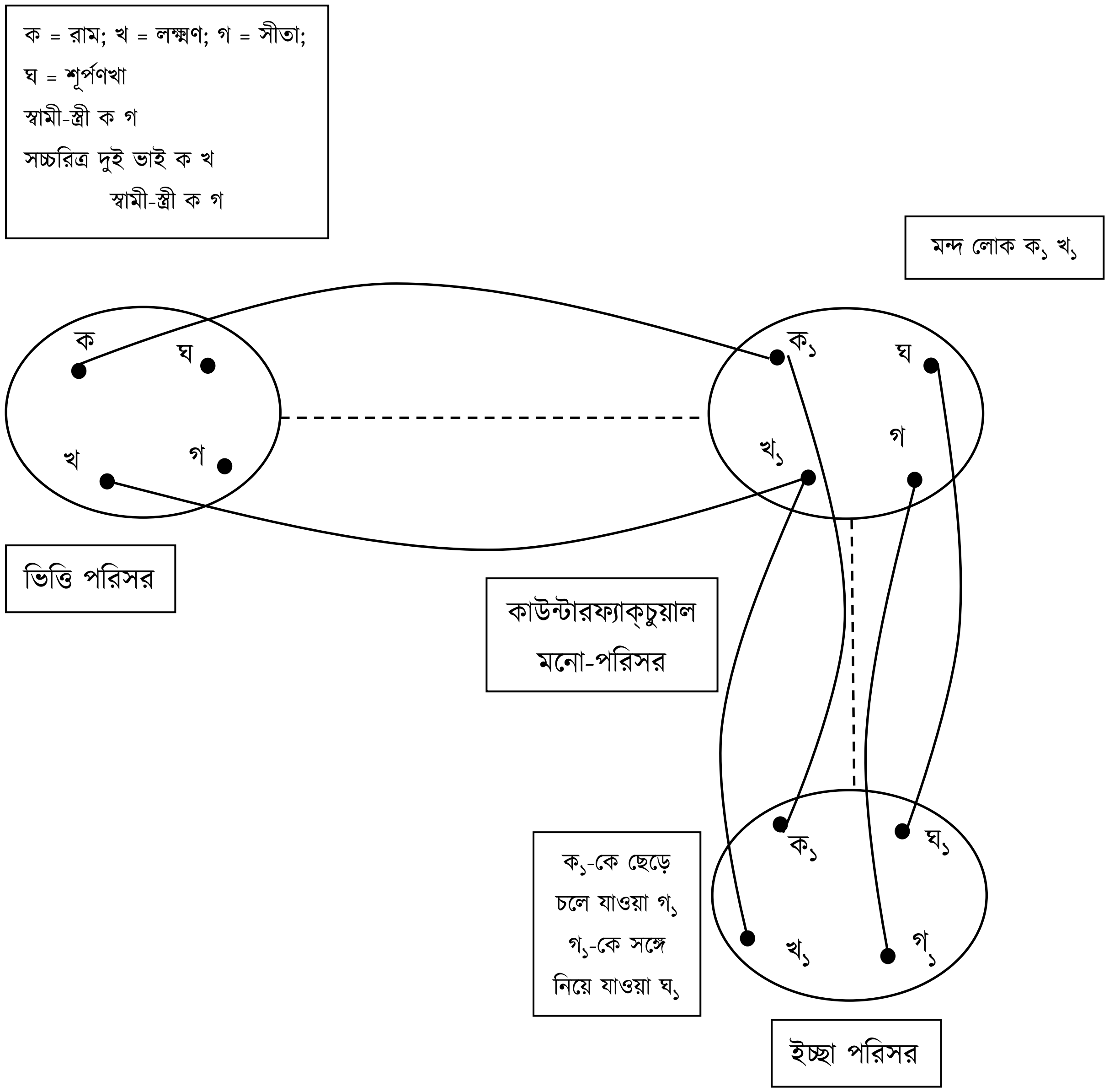

চিত্র ১৬: পাঠকের মনো-পরিসর

(৪) “যেকোনো রাক্ষসভাইকে বিয়ে করে অনেক সুখী হবে”

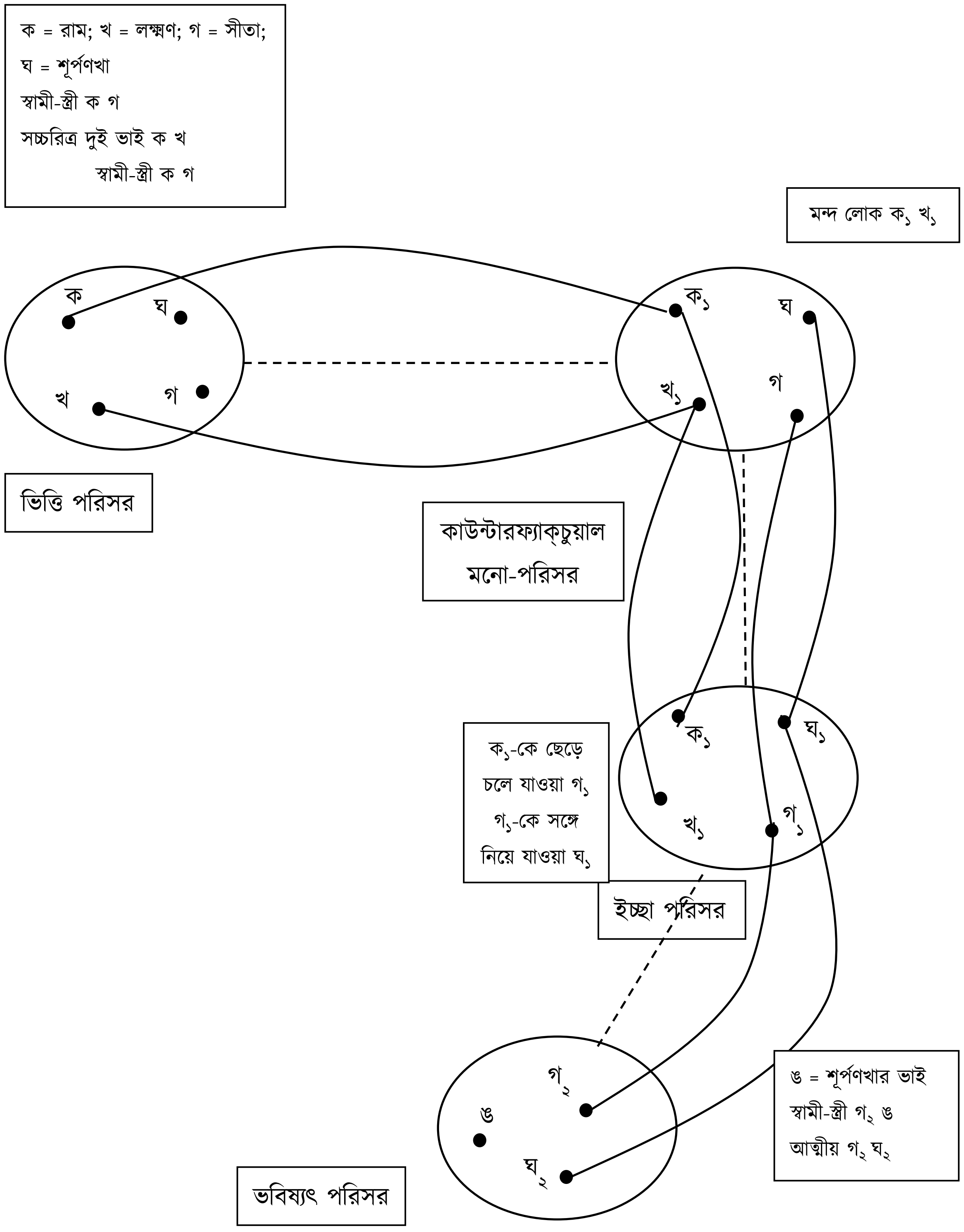

চিত্র ১৭: পাঠকের মনো-পরিসর

(৫) “আমার এ-জীবনে আর দ্বিতীয় স্বামী সম্ভব নয়”

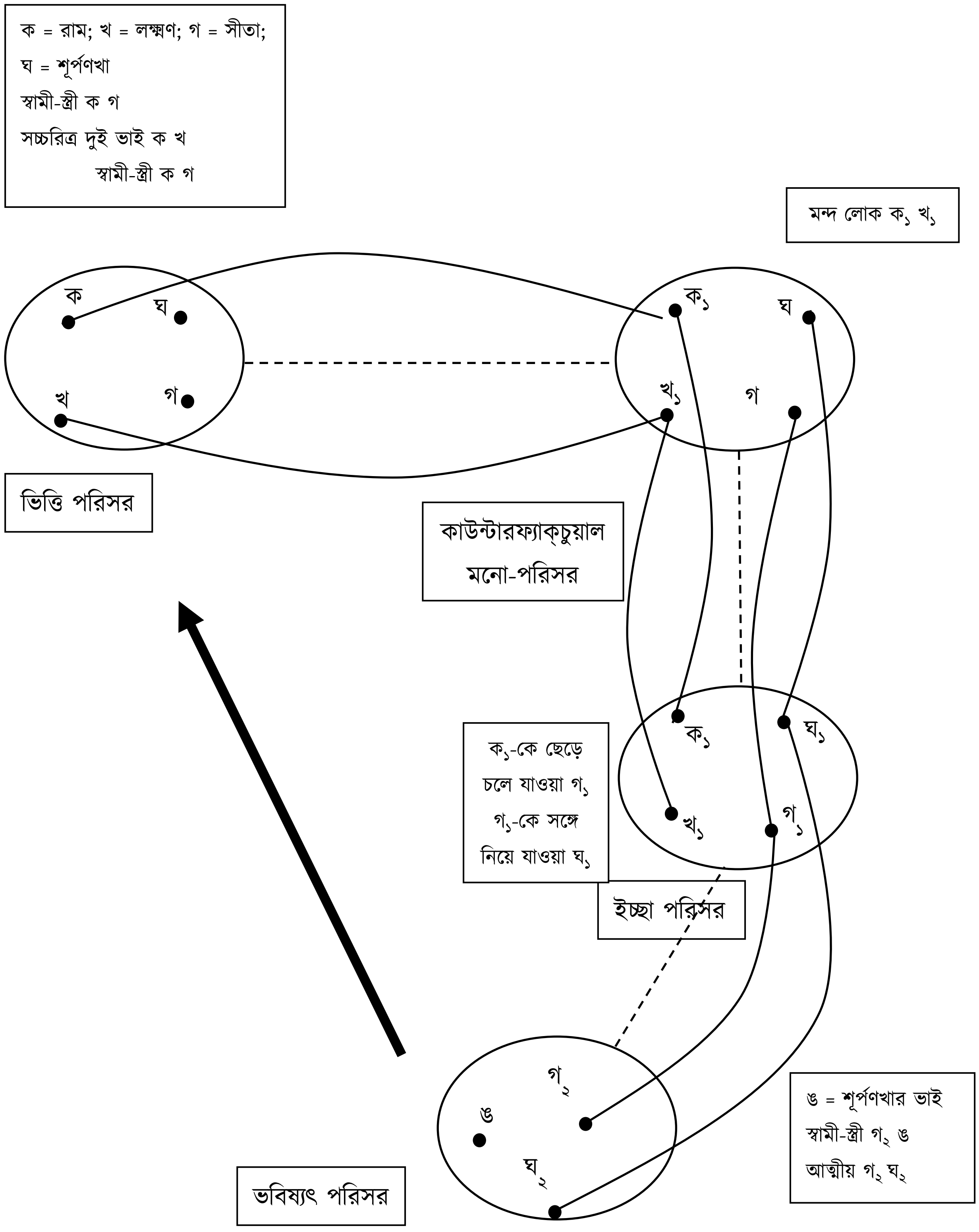

চিত্র ১৮: পাঠকের মনো-পরিসর

ভিত্তি পরিসর তৈরি হয়েছে পাঠকের রামায়ণ সম্বন্ধে পূর্বের জ্ঞান অনুসারে। 'রাজকুমারী কামবল্লী' কাহিনির বাস্তব বিশ্ব অনুসারে কাউন্টারফ্যাক্চুয়াল মনো-পরিসর তৈরি হয়েছে। কারণ, রামায়ণের বাস্তব বিশ্বকে 'fact' হিসাবে ধরে নিলে, 'রাজকুমারী কামবল্লী'-র বাস্তব বিশ্বের সাপেক্ষে উদ্ভূত মনো-পরিসরটিকে বলতে হবে আরোপিত বা কৃত্রিম অর্থাৎ 'counterfactual'। পরবর্তী দুটি পরিসর অর্থাৎ ইচ্ছা পরিসর এবং ভবিষ্যৎ পরিসরে কাহিনির সম্ভাব্য বিশ্ব নিহিত। কী উদ্দেশ্যে স্রষ্টা নবনীতা পাঠকের মনে এইরকম মনো-পরিসর (mental space) তৈরি করলেন, এখন সেটাই দেখার।

চিত্রিত মনো-পরিসর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে নারী তার অসচ্চরিত্র স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে এবং উপযুক্ত কাউকে জীবনসঙ্গী ক'রে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। নবনীতা শূর্পণখার ইচ্ছের আচ্ছাদনে মুড়ে আদিকাব্যের নায়িকা, যিনি ভারতীয় সমাজ-মানসিকতায় একজন সতী-নারী, তাঁকেই এইরকম সাহসী নারীর দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। কারণ তাহলেই পাঠক অনেক বেশি মাত্রায় স্পন্দিত হবেন।

আরও বোঝা যায়, সীতা শূর্পণখার প্রস্তাবে সাড়া দেওয়ার পর শূর্পণখা সীতাকে নিয়ে চলে যাওয়ার ফলে সীতা-শূর্পনখার একটি জোট তৈরি হয়েছে, যা রাম-লক্ষ্মণ জোটের বিরোধী। অথচ পাঠকের এতকালের জ্ঞান অর্থাৎ ভিত্তি পরিসর (base space) অনুসারে, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এক পক্ষের এবং রাবণের বোন শূর্পণখা বিরোধী পক্ষের। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে পাঠকের মনো-পরিসরে নবনীতার তৈরি করা তৈরি করা সীতা-শূর্পনখার জোটটি আসলে দুরাচারী পুরুষপক্ষের বিরুদ্ধে সংগঠিত নারীপক্ষ, পুরুষশাসিত সমাজে যার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

আমরা আগেই দেখেছি, বাস্তব বিশ্ব এবং অবাস্তব বিশ্বের যোগে নির্মিত হয় একটি কাহিনি-মহাবিশ্ব (text universe)। 'রাজকুমারী কামবল্লী' গল্পে শূর্পণখার ইচ্ছার জগত হল কাহিনির অবাস্তব বিশ্ব (non-actual world), যা কাহিনিতে বাস্তবায়িত হল না। পাঠকের বোধে পরপর কয়েকটি মনো-পরিসর তৈরি হলেও, সীতা যে মুহূর্তে উচ্চারণ করেছে, 'আমার এ-জীবনে আর দ্বিতীয় স্বামী সম্ভব নয়', তখনই এই বাক্য পাঠককে ভবিষ্যৎ পরিসর থেকে আবার ভিত্তি পরিসরে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। গল্পের সীতা রামের চারিত্রিক ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হয়েও শেষ পর্যন্ত রামের ঘরণী হয়েই থেকে গিয়েছে। কারণ –

প্রথমত, সীতার নতস্বভাব শূর্পণখার ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত হতে দিল না।

দ্বিতীয়ত, রামায়ণের কাহিনিকে সম্পূর্ণ বদলে দেওয়া লেখিকার উদ্দেশ্য নয়। তিনি কেবল প্রাচীন কাহিনির ফাঁকে ফাঁকে "বিকল্প সম্ভাবনার রং"[২২] ধরাতে চেয়েছেন।

৮.৫. উপসংহার

যদি আমাদের চারপাশের বাস্তব বিশ্ব (Actual World)-কে ১ ধরা হয়, তাহলে যেকোনও একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞান বিশ্ব (Knowledge World)-এর পরিমাণ ≤ ১ হবে। অর্থাৎ, কোনও একজন ব্যক্তির পক্ষে চারপাশে যা কিছু বাস্তবায়িত হচ্ছে, তার থেকে কম পরিমাণ জানা সম্ভব অথবা খুব বেশি জানলে, যা কিছু বাস্তবায়িত হচ্ছে ততটাই জানা সম্ভব। যদিও দ্বিতীয়টির সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে।

আখ্যানের অন্তর্গত চরিত্র, ঘটনা, স্থান, কাল ইত্যাদি উপাদানের সাহায্যে লেখক যে আখ্যান-বিশ্ব পাঠকের সামনে হাজির করেন, সেই আখ্যান-বিশ্বকে বোঝার জন্য পাঠকের

সহায়ক হয় তাঁর নিজস্ব বাস্তব বিশ্বের জ্ঞান। ফলে আখ্যানের অন্তর্গত উক্ত উপাদানগুলি স্বাভাবিকভাবেই পাঠক-ভেদে কখনো জ্ঞানের ছক সংরক্ষণ করে, কখনো বৃদ্ধি করে, কখনো-বা নবীকরণ করে। এভাবে পাঠকের পূর্বজ্ঞানের সাহায্যে আখ্যানকে ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য আসলে লেখকের নির্বাচিত আখ্যানকৌশল এবং আখ্যানকৌশলে নিহিত জীবনাদর্শের সংযোগকে মর্যাদা দেয়।

৮.৬. তথ্যসূত্র

১। Peter Stockwell, *Cognitive Poetics: An Introduction* (London and New York: Routledge, 2002), 92-93.

২। Joanna Gavins and Gerard Steen (eds.), *Cognitive Poetics in Practice* (London: Routledge, 2003), 86.

৩। Gavins and Steen, *Cognitive Poetics in Practice*, 86.

৪। Gavins and Steen, *Cognitive Poetics in Practice*, 86.

৫। নবনীতা দেবসেন, *ফিনিক্স*, ২য় সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৫), ১০।

৬। দেবসেন, *ফিনিক্স*, ৬৭।

৭। দেবসেন, *ফিনিক্স*, ৫১।

৮। দেবসেন, *ফিনিক্স*, ২৫।

৯। দেবসেন, *ফিনিক্স*, ২১।

১০। নবনীতা দেবসেন, *দ্বিরাগমন*, ৩য় সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৭), ২৯

১১। দেবসেন, *দ্বিরাগমন*, ৫২।

১২। নবনীতা দেবসেন, "মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর," *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ১৩।

১৩। নবনীতা দেবসেন, "মাতৃয়ার্কি," *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২৬৩।

১৪। নবনীতা দেবসেন, "পরীক্ষা," *গল্পসমগ্র ১*, ৭ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৯), ১৬২-১৬৩।

১৫। নবনীতা দেবসেন, "জীবনে অনেক পেয়েছি," সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সুদেষ্ণা বসু, *নানারঙের নবনীতা*, (কলকাতা: পত্রভারতী, জানুয়ারি ২০২০), ৩৯৮।

১৬। Marie-Laure Ryan, *Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory* (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1991), 48.

১৭। *Cambridge International Dictionary of English* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), s.v. “superimpose”.

১৮। Riyukta Raghunath, *Possible Worlds Theory and Counterfactual Historical Fiction* (Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020), 79.

১৯। Gavins and Steen, *Cognitive Poetics in Practice*, 89.

২০। Stockwell, *Cognitive Poetics*, 96.

২১। নবনীতা দেবসেন, “রাজকুমারী কামবল্লী,” *গল্পসমগ্র* ২, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২২৮।

২২। নবনীতা দেবসেন, “সীতা থেকে শুরু,” *গল্পসমগ্র* ২, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২০৯।

নবম অধ্যায়

নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের অপরারপর বোধগত শৈলী অনুসন্ধান

৯. নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের অপরারপর বোধগত শৈলী অনুসন্ধান

৯.১. ভূমিকা

সন্দর্ভের দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে পাঠক কীভাবে নবনীতা দেবসেনের গল্প-উপন্যাসের প্রধান প্রধান শৈলীগত বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে পারেন। কিন্তু ওইসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, যেগুলি বর্তমান গবেষণার সাপেক্ষে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাই বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিহ্নিত করে পাঠকের সংশ্লিষ্ট বোধগত প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করব।

৯.২. পদ্ধতি

বর্তমান অধ্যায়ে পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে বোধগত শৈলীবিজ্ঞানের ছকবদ্ধতা (schematicity), রূপক (metaphor), সম্মুখন-পশ্চাদন পার্থক্য (figure-ground distinction) এবং প্রতিনিধিত্বশীলতা (prototypicality)। এই চারটি পদ্ধতির মধ্যে প্রথম দুটির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে [দ্র. ২.২] এবং তৃতীয় পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে [দ্র. ৪.২]। চতুর্থ পদ্ধতির বিবরণ নিচে দেওয়া হল –

প্রতিনিধিত্বশীলতা বা মৌলিক প্রতিমাময়তা (Prototypicality)

একগুচ্ছ বস্তু বা একগুচ্ছ অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে আমাদের মনের মধ্যে একেকটি প্রতিচ্ছবি (mental representation) গড়ে ওঠে, যার ফলে বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের ধারণা (concept) তৈরি হয়। ধারণা তৈরি হয় ওইসব বস্তু কিংবা অভিজ্ঞতার সংবর্গায়নের (categorization) ভিত্তিতে। বেশ কিছু সংখ্যক দ্রব্য বা ঘটনা বা সম্পর্ক বা আবেগ ইত্যাদি যেকোনও বিষয় তাদের সমজাতীয় গঠন, সমজাতীয় কার্যকারিতা বা সমজাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে গুচ্ছাকারে

একেকটি সমধর্মী সমষ্টি (set) তৈরি করে। বিভিন্ন সমধর্মী সমষ্টির দ্বারাই আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে সজ্জিত থাকে। এই প্রত্যেকটি সমধর্মী সমষ্টি হল পৃথক পৃথক সংবর্গ (category)। যেমন –

সংবর্গ: /খেলা/

উদাহরণ:

- ক্রিকেট
- ফুটবল
- কবাডি
- লুডো
- কাটাকুটি খেলা
- নাম পাতানো
- ইকিড়-মিকিড়
- রুবিক স্কোয়ার মেলানো
- ভিডিও গেম

আমরা বুঝতে পারছি যে ওপরের উদাহরণগুলোর মধ্যে কোনোটা কোনোটা খুব ভালো উদাহরণ। যেমন- ক্রিকেট, ফুটবল। কোনোটা কোনোটা মোটেই খুব একটা ভালো উদাহরণ নয়। যেমন- নাম পাতানো, ইকিড়-মিকিড়। যেকোনও সংবর্গের অন্তর্গত এইরকম খুব ভালো, কম ভালো ও খারাপ উদাহরণের জন্যই Wittgenstein এবং Eleanor Rosch যেকোনো সংবর্গের প্রতিনিধিত্বশীল রূপাদর্শ (prototypical model)-এর কথা বলেছেন।

> …our cognitive system for categorisation is not like an ‘in or out’ filing cabinet, but an arrangement of elements in a **radial** structure or network with **central** good examples, **secondary** poorer examples, and **peripheral** examples.[১]

আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রতিটি উদাহরণের এমন কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, যার ভিত্তিতে উদাহরণগুলি একটি নির্দিষ্ট সংবর্গের সদস্যরূপে বিবেচিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় (central) উদাহরণগুলি সবচেয়ে বেশি মাত্রায় সংশ্লিষ্ট সংবর্গের বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়। এই উদাহরণগুলিকে তাই বলা হয় আদি-প্রতিমা (prototype)। প্রান্তীয় (peripheral) উদাহরণগুলি সবচেয়ে কম

মাত্রায় সংশ্লিষ্ট সংবর্গের বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়। আর এই দু'য়ের মাঝের স্তরে থাকে গৌণ (secondary) উদাহরণসমূহ। এক কথায় বলা যায়, একেকটি সংবর্গ হল একগুচ্ছ বৈশিষ্ট্যের সমাহার। বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় উদাহরণগুলির বৈশিষ্ট্যসমূহ সংশ্লিষ্ট সংবর্গকে এক প্রকার সংজ্ঞায়িত করে। তাই এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল সংবর্গের প্রতিনিধিত্বশীল বৈশিষ্ট্য। যেমন – ভারতীয় ক্রীড়া সংস্কৃতির ভিত্তিতে আমাদের ভারতীয়দের মনে 'খেলা' সংবর্গ গড়ে ওঠে নিম্নরূপে –

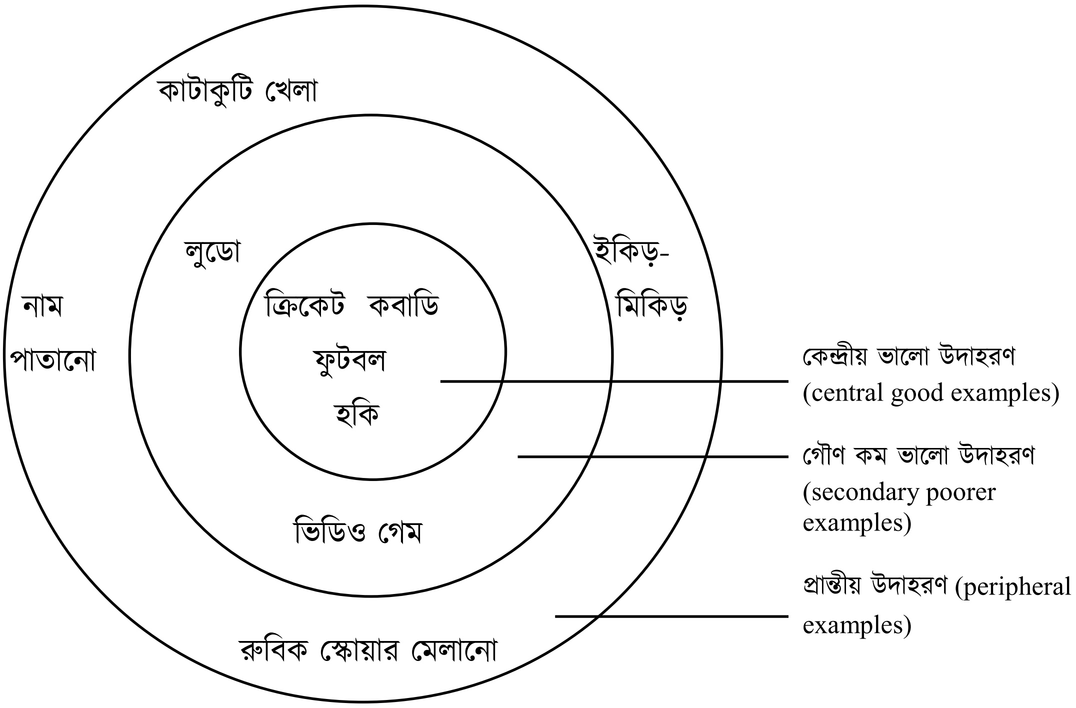

চিত্র ১৯: 'খেলা' সংবর্গের মৌলিক প্রতিমাময়তা বা প্রতিনিধিত্বশীলতা

চিত্র ১৯-এ কয়েকটি খেলার উল্লেখ ক'রে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে। প্রতিনিধিত্বশীলতার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ –

১) ভারতের মতো দেশে ক্রিকেট ভীষণ প্রচলিত ব'লে এর অবস্থান কেন্দ্রে। এটি নিঃসন্দেহে 'খেলা' সংবর্গের আদি-প্রতিমা। কিন্তু ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনার মতো দেশ, যেখানে ফুটবলের স্থান সব খেলার ওপরে, সেখানের মানুষের ধারণায় 'খেলা' সংবর্গের সদস্য হিসাবে ক্রিকেটের অবস্থান রেডিয়ালের কেন্দ্রে একেবারেই নয়।

২) আবার হয়তো কোনও একটি দেশে এমন কোনও খেলা প্রচলিত আছে, যার সম্পর্কে ভারতীয়রা জানেই না। ফলে সেই দেশের অধিবাসীদের ধারণায় 'খেলা' সংবর্গের সদস্য হিসাবে ওই নির্দিষ্ট খেলাটির অস্তিত্ব থাকলেও, ভারতীয়দের ধারণায় তা নেই। এবার একদিন কোনও ভারতীয় যদি ওই খেলাটির বিষয়ে অবগত হয়, তখন তাকে নিজের ধারণায় থাকা 'খেলা' সংবর্গের অন্যান্য উদাহরণের সঙ্গে নতুন খেলাটিকে আলগোছে একত্র ক'রে (softly assemble) নিতে হবে।

৩) সেই সঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ভিডিও গেম আবিষ্কারের আগে এটি স্বাভাবিকভাবেই মানুষের ধারণায় ছিল না। পরে এটির অন্তর্ভুক্তি হয়েছে।

সুতরাং, দেশ-কাল ভেদে একই সংবর্গের প্রতিনিধিত্বশীলতা বদলে যেতে পারে। অনেক সময় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তারতম্যের ফলেও কোনও সংবর্গের অন্তর্গত আদি-প্রতিমাগুলো পরিবর্তিত হতে পারে।

৯.৩. বিশ্লেষণ ও আলোচনা

৯.৩.১. 'আমি অনুপম' উপন্যাসের বোধগত শৈলী বিশ্লেষণ

'আমি অনুপম' (রচনাকাল: ১৯৭৬, প্রকাশকাল: ১৯৭৮) উপন্যাসশিল্পের জগতে নবনীতা দেবসেনের বলিষ্ঠ লেখনীর অন্যতম স্বাক্ষর। বিশ শতকের সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলনের উত্তাল রাজনৈতিক প্রতিবেশে দাঁড়িয়ে বাংলা আখ্যানে আংশিকভাবে হলেও এই সময়কে তুলে ধরার অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব এই উপন্যাসের। তবে এটি একটি আদ্যোপান্ত

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। কারণ ক্রিয়া অপেক্ষা ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া নিয়েই গোটা উপন্যাসের কারবার।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক, সাংবাদিক ও অধ্যাপক অনুপম রায় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। ‘ডেইলি নিউজ’ সংবাদপত্রের ‘রয়’জ কর্নার’-কে হাতিয়ার ক’রে তিনি নিয়মিত দেশ তথা বিশ্বরাজনীতির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লেখেন। রেডিওতেও তাঁর মতো একজন দক্ষ পলিটিক্যাল কমেন্টেটরের আছে গুণমুগ্ধ শ্রোতাসমাজ। বাগ্মী অনুপমের দেশজোড়া এই খ্যাতি এনে দিয়েছে তাঁর জ্ঞান ও মেধা। এরই পাশাপাশি তাঁকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবেগ উন্মাদনা অধ্যাপক অনুপমের খানিক আত্মগৌরব বৃদ্ধি করে বৈকি! আর অন্যদিকে একের পর এক নারীসঙ্গ মধ্যবয়স্ক অনুপমের অবিবাহিত কর্মব্যস্ত জীবনে বিনোদনের রসদ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এই সবকিছুকে প্রেক্ষাপটে রেখে অনুপম রায়ের মনের গহন প্রদেশে বিচরণ করাই এই উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। কীভাবে উপন্যাসটিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মনোশৈলীর (mind style) একেকটি দিক ধরা দিয়েছে, সেটিই আমরা এবার ক্রমান্বয়ে বোঝার চেষ্টা করব।

লেখক, কথক কিংবা চরিত্রের মনোশৈলী সম্পর্কে প্রথম ধারণা দেন ইংরেজ ভাষাবিদ Roger Fowler তাঁর *Linguistics and the Novel* (1977) গ্রন্থে। পরবর্তীকালে Fowler-এর ভাবনাকে আরও স্বচ্ছতা দিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক Elena Semino মনোশৈলী (mind style) এবং আদর্শগত দৃষ্টিকোণ (ideological point of view)-এর কথা বলেছেন।[২] তাঁর মতে, ব্যক্তি যখন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় বা রাজনৈতিক আদর্শগত ভাবনা পোষণ করেন এবং অবশ্যই একটা বৃহৎ জনসংখ্যা সেই একই আদর্শে বিশ্বাসী হয়, তখন সেই জাতীয় চিন্তনপ্রকৃতির নাম আদর্শগত দৃষ্টিকোণ (ideological point of view)। Fowler একে বলেছেন ‘the set of values, or belief system, communicated by the language of

the text'[৩]। অন্যদিকে, মনোশৈলী (mind style) বলতে চারপাশের জগতকে অনুভব করার সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায়, যা ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত বোধসঞ্জাত। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি দুই ব্যক্তির একরকম হয় না। Fowler তাই মনোশৈলীর সংজ্ঞায় 'any distinctive linguistic representation of an individual mental self'-এর কথা বলেছেন[৪]। সুতরাং, কোনো একটি জনজাতির আদর্শগত দৃষ্টিকোণ একই হলেও, ওই জাতির অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির মনোশৈলী ভিন্ন।

৯.৩.১.১. মনোস্তাত্ত্বিক বিচ্যুতি ও মনোশৈলী

নকশাল আন্দোলনে ব্রতী সমীর, বাদল, দীপুর মতো অল্পবয়সী ছেলেদের এই পথে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দিয়েছেন, এমনকি পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে নিজের ফ্ল্যাটে আশ্রয়ও দিয়েছেন অধ্যাপক অনুপম রায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সমীরদের পন্থার প্রতি তাঁর আন্তরিক সমর্থন রয়েছে। অনুপমের এই নিজস্ব মনোশৈলী কট্টোর দক্ষিণপন্থী সোমশঙ্কর দত্তরায়ের সামনে তাঁকে দিয়ে বলিয়ে নেয়,

> কিটব্যাগটা জমা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওরা আমার ছাত্র।[৫]

কিন্তু অচিরেই অনুপমের এই ছাত্রদরদী আদর্শের কন্ঠরোধ ক'রে ক্রমশ মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে আরেকটি আদর্শগত দৃষ্টিকোণ, যা সোমশঙ্করের হাত ধ'রে তাঁকে ভাবতে শেখায় যে তিনিও আসলে সমীরদের কাছে শত্রু – সমীরদের লড়াই আসলে একটা হেরে যাওয়ার খেলা – সোমশঙ্করের মতো বুদ্ধিজীবীরাই অনুপমের মতো বুদ্ধিজীবীদের রক্ষা করবেন। এরপর সমীরের রেখে যাওয়া কিটব্যাগটা থানায় জমা দিয়ে তার পরাজয়কে সুনিশ্চিত করে আসেন অনুপম। কিন্তু তারপর থেকেই মাথা চাড়া দেয় অপরাধবোধ – চলতে থাকে ক্রমবর্ধমান আত্মখনন। সোমশঙ্করের দ্বারা চালিত আদর্শগত দৃষ্টিকোণকে ছাপিয়ে যায় শিক্ষকের আদর্শগত দৃষ্টিকোণ।

সুতরাং এখানে দুবার মনোস্তাত্ত্বিক বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে। প্রথম ক্ষেত্রে, অনুপমের ছাত্রদরদী আদর্শ থেকে বিচ্যুতির ফলে সোমশঙ্করের দ্বারা চালিত আদর্শ প্রকট হয়েছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, সোমশঙ্করের দ্বারা চালিত আদর্শ থেকে বিচ্যুতির ফলে পুনরায় ছাত্রদরদী আদর্শ প্রকট হয়েছে। এই অবস্থা কার্যত ব্যক্তির অন্তরে উভয় আদর্শগত দৃষ্টিকোণের টানাপোড়েন তথা মানসিক অস্থিরতাকে নির্দেশ করে। অনুপমের দুটি আদর্শের মধ্যে স্থির থাকতে না-পারার মনোশৈলী ধরা পড়ে, যা প্রকৃতপক্ষে সত্তরের দশকের অস্থির সময়ের স্বরকে ব্যাঞ্জিত করেছে।

৯.৩.১.২. ধারণাগত রূপক ও মনোশৈলী

কোনো বিমূর্ত বিষয়কে একজন ব্যক্তি কী ধরনের মূর্ত বিষয়ের দ্বারা বুঝতে চাইছেন, তা ওই ব্যক্তির মনোশৈলীকে সূচিত করে। অর্থাৎ, ধারণাগত রূপক ব্যক্তির মনোশৈলীর সূচক। এখন যদি দেখা যায়, একই রূপক বারবার প্রযুক্ত হচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে ওই নির্দিষ্ট রূপকের সাহায্যে বিমূর্ত বিষয়কে সনাক্ত করতে চাওয়া আসলে ওই ব্যক্তির বোধগত অভ্যাস (cognitive habit)। 'আমি অনুপম' উপন্যাস জুড়ে ঘুরেফিরে আসে অনুপমের বেশ কয়েকটি ধারণাগত রূপক। একই রূপকের এরকম বহু ব্যবহার কার্যত তাঁর বোধগত অভ্যাসকে চিহ্নিত করে। যে রূপকগুলির ব্যবহার খুব বেশি দেখা গেছে, সেগুলির উৎসক্ষেত্রগুলি (source domain) হল –

- রথের অশ্বরজ্জুর টান ও অশ্বরজ্জুর শিথিলতা
- আলো

খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা বিভিন্ন ভাষিক রূপকের মধ্য দিয়ে অনুপমের ধারণাগত রূপককে ধরতে পারি।

৯.৩.১.২.১. প্রথম রূপক ও তা থেকে প্রাপ্ত মনোশৈলী

আমরা দেখতে পাই, অনুপম তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যদেরকে একপ্রকার নিয়ন্ত্রণ করতে চান কিন্তু নিজে কখনো অন্যের নিয়ন্ত্রণাধীন হন না, এমনকি নৈতিকতার খাতিরেও নয়। তিনি জীবনের সবকিছুকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। এই ব্যাপারটিই সারা উপন্যাসে একেবারে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে 'অশ্বরজ্জুর টান' মেটাফরের আশ্রয়ে। এক্ষেত্রে ধারণাগত রূপক নিম্নরূপ –

জীবন হল রথ

↓

অনুপম হলেন রথের সারথি

↓

জীবনের চালিকাশক্তি হল অশ্ব

অনুপমের ধারণায় জীবনের চালিকাশক্তি বলতে মদ, নারী, খ্যাতি, প্রতিপত্তি। আমরা তিনবার এই মেটাফরের স্পষ্ট উল্লেখ পাই –

১) 'তাঁকে মাতাল করতে পারেনি কোনওদিন মদ কি নারী, খ্যাতি কিংবা প্রতিপত্তি। তাঁর হাতে ধরা আছে সমস্ত ক'টি অশ্বের রজ্জু – সর্বত্র দাঁড়ি টেনে রেখেছেন।'[৬]

২) '...কাল এক অতি-সম্মোহিত দুঃসময় অতিবাহিত হয়েছে তোমার, অনুপম। সবগুলি অশ্বের রজ্জু নিজের মুঠোর মধ্যে টেনে নাও। রথ যেন পথভ্রষ্ট আর না হয়।'[৭]

৩) 'শেষরক্ষাটা হয়ে যায় ঠিকই। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্তরাল থেকে সেই কপিকলের দড়িটা টানতে হয়েছে সদাসতর্ক অনুপমকেই স্বয়ং।'[৮] ['কপিকলের দড়ি' হল 'অশ্বরজ্জু'-র বিকল্প। উভয়ই একই অর্থে প্রযুক্ত।]

এছাড়া উপন্যাসের পাতায় পাতায় অনুপমের এই ধারণাগত রূপক কীভাবে পরোক্ষে ক্রিয়াশীল, তা বোঝা যায়। অনুপমের জীবনে 'অশ্বরজ্জুর টান' বারবার আলগা হয়ে যায়। আর তিনি বারবার তা পুনরায় টেনে ধরার চেষ্টা করেন। এর প্রচুর উদাহরণের মধ্যে থেকে নিচের সারণিতে কয়েকটি তুলে ধরা হল –

অশ্বরজ্জুর শিথিলতা		অশ্বরজ্জুর টান
যেকোনো যুদ্ধ বা দাঙ্গার পরিণাম সম্পর্কে তাঁর সহানুভূতিপূর্ণ ভাবনা: 'সব সংঘর্ষেরই অবশ্য একপক্ষে এক ফল – মায়ের ছেলেরা মরে যায়!'[৯]	→	একটু পরেই নিজেকে সামলে নেন: ''মায়ের ছেলে মরে যায়' বুদ্ধিমান ব্যক্তির এভাবে ভাবা উচিত নয়। মরবে তো সবাই। কে কেমনভাবে কী জন্য মরল, মরে সে কী পেল, কী দিল, সেটাই খতিয়ে ভাবতে হবে। অনুপম সোজা হয়ে বসেন।'[১০]
সুধা সম্পর্কে ভাবনার গভীরে ডুবে যান।[১১]	→	'হঠাৎ খেয়াল হল, অনুপম অনেক্ষণ ধরে টাইপরাইটারের সামনে বসে আছেন। ... কিছু লেখা হয়নি। খুব লজ্জিত হয়ে পড়লেন, ঘড়ির দিকে চোখ ছুটল, যাক, টেস্টিমোনিয়ালটা হয়ে যাবে।'[১২]
পুলিশ অফিসারের কথামতো অনুপম সমীরের রেখে যাওয়া কিটব্যাগটা থানায় জমা দিতে যাচ্ছিলেন যাতে পুলিশ তাদের দলটাকে সহজে ধরে ফেলতে পারে। এভাবে সমীরদের নৃশংস মৃত্যুর পথকে প্রশস্ত করতে তিনি যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলেন, তখন নিজের বিশ্বাসঘাতক চেহারাটা যেন তাঁর বাড়ির কাজের লোকের চাউনিতে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন: 'অনুপম স্পষ্ট দেখলেন, কেষ্টর এক চোখে জটপাকানো অবিশ্বাস, অন্য চোখে ভর্ৎসনা'।[১৩]	→	আবেগের রাশ টেনে ধরতেই 'জুতোর অধীর শব্দ তুলে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নীচে নেমে গেলেন অনুপম – গাড়ির দোর বন্ধ করার 'ঠাস' শব্দ হয় খুব জোরে। দাপিয়ে স্টার্ট দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল অনুপম রায়ের রুদ্ধশ্বাস গাড়ি, সমীরের কিটব্যাগ সমেত'।[১৪]
কিটব্যাগ থানায় জমা দেবার পর: 'বুকের ভেতরটায় কেমন একটা দমবন্ধ ভাব হচ্ছে। ... আঃ! একটু খোলা হাওয়ার জন্য অনুপমের বুকে গলায় তেষ্টা। বুকের মধ্যে ঢেউ তুলে আছড়ে পড়ল একটা সুর – তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে...ছিন্ন করে কাছি আমি ডুবতে রাজি আছি'[১৫]	→	'কিন্তু অনুপম আমল দিলেন না। দূর! যত অ্যাবসার্ড আইডিয়াজ – ডুবতে রাজি কেউ কখনও থাকে? ইচ্ছে করে কাছি ছিন্ন করে না কেউ।'[১৬]
'বারবার মাছি তাড়ানোর মতো হটিয়ে দেন তবু নাছোড় সেই খোলা হাওয়ার গান অনুপমের বুক গলার মধ্যে কুমোরের চাকের মতো পাকের পরে পাক দিতে থাকে।[১৭]	→	'ভিতরে ভিতরে গড়ে উঠতে থাকা পাত্রটিকে ভেঙে ফেলতে চেয়ে জোর করে অন্য কথায় যান অনুপম: 'তারপর? কী লিখছেনটিকছেন আজকাল? নতুন কিছু?''[১৮]
অনুপম ভালো করেই জানেন যে তিনি থানায় যা ব্যবস্থা করে এসেছেন, তাতে সমীর আর কোনোদিনই অনুপমের ফ্ল্যাটে রাতে শুতে	→	দরজা খুলতেই দেখলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে হাজির। তাকে প্রবেশের পথ ছেড়ে দিলেন। তারপর 'মৃদু অভয় হাস্যে মাকে

আসতে পারবে না। তবু ডোরবেল বাজতেই তিনি মিথ্যে প্রত্যাশায় কাল্পনিক সংলাপে নিমজ্জিত হলেন – 'সমীর, তুমি এসো। তুমি আমার বিছানাতে শোবে এসো। আমি সারা রাত তোমাকে পাহারা দিয়ে বসে থাকব। ...'[১৯]		উচিত সান্ত্বনা দিয়ে অনুপম হালকা পায়ে ও ঘরে গেলেন'।[২০]
বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধবোধে আক্রান্ত অনুপম যে কতখানি আবেগমথিত হয়ে পড়েন, তা উপন্যাসে একের পর এক সুবিস্তৃত ছবি বা চিত্রকল্পের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। কখনো চলতে থাকে অনুপমের মনের আভ্যন্তরীণ সংলাপ। সেই আভ্যন্তরীণ সংলাপে অংশ নেয় সুধা, কুনো-অনুপম আর অনুপম নিজে। সেই সংলাপে অনুপম বেশিক্ষণ নিজের হয়ে লড়তে পারেন না।	→	তারপর অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলে অনুপমের সম্বিৎ ফেরে তিনি আবারও রজ্জু টেনে ধরার নিরন্তর চেষ্টা করতে থাকেন। এরকম দৃষ্টান্ত সংখ্যায় অনেক। যেমন – 'একটু রাশ টানা দরকার, অনুপম। যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছ অপ-বুদ্ধিকে আজ।'[২১] 'অপরিচিত ভয় তাঁকে ছেয়ে ফেলতে চাইল, তিনি মন শক্ত করে বাধা দিলেন।'[২২] 'যত আজেবাজে চিন্তায় মাথাটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে – তার চেয়ে মনটাকে একটা নির্দিষ্ট শৃঙ্খলিত চিন্তার ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া ঢের ভালো।'[২৩]

উপন্যাসের অগ্রগতির সাথে সাথে দেখা যায়, রজ্জুর টান আলগা হয়ে যাবার পরিমাণটাই ক্রমশ বাড়ছে। যেমন –

- চমকে উঠলেন অনুপম। এ কী হয়েছে তাঁর? পদে পদেই কী যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সকালে লেট হয়েছেন ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্টে। কমলকলির বাড়িতে কুকুরটাকে হঠাৎ -- তারপরে আরও বিশ্রী, ওভাবে হঠাৎ, হাত বাড়িয়ে দিয়ে – ছি ছি ছি! ... এখন আরেকবার। মা যে বসে থাকেন, মা যে অনুর খাওয়া না হলে খেতে বসেন না, তা তো তিনি বিলক্ষণ জানেন। তাই মা এলে কখনওই দেরি করেন না। ... আর আজ? বাড়িতে বসে বসেই তিনি ভুলে গেলেন, মার খাওয়া হয়নি, মা বসে রয়েছেন।[২৪]
- দেখা যায়, পুলিশ অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী এবারের 'রয়জ কর্নার' সংখ্যায় সদর্থক সমালোচনা লিখতে গিয়ে তাঁকে নিজের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতার বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে হচ্ছে। তবু লেখাটা কিছুতেই তাঁর নিজের মনের মতো হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় –

  ছ'বছরের মধ্যে এই প্রথম বিচ্যুতি – এ সপ্তাহের 'রয়জ কর্নার' যাচ্ছে না।[২৫]

- অনুপমের চিরকালের রীতি হল, অতিথিদের তোলবার জন্য কাজ মিটে গেলেই তিনি 'আ-চ্ছাঃ' বলে হেসে উঠে দাঁড়ান। কিন্তু আজ সমীরের ধরা পড়ে যাওয়ার খবরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাওয়া অনুপমকে সবিনয় অন্তিম 'আচ্ছাঃ'টা পুলিশ অফিসার সোমশংকরই বলেন। একইভাবে দেখা যায়, যখন ডাক্তারখানায় গিয়ে স্বরযন্ত্র নষ্ট হয়ে চিরতরে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলার খবরে অনুপম আবারও কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন সেই ত্রস্ত অনুপমকে ডাক্তারবাবুই 'আ—চ্ছা' বলে টেবিলের ওপরে রাখা ঘন্টিটা সবিনয়ে বাজিয়ে দিলেন। অথচ এইরকম অন্তিম 'আচ্ছাঃ' বলাটা এতদিন তাঁরই একচেটিয়া ছিল। 'রজ্জুর টান' তাঁর আলগা হয়ে যাচ্ছে।
- নিচের দুটো বাক্যের গঠন লক্ষ করব –

> সত্যি সত্যি ওঁর হাত এগিয়ে গেল, থাবড়ে দিল ওর লাল ফিতে-বাঁধা ঝাঁকড়া ছোট মাথাটা।[২৬]
>
> অনুপমের স্টিয়ারিং আপনাআপনি গঙ্গার দিকে চলা ঠিক করল।[২৭]

যেন মনে হচ্ছে অনুপম নিজে এইসব কাজের কর্তা নয়। বাক্য দুটিতে কর্তার ভূমিকায় রাখা হয়েছে যথাক্রমে তাঁর হাত এবং স্টিয়ারিং-কে। আর এইসব কাজের জন্য যেন কোনো বাহ্যিক চালনাশক্তি দায়ী। এই ধরনের শৈলী থেকে বোঝা যায়, অনুপমের নিজের নিয়ন্ত্রণে কোনো ক্রিয়া নেই। বরং ক্রিয়াগুলোর নিয়ন্ত্রণে আছেন অনুপম। 'রজ্জুর টান' তিনি ধরে রাখতে পারছেন না। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে যখন দেখা যায়, যে কমলকলিকে অনুপম চালনা করেন বলে এতদিন অনুপম ভেবেছেন, সেই কমলকলি অনুপমের গলার কষ্টের কথা জেনে নিজের পোষা কুকুর ডার্লিংকে আহ্বান জানানোর ভঙ্গিতে মুখে চুক্‌চুক্ শব্দ করছে।

- মারিয়া, নলিনী আর সুধা, যারা তাঁকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়েছিল, তাদেরকে তিনি অন্যায়ভাবে কৌশলে জীবন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং যেকোনো নারীর কাছেই

নিজেকে অধরা ভেবে খুব গৌরব বোধ করেছিলেন একটা সময়। অথচ সেই তাদেরকেই তাঁর অসুস্থতার মুহূর্তে মনে পড়েছে বারবার। নারীসঙ্গের ক্ষেত্রে 'অশ্বরজ্জুর টান' রেখেছেন ভেবে যে শ্লাঘা অনুভব করতেন, তার শেষরক্ষা হয়নি।

- থানায় কিটব্যাগ জমা দেবার অনিবার্য ফল ফলেছে অচিরেই। গঙ্গার ধারে সোমেনের বডি পাওয়া গেছে। এই ঘটনায় যারপরনাই বিচলিত রমেন আর অনুপমের সম্মানের তোয়াক্কা করেনি। জনসমক্ষে অনুপমের ভদ্রতার মুখোশ টেনে নামিয়ে দিয়েছে। অনুপম এই পরিস্থিতি দ্বারা কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছেন। তিনি যন্ত্রবৎ। কারণ, আবারও দেখা যায় উপরোক্ত বাক্যের ধরন –

  অনুপমের পা যেন শত শত বৎসরের বৃদ্ধ বৃক্ষের মতো মাটিতে গেঁথে গিয়েছে।[২৮]

  অনুপম নিজের সম্মানের 'রজ্জুর টান' রাখতেও অপারগ।

এভাবে যখন কাউকে জীবনের 'অশ্বরজ্জু' বারবার টেনে ধরতে হয়, তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে আসলে তার স্বয়ংক্রিয় প্রবণতাই হল জীবনের 'অশ্বরজ্জু'-র শৈথিল্য। অথবা বলা যায়, রথের অশ্বরজ্জুতে টান না-রাখলে রথ যেমন অশ্বের মর্জি মতো যেকোনোদিকে চলে যেতে পারে, তেমনি জীবনকেও পারিপার্শ্বিকতা অনুসারে খুশিমতো চলতে দেওয়াই অনুপমের নিজস্ব প্রবণতা। কিন্তু আমরা খেয়াল করব, অনুপম 'নিজেকে আদর্শবাদী, নীতিবাদী পুরুষ বলে ভাবতে পছন্দ করেন'[২৯]। তাই পথভ্রষ্ট জীবনরথকে বারবার সঠিক পথে চালনা করেছেন। এটাই তাঁর মনোশৈলী। তবে উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে গিয়ে দেখা যায়, অনুপম বুঝতে পারছেন যে আসলে তিনি 'আদর্শবাদী' 'নীতিবাদী' কোনোটাই নন। তিনি ঠিক তার বিপরীত।

৯.৩.১.২.২. দ্বিতীয় রূপক ও তা থেকে প্রাপ্ত মনোশৈলী

দ্বিতীয় যে মেটাফরটি নিয়ে আলোচনা করব, তা হল আলোর মেটাফর। এক্ষেত্রে অনুপমের ধারণাগত রূপকটি নিম্নরূপ –

জনপ্রিয়তা হল আলো

এই ধারণাগত রূপকের ভাষিক প্রয়োগগুলি নিচে দেওয়া হল। কোথাও কোথাও আবার অনুপমের যৌবন তাঁর জনপ্রিয়তার সমার্থক হয়েছে –

> ১) বানপ্রস্থ? আশ্চর্য! প্রমীলা রোহাদগীর বিকৃত ইচ্ছাকে অসহ্য লাগলেই যে বানপ্রস্থী হওয়া হল, তা কেন হবে। এখনও তাঁর গার্হস্থ্যই হল না। অন্তহীন ব্রহ্মচর্যে জ্বলে আছেন।[৩০]
>
> ২) কী ভেবে চিবুকের তলার চামড়াটা তর্জনী ও বুড়োআঙুলের টেনে ধরবার চেষ্টা করলেন। না, ধরা দিল না, পিছলে গেল। যাক। 'সূর্য অস্ত যায়নি এখনও।'[৩১]
>
> ৩) নির্বাক জগৎ এই আলোনেবানো ঘরের মতো হবে কি?[৩২]
>
> ৪) এই সময়ে, তাঁর চোখের সামনে, গলা পর্যন্ত বালিতে প্রোথিত, জিভ কাটা একটি মানুষের জীবিত মুণ্ড, অসীম রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তরের মহাশূন্যতায় দৃশ্যমান হল। শুধু দুটি অসহায় অক্ষিগোলক মৃত্তিকাবন্দি মুণ্ডের মধ্যে ছটফট করছে। প্রাণের শেষ চিহ্ন স্বরূপ।[৩৩]
>
> ৫) এক ঝলক শেষ বেলার রোদ্দুরে হঠাৎ ঝলসে যান অনুপম রায়।[৩৪]
>
> ৬) ... গালে বৈকালিক দাড়ির ধূসর চন্দনের ফোঁটা[৩৫]

এগুলির মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ দৃষ্টান্ত সম্পর্কে সবিশেষ আলোচনা করা হল –

বাগ্মী অনুপমের কণ্ঠস্বরজনিত সমস্যার ফলে তাঁর ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ উপন্যাসে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তরই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। গোটা উপন্যাসে ৫৯ বার অনুপমের কণ্ঠস্বরজনিত সমস্যার কথা উঠে এসেছে। কখনো কথা বলতে গিয়ে তাঁর গলায় কষ্টের অনুভূতি, আবার কখনো তাঁর অস্পষ্ট উচ্চারণ অন্যদের বুঝতে না-পারার কথা এসেছে। কাহিনি যত পরিণতির দিকে গেছে, ততই এই প্রসঙ্গের পরিমাণ উত্তরোত্তর বেড়েছে এবং ক্রমে তা অন্য মাত্রা পেয়েছে – তখন বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে তাঁর কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেলার কথা। যেমন –

> এভাবে চলে না। স্বর ফেরত চাই।[৩৬]
>
> হি হ্যাজ লস্ট হিজ ভয়েস![৩৭]
>
> ... আমি চিরকালের মতো আমার কণ্ঠস্বর হারাব?[৩৮]
>
> ওটা গেল। অ্যাঁ? আ পার্মানেন্ট লস?[৩৯]

এভাবে কোনো বিষয়ের অতিমাত্রায় পুনরাবৃত্তি হতে থাকলে, তা পাঠকের কাছে আলাদা আবেদন সৃষ্টি করে। অনুপমের বাগযন্ত্রের সমস্যার বিষয়টিও অনুরূপ। 'কণ্ঠস্বর' শুধু তার বাচ্যার্থে আর সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা অনুপমের শিক্ষিত, সচেতন, প্রেমবিলাসী, জনপ্রিয় সত্তার দ্যোতক হয়ে দাঁড়ায় –

> ওই বয়স্ক, বিচক্ষণ মুখ যদি ভাষাহীন হয়ে যায়। ... অনুপম, কোথায় থাকবে তোমার রুমা-নলিনী-মেনকা-কমলকলি সকল? এইভাবে কি জ্বলবেন তখনও স্যর রাঘবন, কৃষ্ণমূর্তি, মোহনরাওবৃন্দ তোমার কুলুঙ্গিতে, দেদীপ্যমান? অনুপম, কোথায় পাবে ওই প্রিয়মান ছাত্রের দল, যারা প্রতি বছর পাশ করে বেরিয়ে তোমার ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে সমাজে? আর সেই অদেখা অনুরাগীরা, শুধু আকাশবাণী মারফৎ তোমার স্বরের গুণেই যারা তোমার বশংবদ? ... চুলের মধ্যে দীর্ঘ আঙুল, স্থাণু অনুপম ভাবলেন: নির্বাক জগৎ এই আলোনেবানো ঘরের মতো হবে কি?[৪০]

একেবারে শেষ বাক্যাংশে রয়েছে একটি উপমা (simile)। সেটি হল –

'নির্বাক জগৎ আলোনেবানো ঘরের মতো'

এখানে প্রথমেই 'নির্বাক জগৎ' কথাটির মধ্য দিয়ে যে ধারণাগত রূপক আমাদের নজর কাড়ে, তা নিম্নরূপ –

১) 'জগৎ হল মানুষ'

এখানে 'জগতে'র ওপর নরত্বারোপ (anthropomorphism) হয়েছে, অলঙ্কার শাস্ত্রে যাকে বলে সমাসোক্তি। অর্থাৎ, মানুষের কথা বলতে পারার বৈশিষ্ট্য আরোপিত হয়েছে জগতের ওপর। অথচ অনুপম নিজে যখন মানুষের এই প্রকৃতিদত্ত কথা বলার ক্ষমতা ক্রমশ হারিয়ে ফেলছেন, তখন এই ধারণাগত রূপকের উদ্ভাস তাঁকে যেন মানসিকভাবে চারপাশের জনকোলাহল থেকে, তাঁকে ঘিরে যাবতীয় জন-উন্মাদনা থেকে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যেন জগতের সকলে একপক্ষের আর তিনি একা।

এছাড়াও, 'নির্বাক জগৎ আলোনেবানো ঘরের মতো' – এই উপমার মধ্য দিয়ে কার্যত আরও দু'বার ধারণাগত রূপকের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। কারণ, আমাদের শুধু এই বাক্যাংশটি দেখলেই হবে না। বাক্যাংশের অব্যবহিত আগের প্রসঙ্গটিও খেয়াল করতে হবে,

যেখানে অনুপমের জনপ্রিয়তার পরিসমাপ্তির আশঙ্কা ব্যক্ত হয়েছে। সুতরাং, ধারণাগত রূপকদুটি নিম্নরূপ –

২) 'নির্বাক জগৎ হল জনপ্রিয়তার পরিসমাপ্তি'

[উৎসক্ষেত্র হল জনপ্রিয়তার পরিসমাপ্তি, লক্ষ্যক্ষেত্র হল নির্বাক জগৎ]

৩) 'জনপ্রিয়তার পরিসমাপ্তি হল আলোনেবানো ঘর'

[উৎসক্ষেত্র হল আলোনেবানো ঘর, লক্ষ্যক্ষেত্র হল জনপ্রিয়তার পরিসমাপ্তি]

ধারণাগত রূপক দু'রকম হতে পারে – সহঘটনার অভিজ্ঞতাজাত এবং সাদৃশ্যের অভিজ্ঞতাজাত। লেকফ এবং জনসনের সিদ্ধান্ত এখানে প্রাসঙ্গিক –

> Our general position is that conceptual metaphors are grounded in *correlations* within our experience. These experiential correlations may be of two types: *experiential cooccurrence* and *experiential similarity*. An example of experiential cooccurrence would be the MORE IS UP metaphor. MORE IS UP is grounded in the cooccurrence of two types of experiences: adding more of a substance and seeing the level of the substance rise. Here there is no experiential similarity at all. An example of experiential similarity is LIFE IS A GAMBLING GAME, where one experiences actions in life as gambles, and the possible consequences of those actions are perceived as winning or losing. Here the metaphor seems to be grounded in experiential similarity. [৪১]

'নির্বাক জগৎ হল জনপ্রিয়তার পরিসমাপ্তি' – এটি সহঘটনার অভিজ্ঞতাজাত রূপক। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অনুপমের বাগযন্ত্রের সমস্যার ফলে কথা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরের নিস্তব্ধ পরিপার্শ্বকেই 'নির্বাক জগৎ' বলা হয়েছে। অনুপমের যাবতীয় খ্যাতি তাঁর বাকপটুত্বের সঙ্গে সরাসরি কার্যকারণ সম্পর্কে যুক্ত। সুতরাং কথা বলা যত কমতে থাকবে, ততই খ্যাতির অবনমন হবে। কথা একেবারে বন্ধ হয়ে গেলে অর্থাৎ 'নির্বাক জগৎ' হলে, জনপ্রিয়তারও পরিসমাপ্তি হবে।

'জনপ্রিয়তার পরিসমাপ্তি হল আলোনেবানো ঘর' – এটি সাদৃশ্যের অভিজ্ঞতাজাত রূপক। অনুপম এই মুহূর্তে আছেন একটি আলোনেবানো ঘরে। উল্লেখ্য, একজন পাঠকও

আলোনেবানো ঘরের মধ্যে থাকার অনুভূতি কেমন হয়, তা জানেন। খেয়াল করতে হবে, এখানে কিন্তু 'অন্ধকার ঘর' বলা হয়নি। বলা হয়েছে 'আলোনেবানো ঘর'। তার মানে আগে আলো ছিল। পরে সেই আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইরকম আলো নিবিয়ে দেওয়া ঘরে ব্যক্তির দিশাহীনতা এবং নিজ অস্তিত্বের বিপন্নতা তৈরি হয়। একইভাবে, জনপ্রিয়তার শিখরে বিচরণ করতে থাকা মানুষের জনপ্রিয়তা যদি হঠাৎ চলে যায়, তাহলেও তৈরি হয় কর্মক্ষেত্রে তার দিশাহীনতা ও অস্তিত্বের বিপন্নতা। আর এই অনুভূতি একটি আলো নিবিয়ে দেওয়া ঘরের মধ্যে থাকার অনুভূতির মতো।

এবার আলোর মেটাফরের চতুর্থ দৃষ্টান্ত নিয়ে আলোচনা করা হবে। উপন্যাসের সংশ্লিষ্ট জায়গাটি পুনরায় দেখে নেওয়া যাক –

> এই সময়ে, তাঁর চোখের সামনে, গলা পর্যন্ত বালিতে প্রোথিত, জিভ কাটা একটি মানুষের জীবিত মুণ্ড, অসীম রৌদ্রদগ্ধ মরুপ্রান্তরের মহাশূন্যতায় দৃশ্যমান হল। শুধু দুটি অসহায় অক্ষিগোলক মৃত্তিকাবন্দি মুণ্ডের মধ্যে ছটফট করছে। প্রাণের শেষ চিহ্ন স্বরূপ।[৪২]

এটি একটি চিত্রকল্প, যা স্পষ্টতই 'to some degree metaphorical'[৪৩]। এ আসলে জনপ্রিয়তার চরমে পৌঁছে অনুপমের জনস্পর্শহীনতার আশঙ্কা জর্জরিত তীব্র অনুভূতি।

আলোর মেটাফরের সঙ্গে আগে আলোচিত অশ্বরজ্জুর মেটাফর অনেকখানি জড়িয়ে আছে। আলোর মেটাফরের মাধ্যমে আমরা বুঝেছি, কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অনুপম কতখানি অসহায়তা বোধ করছেন। স্বরযন্ত্রের বিনষ্টি তাঁর অস্তিত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। কারণ, তাঁর বর্তমান অস্তিত্ব খ্যাতি, প্রতিপত্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এতদিন সেই খ্যাতি, প্রতিপত্তি এসেছে বাগশক্তিকে ব্যবহার করেই। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে একটা সিগারেটও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবু আমরা দেখি, অনুপমের নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

সুতরাং বলা যায়, নেশা, নারী, খ্যাতি, প্রতিপত্তি – সব ক'টি 'অশ্বের রজ্জু' তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন ভেবে তাঁর যে আত্মপ্রত্যয় ছিল, তা আর শেষ পর্যন্ত তিনি অটুট রাখতে পারেননি। সব ক'টি 'অশ্বের রজ্জু'ই শিথিল হয়ে গেছে। এভাবে ধারণাগত রূপকের মধ্য দিয়ে অনুপমের চিন্তার নিজস্ব ধরন বা মনোশৈলী ধরা দেয়।

৯.৩.১.৩. অনুপমের মনোশৈলী প্রকাশক অন্যান্য ভাষাবৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ

অনুপম আয়নায় নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করছেন। সম্পূর্ণ বিবরণটাই[৪৪] অনুপমের প্রেক্ষিত থেকে। শৈলী লক্ষ করলে দেখা যাবে, বেশ কিছু ছোট-ছোট বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, স্থিতি ক্রিয়া (সংবর্তনের ফলে বিলোপিত) দ্বারা অনুপমের শরীরের একেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন চিহ্নিত করা হয়েছে সরাসরি। যেমন,

- ভুরু দুটো অসমান।
- লম্বাটে মুখ। চিবুক ছুঁচলো। নাকটি মোটা, ত্রিকোণ, চওড়া, মাংসল।
- নাকের দুপাশ থেকে ভাঁজ নেমে এসেছে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত।
- দাঁতের পিছনে বাদামী নিকোটিনের ছোপ। জিভটা উলটে দেখলেন। বাকস্বরূপা। বাগযন্ত্র। জিভের তলার রং নীল। শিরা ওঠাওঠা।

এই জাতীয় বর্ণনা একেবারেই হিসেবী বর্ণনা, যা ব্যক্তির বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ মনোশৈলী (objective neutral mind style)-কে সূচিত করে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে অনুপমের আবেগের 'অশ্বরজ্জুর টান' ভালোভাবেই অটুট।

কিন্তু অনুপমের এই বস্তুনিষ্ঠ নিরপেক্ষ মন অচিরেই তার রূপ বদলাতে শুরু করে। ছোট বাক্যের পরিবর্তে আসে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বাক্য, প্রশ্নবাক্য, মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ের অতিব্যবহার, যা বর্ণনাকে ক্রমশ আবেগঘন করেছে। অনুপমের অনুভব (perception) জনিত ক্রিয়াপদ ক্রমে গুরুত্ব পায়। যেমন –

- এবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মুখটাকে নিরীক্ষণে মন দিলেন।
- দাঁতগুলি খুঁটিয়ে দেখলেন।
- হাঁ করে দেখলেন।
- চোখ সরু করে চামড়া লক্ষ্য করলেন।
- মাথার দিকে চাইলেন।
- অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

সংশয়দীর্ণ মন ক্রমশ ঘিরে ধরতে থাকে। দেখা যায় প্রশ্নবোধক, সংশয়সূচক বাক্য –

- আশ্চর্য! আজ সকালে ডাক্তার দেখানোর তাড়ায় কি তবে দাড়িটাই কামানো হয় নি? অনুপম। তোমার দৈনন্দিন কাজগুলিতে ভুল শুরু হল? তুচ্ছ একটা কারণে?
- সুপুরুষ? কিসের সুবাদে? ... রং? শ্যামলা।
- ... প্রকৃত দৈর্ঘ্যের তুলনায় তাঁকে দীর্ঘতর দেখায়। স্বভাবের ব্যাপারটাও কি অনেকটা সেই রকমই? দৈর্ঘ্যের চেয়ে দীর্ঘতর দেখায় কি অনুপম রায়কে?

অনুপমের মনোভাব ধরা দেয় নিচের বাক্যগুলিতে। দেখা যায় গুণবাচক বিশেষ্য কিংবা বিশেষ্যগুচ্ছ, বিশেষণ আর কিছু চিরাচরিত উপমার ব্যবহার।

- ব্রণর দাগে, ছোপ ছোপ মেছেতায় মুখের চামড়ায় ক্লান্তি মাখানো।
- মোটা শেল্ ফ্রেমের বাঁধানো দুটি পুরু কাঁচের চোখ, যেন অক্টোপাসের চক্ষুর মতো অতিকায়, অত্যুজ্জ্বল। সাপের মতো তীব্র।
- হাতকাটা গেঞ্জির নিচে লোমশ বুকের ইঙ্গিত, ফুটে আছে অহংকারী কাঁধ, সমর্থ বাহু। ... না, লোভনীয়তার কিছুমাত্র অভাব নেই।
- না, বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। ওই অতিকায়, গিলে-খেতে-আসা তীক্ষ্ণ চোখ ছাড়া।

এরপর ক্রমবিস্তারী ভাবনার জাল শরীরের আর সব অঙ্গকে ছেড়ে কেবলমাত্র ভগ্নদশাগ্রস্ত বাগযন্ত্রকে ঘিরে বর্ধিত হতে থাকে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয় সামাজিক পরিমন্ডলে নিজের অবস্থানের স্থায়িত্ব সংক্রান্ত সংশয়। সংশ্লিষ্ট আলোর মেটাফর একটু আগেই আমরা বিশ্লেষণ করেছি। শেষে ভাবনার অতলে তলিয়ে গিয়ে অনুভূতির তীব্রতায় আতঙ্কিত অবস্থায় স্নানঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন অনুপম। আবেগের ‘অশ্বরজ্জুর টান’ তিনি বজায় রাখতে পারেন না। তা একেবারে আলগা হয়ে যায়।

বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা দেখলাম, বিভিন্নভাবে বারবার অনুপমের মনোশৈলী উঠে এসেছে। এভাবে গোটা উপন্যাসে সম্মুখিত হয়েছে অনুপমের মতো একজন বুদ্ধিজীবীর মন। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, মেধাবী, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষকরূপে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করলেও, শেষপর্যন্ত অনুপমের আত্মশ্লাঘা গুড়িয়ে গেছে তাঁর জ্ঞানের ছক নবীকরণের মাধ্যমে। কারণ, একটা সময়ের পর থেকে অনুপম ক্রমশ বুঝতে পারেন যে বাবাকে বিশ্লেষণ করা, মেয়েদের প্রতি তাঁর আচরণ, কিংবা সমসাময়িক নকশাল আন্দোলনের প্রতি মনোভাব পোষণ – এই সবকটি ক্ষেত্রেই তিনি ভুল ছিলেন। অনুপমই হয়েছে অনুপম চরিত্রের নিরীক্ষক। 'অশ্বরজ্জুর টান' আলগা হতে থাকার তালে তাল মিলিয়ে অনুপমের জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটেছে। নিজের কৃতকর্মের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তিকে স্বীকার করেই তিনি শেষপর্যন্ত নতুনভাবে জীবনপথে পা বাড়াতে চেয়েছেন, যা আসলে নবনীতার সাহিত্যে প্রাপ্ত তৃতীয় ভাবাদর্শকে (দ্র. ১০.২.৩) ইঙ্গিত করে।

৯.৩.২. 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের বোধগত শৈলী বিশ্লেষণ

'নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে চিত্রকল্পের ব্যবহার বৈচিত্র্য অনুসন্ধান' শীর্ষক অধ্যায়ে আমরা 'সীতা থেকে শুরু' গল্পগ্রন্থের তিনটি পর্ব জুড়ে কীভাবে একের পর এক সীমালঙ্ঘনের চিত্রকল্প ছড়িয়ে আছে, তা দেখেছি (দ্র. ১.৩.৩.১)। লেখিকা এইসব চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে নারীর জীবনকে দেখার অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গি এনে দিয়েছেন পাঠকের কাছে। অধিকাংশ পাঠক এতদিন পর্যন্ত মহাকাব্যের কাহিনিকে একভাবে জেনেছে। কিন্তু 'সীতা থেকে শুরু'-র পৌরাণিকী পর্বে সীতা, শূর্পণখা, অম্বা, শকুন্তলাদের পরিচিত জীবনের খাঁজে খাঁজে যেসব সম্ভাব্য ছবি নির্মিত হয়েছে, তা আসলে পাঠকের কাছে মহাকাব্যের মূল কাহিনির বিপরিচিতিকরণ

(defamiliarisation) করায়। একইভাবে মাতৃয়ার্কি ও আধুনিকী পর্বেও বিপরিচিতিকরণ প্রক্রিয়া দেখা যায়। এই দুই পর্বের গল্পগুলিতে আমরা বারবার দেখেছি মেয়েরা কীভাবে পুরুষশাসিত সমাজের প্রচলিত গণ্ডীকে পরোয়া না-করে সম্পূর্ণ নিজের শর্তে স্বাধীন জীবন যাপন করছে। ফলে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সিংহভাগ পাঠক এতদিন যেভাবে নারীজীবনকে চিনেছে, সেই চেনায় বদল ঘটিয়েছেন নবনীতা। এই বিপরিচিতিকরণের প্রবণতা আমরা তাঁর ‘স্বভূমি’, ‘ফিনিক্স’, ‘প্রোপাইটার’, ‘অভিজ্ঞান’, ‘নাট্যারম্ভ’, ‘ঘূর্ণি’, ‘অ্যালবাট্রস’ প্রভৃতি গল্প উপন্যাসেও দেখতে পাই। সুতরাং, ভিন্নপরিচিতিকরণের মাধ্যমে এইসব কাহিনি পাঠকের মনে যে ধরনের সম্মুখন-পশ্চাদন ধারণা (figure-ground concept) নির্মাণ করেছে, তা নিম্নরূপ –

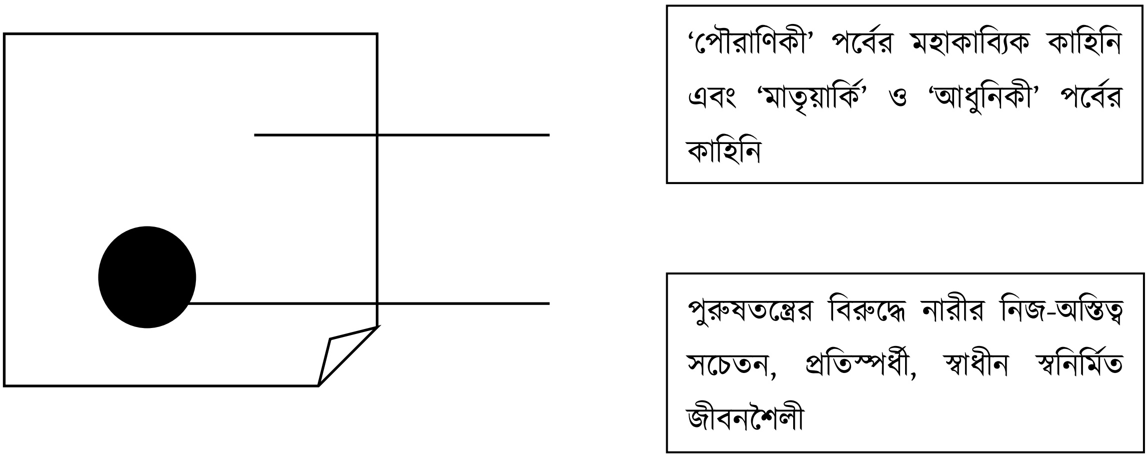

চিত্র ২০: বিপরিচিতিকরণের ফলে উদ্ভূত সম্মুখন-পশ্চাদন ধারণা

সাধারণ পাঠক পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবদমিত জীবনশৈলী দেখতেই অভ্যস্ত। মহাকাব্যের চিরায়ত কাহিনিতেও তা-ই ধরা দেয়। চিত্র ২০-তে একটি সাদা পশ্চাদনের ওপর একটি কালো বস্তু সম্মুখিত হয়েছে। এই পশ্চাদন (ground)-এ অবস্থান করছে ‘সীতা থেকে শুরু’-র ‘পৌরাণিকী’ পর্বের মহাকাব্যিক কাহিনি এবং ‘মাতৃয়ার্কি’ ও ‘আধুনিকী’ পর্বের কাহিনি। এইসব গল্পে মহাকাব্যিক কাহিনির বিপরিচিতিকরণ এবং নারীর চিরাচরিত জীবনশৈলীর

বিপরিচিতিকরণের দ্বারা নবনীতা পাঠক-মনে এই পশ্চাদনের সামনে সম্মুখন (figure) হিসাবে তুলে ধরেছেন পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে নারীর নিজ-অস্তিত্ব সচেতন, প্রতিস্পর্ধী, স্বাধীন স্বনির্মিত জীবনশৈলীকে। পাঠকের মনে এই জাতীয় সম্মুখন আসলে নারীর সজীব প্রাণবন্ত জীবনশৈলীর প্রমুখন (foreground) করে।

বিপরিচিতিকরণ নিঃসন্দেহে পাঠকের ছক-নবীকরণ (schema refreshment) করেছে। পাঠকের এতদিনের জ্ঞান নতুন মাত্রা লাভ করেছে। কারণ, সীতা, শূর্পণখা, অম্বা কিংবা আধুনিককালের নারীদের পুরুষশাসিত সমাজের দেখিয়ে দেওয়া পথে বহমান গতানুগতিক জীবনধারা ছিল অধিকাংশ পাঠকের ছকের অন্তর্গত পুরনো উপাদান। এই উপাদানের বিবর্তন হয়েছে নবনীতার কলমে। নিচে বিস্তৃত বিশ্লেষণসহ 'সীতা থেকে শুরু'-র কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। 'সীতা থেকে শুরু'র 'মাতৃয়ার্কি' পর্বের মাধ্যমে পাঠকের ছক-নবীকরণ সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়েছে ঠিক আগের অধ্যায়ে (দ্র. ৮.৩)।

৯.৩.২.১ বিশ্লেষণসহ পাঠকের ছক নবীকরণের প্রথম দৃষ্টান্ত

মাইকেল মধুসূদনের মতোই নবনীতাও লঙ্কার ঐশ্বর্য ও বীরত্বের জয়গান করতে চেয়েছেন। তবে নবনীতার লেখনীতে রাবণপক্ষের জয়গান খুবই সংযত প্রকৃতির। কারণ নবনীতা ধ্রুপদী কাহিনির কোনও রদবদল না-করে কয়েকটি কাল্পনিক ঘটনা যুক্ত করেছেন এবং কাহিনির প্রয়োজনেই একটা সময় পর সেগুলি বিযুক্তও হয়ে গেছে। এর ফলে কিছু বিকল্প সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মেয়েদের দৃষ্টিকোণ থেকে রামায়ণের পাঠ ঠিক কেমন, তা স্পষ্ট রূপ লাভ করেছে 'সীতা থেকে শুরু'র পৌরাণিকী পর্বে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ –

Ram is the champion of Aryanism, the king of India at the moment. Nabaneeta's restrained admiration is for the heroic kingdom of Lanka. One of the most sustained moments of feminism in the book is the proud statement of sexual hunger made by the demon princess, Shurpanakha who was stronger than both the guys (রাম ও লক্ষ্মণ).[৪৫]

নবনীতার লেখায় শূর্পণখা আগ্রাসী (aggressive)। প্রথমে রাম তারপর লক্ষ্মণের কাছে তার উদগ্র কামনা চরিতার্থ করার জন্য সরাসরি আবেদনের ভঙ্গি যেমন আগ্রাসনমূলক, তেমনি রাম-লক্ষ্মণের দ্বারা প্রতারিত অপমানিত শূর্পণখাও অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত, আগ্রাসী। কারণ সে নিজের অস্তিত্বের অকস্মাৎ বিপন্নতা সম্পর্কে সজাগ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরুষেরা মেয়েদেরকে প্রভাবশালী, স্বচ্ছন্দগামী, আত্মপ্রতিষ্ঠ, স্বাধীন মানুষ হিসাবে বিবেচনা করতে যে কতখানি অক্ষম, 'রাজকুমারী কামবল্লী' গল্পে তার বহুবিধ দৃষ্টান্তের মধ্য থেকে একটি তুলে ধরা হল।

> অবাক হয়ে লক্ষ্মণ বললেন – "আরে রে? এর যে দেখি গোড়ায় গলদ। রাজপুত্র আর রাজকন্যায় গুলিয়ে ফেলছে। রাজপুত্র তো আরও অনেক কিছুই করতে পারে। আপনি তো নারী। ...[৪৬]

অথচ এই শূর্পণখা শুধু যে রূপবতী তাই নয়, সে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। সে একাই এক অক্ষৌহিনী সৈন্যের সাথে যুঝতে পারে। তার নিজের কথায়,

> তোমার আমি সুযোগ্যা সহধর্মিণী হবো। তোমার দাদার ললিতলবঙ্গলতা বউটির মতো আমি ভয়ে অচেতন হয়ে পড়বো না কখনও। আমি অমিতাবিক্রমা, এবং নির্ভীক, কিন্তু স্বভাবগুণে আমি প্রণয়কুশলীও বটে। যদিও আমি এখনও অনন্যাপূর্বা, কুমারী।[৪৭]

নবনীতা শূর্পণখা চরিত্রের মধ্য দিয়ে কার্যত এক বীর রমণীকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, যে রূপে গুণে আক্ষরিক অর্থেই স্বয়ংসম্পূর্ণা। এভাবে রামায়ণের শূর্পণখা চরিত্রের বিপরিচিতিকরণ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই পাঠকের ছক নবীকরণ হয়েছে।

৯.৩.২.২ বিশ্লেষণসহ পাঠকের ছক নবীকরণের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

'রাজকুমারী কামবল্লী' গল্পে সীতা যে নতস্বভাবযুক্ত (submissive), তা আমরা 'চিত্রকল্পের ব্যবহার বৈচিত্র্য অনুসন্ধান' অধ্যায়ে দেখেছি। কিন্তু অন্যত্র সীতা চরিত্রেরও কিছুটা বিচ্যুতি দেখা যায়। যেমন – 'সীতার পাতাল প্রবেশ' ও 'মূল রামায়ণ' গল্পের সীতা। 'মূল রামায়ণ' গল্পে সীতা সম্পর্কে কথকের উক্তি –

> সীতাদেবী তো রামচন্দ্রের মতো ভালোমানুষ নন – তিনি আগুনের মতো ফোঁস করে উঠলেন[৪৮]

সেইসঙ্গে বাল্মীকির উদ্দেশে সীতার কয়েকটি বাক্য-ব্যবহার প্রথমে আমরা খেয়াল করব,

- মুখ সামলে কথা বলবেন ঋষিমশাই। জানোয়ারের আবার পরপুরুষ কী?[৪৯]
- আমি বল্মীকের মধ্যে চাপা পড়িনি বলেই কি আমি নীতিজ্ঞা নই?[৫০]
- একটু সাবধানে বাগবিস্তার করবেন, মনে রাখবেন আমারও জন্ম লক্ষ্মীর অংশে।[৫১]
- আজ যে-হনুমানের কাঁধে আমি চড়েছি তিনি আমার পুত্রবৎ। ... হায় সংস্কার।[৫২]
- আজ উইপোকার কল্যাণে আপনি মুনিঋষি বনে গেলে কি হবে, ছিলেন তো সেই চোর-ডাকাতই – মনের মালিন্য আপনার কাটেনি মুনিবর। অঙ্গার শতধৌতেন ইত্যাদি।[৫৩]
- উইপোকামুনির কথা ছাড়ুন তো আপনি নাথ।[৫৪]

পাঠকের মনে এতকাল ধরে "সীতা" বা আরও বিশেষভাবে বললে "সীতার চরিত্রগুণ" নামক যে ধারণা তৈরি হয়ে আছে, উপরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহ সেই ধারণার কিছু বদল ঘটায়। যেকোনও বিষয় সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয় একেকটি সংবর্গ (category)-এর ভিত্তিতে। এখন 'সীতার চরিত্র' – এই সংবর্গের প্রতিনিধিত্বশীল বৈশিষ্ট্যগুলি (prototypical features) নিচে দেখানো হল –

ধারণাগত সংবর্গ : /সীতার চরিত্র/

প্রতিনিধিত্বশীল বৈশিষ্ট্য : সতী
কোমল স্বভাবযুক্ত
মধুরভাষিণী
প্রতিবাদহীনা ইত্যাদি

আমরা জানি, 'The boundaries of the category are fuzzy rather than fixed'[৫৫]। তাই যখন নবনীতার কলমে দেখা যায় সীতা ততটাও মধুরভাষিণী নয় এবং প্রয়োজনে যথেষ্ট প্রতিবাদী ও যুক্তিবাদী, তখন পাঠককে তাঁর এতদিনের 'সীতার চরিত্র' সংবর্গে এই নতুন বৈশিষ্ট্যটি আলগোছে একত্র ক'রে (softly assemble) নিতে হয়। একইভাবে 'সীতার পাতাল প্রবেশ' গল্পেও আমরা যে সীতাকে পেয়েছি, সে যথেষ্ট কঠোর। রামের কথায় ক্ষুব্ধ সীতা "ধাতব শীতল কণ্ঠে" কথা বলে। রামের অনুভূতি থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয় –

> স্বর্ণসীতা যে কত মিথ্যা সান্ত্বনা, তাঁর কাছে সে সত্য প্রকট হয়ে উঠলো। তিনি আরো টের পেলেন, এ সীতা সোনার নয়, লোহার। সীতা আর মাটির মানষী নেই।[৫৬]

পুরুষশাসিত সমাজ মেয়েদেরকে সীতা-সাবিত্রীর মতো হওয়ার শিক্ষা দেয়। অর্থাৎ, ওপরে যেসব প্রতিনিধিত্বশীল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী শিক্ষা। কাজেই পুরুষের অন্যায়কেও মেনে নিতে শেখায় এই সমাজ। কিন্তু নবনীতা সীতার মতো একটি আদি মহাকাব্যিক চরিত্র, যা ভারতীয় সমাজ-মানসিকতার শিকড়ের সাথে জড়িয়ে আছে, তার ধারণাগত সংবর্গ (conceptual category)-এ পরিবর্তন এনে এক প্রকার লোকশিক্ষা দিতে চেয়েছেন ব'লে মনে হয়। পাঠকসমাজ এতদিন পর্যন্ত একরকমভাবে মহাকাব্যের কাহিনিকে দেখেছে। সেইসব কাহিনির ভিতরে ভিতরে বিকল্প সম্ভাবনার রং ধরিয়ে কাহিনিকে তিনি নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবতে শিখিয়েছেন, নারীকে অবলা হিসাবে নয়, বরং আত্মপ্রতিষ্ঠ, সুদৃঢ়, স্বনির্ভর ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। এভাবে সীতা, শূর্পণখা, অম্বা, লোলাপাঙ্গী, শলভা প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে নবনীতা 'পুরুষ-সমাজে নারীর অবস্থান' সংবর্গকে খানিক অদলবদল ক'রে সাজিয়ে নেবার পটভূমি তৈরি করে দিয়েছেন। শুধু পৌরাণিকী পর্বই নয়, অন্য দুটি পর্ব তথা নবনীতার সাহিত্যের সিংহভাগ জুড়েই এই প্রবণতা ক্রিয়াশীল। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে নবনীতার লেখনী আসলে পাঠকের 'সমাজ-পরিবেশে নারীর সার্বিক

অবস্থান ও জীবনপ্রণালী' সংক্রান্ত ধারণাগত সংবর্গ (conceptual category)-কেই বদলে দিতে চায়।

৯.৩.২.৩ বিশ্লেষণসহ পাঠকের ছক নবীকরণের তৃতীয় দৃষ্টান্ত

সমাজে অত্যাচারী, অবিবেচক, চারিত্রিক শৈথিল্যযুক্ত পুরুষের অপরিণামদর্শী কর্মের ফল ভোগ করতে হয় স্ত্রীজাতীকে। তাই স্ত্রী-চরিত্রের পক্ষান্তরে পুরুষ চরিত্র বিষয়ক ধারণাগত সংবর্গেও বদল দেখা যায় 'সীতা থেকে শুরু'র রাম, বাল্মীকি, নারদ, দুষ্মন্ত চরিত্রের আধারে। দুয়েকটি উদাহরণ দেখা যেতে পারে। আমরা প্রথমে বাল্মীকি ও রামের বাক্‌ব্যবহার লক্ষ করব।

বাল্মীকির কথায় –

> বড্ডো তেজী মেয়েমানুষ, না? আচ্ছাঃ, আমিও মহাকবি বাল্মীকি। দেখে নেবো। স্বামীর কোলে বসে বসে মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনা? হবে। হবে। - তোমার কী হাল করি, তুমি দেখো। একেবারে আমার সেই ক্রৌঞ্চ-ক্রৌঞ্চীর অবস্থা করে ছেড়ে দেবো। কলম যার হাতে, ভবিষ্যৎ তার হাতে।[৫৭]

নাগপাশে আবদ্ধ রাম যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্মণকে মৃতবৎ শয়ান দেখে বিলাপ ক'রে বলে –

> হায় জানকী, তোমার জন্যই আজ আমাদের পরিবারের এই দুরবস্থা। তুমি বাইরের মেয়ে, পর। তোমাকে বাঁচাতে গিয়ে আজ আমি ঘরের ছেলেকে হারালাম। বউ গেলে নতুন বউ হয়, এটা কোনো ব্যাপারই নয়, কিন্তু পিতার স্বর্গলাভের পর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গেলে নতুন ভ্রাতা তো আর পাওয়া যায় না।[৫৮]

এখানে লিঙ্গ বৈষম্যের চেহারা ধরা পড়ে। অথচ এদের সম্পর্কে আমাদের এতদিনের ধারণা ভিন্নরূপ –

ধারণাগত সংবর্গ : /বাল্মীকি/

প্রতিনিধিত্বশীল বৈশিষ্ট্য : রামায়ণপ্রণেতা
ঋষি
মার্জিত বাগভঙ্গি
ঋষিসুলভ সহৃদয়
অতীতে রত্নাকর দস্যু
ইত্যাদি

ধারণাগত সংবর্গ : /রাম/

প্রতিনিধিত্বশীল বৈশিষ্ট্য : অযোধ্যার রাজা

সীতার স্বামী

আর্য পুরুষ

প্রজাবৎসল

পরম ধার্মিক

সৎ

দয়ালু

কর্তব্যপরায়ণ

আদর্শ পুরুষ

ইত্যাদি

ওপরের উদ্ধৃতি দুটি থেকে আমরা বুঝি যে নবনীতা দেবসেন প্রকৃতপক্ষে রাম বা বাল্মীকির মতো সর্বভারতীয় সর্বজনবন্দিত চরিত্রের সংবর্গে বিপুল পরিমাণ বদল ঘটাতে চেয়েছেন। কিন্তু পাঠকের পক্ষে এতদিনের নির্মিত ও চর্চিত 'রাম' এবং 'বাল্মীকি' সংবর্গে লেখিকা সৃষ্ট নেতিবাচক উপাদানগুলিকে আলগোছে একত্রীকরণ (softly assemble) ক'রে নেওয়া মোটেই সহজ কথা নয়। বরং এটা পাঠকের কাছে রীতিমতো ধাক্কা। মহাকাব্যে যারা ছিল সাধু, যারা ছিল নায়ক, তাদেরকেই তিনি এক প্রকার অসাধু, খলনায়ক করেছেন। পাঠককে তাই তাঁদের এইসব চরিত্র সম্পর্কিত এতকালের ধারণাগত সংবর্গে নবলব্ধ নেতিবাচক উপাদানগুলিকে কষ্টপূর্বক একত্রীকরণ (hardly assemble) করতে হবে। আসলে এই জাতীয় লেখা নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। উদ্দেশ্য দুটি –

প্রথমত, লেখিকার নিজের কথায়,

> মহাকাব্য পড়তে পড়তে আমার কেবলই মনে হতো, এই বীর্য-বাহুবলসর্বস্ব পুরুষমানুষের যুদ্ধকাব্যের জগতে নারীর ঠাঁই বড় করুণ। সে লক্ষ্মীই হোক আর অলক্ষ্মীই। সীতাই হোক বা দ্রৌপদীই, তাড়কাই হোক বা শূর্পণখা, যেন দুঃখ পেতেই তাদের জন্ম। তাদের দুঃখের মূল্যেই মহাকাব্যের নায়কদের বীরোচিত গুণাবলী প্রমাণিত হয়।[৫৯]

তিনি নারীর এই অবস্থানকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, লেখিকা বিকল্প সম্ভাবনা ফুটিয়ে তুলে মেয়েদের স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে পাঠকমনে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন।

৯.৩.২.৪ বিশ্লেষণসহ পাঠকের ছক নবীকরণের চতুর্থ দৃষ্টান্ত

উপরোক্ত উদ্দেশ্যদ্বয়ের পরিণামস্বরূপ 'রাজকুমারী কামবল্লী' গল্পে আরও একটি বিষয় পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। এই গল্পে সীতা ও শূর্পণখা পরস্পরকে 'ভগ্নী' সম্বোধন করেছে। সীতা আহত শূর্পণখাকে প্রবোধ দিতে দিতে বলেছে,

> প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, এ তো এই নারীজীবনের অঙ্গ, ভগ্নী কামবল্লী, এতে ভেঙে পড়তে নেই।[৬০]

আর শূর্পণখা সীতাকে তার অসজ্জন প্রকৃতির স্বামী আর দেবরের আওতা থেকে বের ক'রে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বলেছে,

> ভগ্নী, চলো, তোমাকে লঙ্কায় নিয়ে যাই।[৬১]

এই 'ভগ্নী' সম্বোধন সম্বন্ধাত্মক সূচন (relational deixis)-এর অন্তর্গত। প্রত্যেক পাঠকের সম্বন্ধাত্মক সূচন সংক্রান্ত পূর্বজ্ঞান আছে। অর্থাৎ, 'ভগ্নী' সম্বোধন কাকে করা যায় বা সমাজে কে কে 'ভগ্নী' হবার যোগ্য, তার একটা ধারণা আছে।

ধারণাগত সংবর্গ :	/ভগ্নী/
প্রতিনিধিত্বশীল উদাহরণ :	সহোদরা
	তুত বোন
	ননদ, জা
	প্রতিবেশী বোন
	বন্ধুর বোন
	নতুন পরিচিত, রক্তের সম্পর্ক নেই, বয়সে অল্প ছোট বা বড় স্ত্রীলোক
	ইত্যাদি

কিন্তু শত্রুপক্ষের ভগ্নীও যে আন্তরিকভাবে ভগ্নী হয়ে উঠতে পারে, এটা পাঠকের বোধের অন্তর্গত 'ভগ্নী' সংবর্গের একেবারে প্রান্তীয় (peripheral) উদাহরণ। অথচ, নবনীতার গল্পে সীতা আর শূর্পণখা যেরকম সাবলীল ভঙ্গিতে পরস্পরকে 'ভগ্নী' ব'লে ডেকেছে, তাতে আমাদের

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে নবনীতা আসলে মেয়েদের প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে মেয়েদের পারস্পরিক সঙ্ঘবদ্ধতাকে দেখাতে চেয়েছেন।

এভাবে বারবার মহাকাব্যিক চরিত্রের বিপরিচিতিকরণ এইসব চরিত্র সংক্রান্ত পাঠকের এতদিনের ছকের নবীকরণ (schema refreshment) ঘটায়। বস্তুত, বিপরিচিতিকরণমাত্রই পাঠকের জ্ঞানের ছক নবীকরণ।

৯.৩.৩. নবনীতা দেবসেনের কলমে 'কুইয়র' সাহিত্য ও তার বোধগত শৈলী বিশ্লেষণ

বাংলা সাহিত্যের জগতে প্রেম ও যৌনতা বিষয়ক লেখালেখির লব্ধপ্রতিষ্ঠ রমরমা থাকলেও, 'কুইয়র' (queer) সাহিত্যের সংখ্যা একেবারেই হাতেগোনা। সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামী মানুষদের জীবন নিয়ে গড়ে ওঠে 'কুইয়র' সাহিত্য। বাঙালির জীবনে সমকামিতা, উভকামিতা কিংবা রূপান্তরকামিতা ছিল না বা নেই, এমনটা নয়। অথচ সাহিত্যে তার স্থানাভাব। বাংলা সাহিত্যের এই প্রায়-ব্রাত্য ধারায় কলম চালনা করেছেন নবনীতা। তাঁর 'বামাবোধিনী' ও 'অভিজ্ঞান' উপন্যাস এবং 'বাপ রে বাপ!' গল্প এই ধারায় উল্লেখযোগ্য। ফলে এদিক থেকেও তিনি কিন্তু বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির বাঁধা ছকের বাইরে পা রেখেছেন। অর্থাৎ, আবারও লেখিকার সেই সীমালঙ্ঘনমূলক মনোশৈলী (transgressive mind style) আমরা পাচ্ছি।

'প্রেম' এবং 'যৌনতা' যখন আমাদের ধারণাগত সংবর্গ, তখন এই দু'য়ের কিছু প্রতিনিধিত্বিশীল বৈশিষ্ট্য থাকে। সেই প্রতিনিধিত্বিশীল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের একত্র উপস্থিতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু 'সমপ্রেম' ও 'সমকাম'-এর ধারণা পূর্বোক্ত স্ত্রী ও পুরুষের যেকোনও একটিকে অপরটি দ্বারা প্রতিস্থাপন করে। তখন দুটি পুরুষ অথবা দুটি নারীর উপস্থিতি হয়ে দাঁড়ায় 'প্রেম' এবং 'যৌনতা' এই দুই সংবর্গের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যদিও ভারতীয় সমাজে তা প্রতিনিধিত্বিশীল বৈশিষ্ট্য নয়, বাঙালি সমাজে তো একেবারেই নয়। সেই

কারণেই হয়তো ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তবু ‘কুইয়র’ সাহিত্যের প্রচলন দেখা যায় এবং তার ইতিহাসও দীর্ঘ। পান্ডে বেচন শর্মার গল্পগ্রন্থ *চকলেট* (১৯২৭), ইসমত চুগতাইয়ের বিখ্যাত গল্প ‘লিহাফ’ (১৯৪২), কমলেশ্বরের *এক সড়ক সাতভা গলিয়াঁ* (১৯৫৬), কমলা দাসের আত্মজীবনী *এন্তে কথা* (১৯৭৩), নাট্যসাহিত্যে বিজয় তেন্ডুলকরের নাটক *মিত্রোচি গোস্তা* (১৯৮১), মহেশ দতানির *ডান্স লাইক আ ম্যান* (১৯৮৯), হোয়্যার ডিড আই লিভ মাই পর্দা (২০১২) প্রভৃতি এই ধারার অন্তর্গত কয়েকটি নাম মাত্র। সেখানে বাংলা ‘কুইয়র’ সাহিত্যের সংখ্যা খুবই নগণ্য। নবনীতা ছাড়া এই ধারায় যাঁরা কলম ধরেছেন, তাঁদের মধ্যে শিবরাম চক্রবর্তী (‘ছেলে বয়সে’ উপন্যাস, ‘শিশুর প্রেম’, ‘দুটি ছেলের রোমান্স’, ‘পথবালক’, ‘গোপন ব্যথা’ ছোটগল্প), তিলোত্তমা মজুমদার (*চাঁদের গায়ে চাঁদ*), স্বপ্নময় চক্রবর্তী (*হলদে গোলাপ*) কিংবা কমল চক্রবর্তী (*ব্রহ্মভার্গব পুরাণ*)-র নাম করা যায়। আর আছে কিছু তথ্যনির্ভর বই।

নবনীতা দেবসেনের লেখায় আমরা সমকামের স্পষ্ট রূপ ততটাও দেখি না, যতটা সমপ্রেম দেখতে পাই। *বামাবোধিনী* উপন্যাসে রয়েছে সঞ্জয় ও রবির প্রেমকথা এবং *অভিজ্ঞান* উপন্যাসে আছে পুষ্পাঞ্জলি ও সালমার সম্পর্কের কথা। *অভিজ্ঞান* উপন্যাসে অবশ্য কেবল সমপ্রেম বা সমকামিতার কথাই নেই, সেই সঙ্গে আছে উভকামিতার কথাও। পুষ্পাঞ্জলি প্রথমে ভালোবাসত সৌম্যকে। তারপর একটা সময় এলো, যখন সে একদিকে সৌম্য আরেক দিকে সালমাকে ভালোবাসতে থাকে। তারপর সে শুধুমাত্র সালমাকেই তার জীবনে গ্রহণ করল। সুতরাং, পুষ্পাঞ্জলির জীবনে sexual preference-এর তিনটি স্তর ক্রমান্বয়ে দেখা গেছে – ১) বিষমকামিতা (hetero-sexuality) ২) উভকামিতা (by-sexuality) ৩) সমকামিতা (homo-sexuality)। যখন সে দ্বিতীয় স্তরে ছিল, তখন তার অনুভূতি নিম্নরূপ –

১) "... আমি তো লেসবিয়ান নই, তুই তো নিজেই ভালো করে জানিস, আমি স্ট্রেট? অথচ আমার সঙ্গে সালমার সম্পর্কটা সত্যি একটা কেমন যেন হয়ে উঠেছে, আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না।"[৬২]

২) "প্লিজ সৌম্য, তুই চুপ কর, চুপ কর। আর বলিস না।"[৬৩]

অর্থাৎ, পুষ্পার নিজেকে সমকামীরূপে ভাবতে সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু উপন্যাস যত এগোয়, ততই সে খুব স্বাভাবিকভাবেই সমকামিতাকে নিজের জীবনে গ্রহণ করে। তাই তাকে অনায়াসে বলতে শোনা যায় –

"ইটস মি অ্যান্ড সালমা। ইয়েজ। আই হ্যাভ ফাউন্ড মাই ট্রু সেল্‌ফ মাসি, মাই রিয়াল প্রেফারেন্স।"[৬৪]

উপন্যাসের একেবারে শেষ দৃশ্যে দেখা যায় –

পুষ্পা সৌম্যর দিকে আকায় একবার, অংশুমালার দিকে একবার। অনিশ্চয়তা খেলা করে তার স্বচ্ছ, সহজপাঠ চোখে-মুখে। পরক্ষণে গাড়ির মধ্যে সালমার দিকে তাকায়। এক মুহূর্ত স্থিরনিবদ্ধ থাকে দু'জনের চোখ। তারপরেই সালমা ঝুঁকে পড়ে গাড়ির দরজা খুলে দেয়।

সহজভাবেই তার পাশে উঠে বসল পুষ্পা।[৬৫]

এখানে লক্ষণীয়, অনিশ্চয়তা-ভরা চোখের দৃষ্টি সুস্থির হয় প্রেমাস্পদের চোখে চোখ রাখার পর এবং তারপরেই আসে সালমার 'ঝুঁকে পড়ে' গাড়ির দরজা খোলার কথা। উপন্যাসে এর আগে আমরা পেয়েছি সালমার ওপর পুষ্পার অভিমান হওয়া এবং সেই অভিমান ভাঙানোর জন্য সালমার দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও আকুতির কথা। কখনো আবার ওয়েন্ডিকে ওদের সম্পর্কে বলতে শোনা যায় –

প্রেমিকদের একবার কাছাকাছি হতে দেওয়া উচিত। প্রেমিকদের অনেক সমস্যা হাত ধরলেই মিটে যায়। ... দাও না, ওই মেয়েটাকে মাফ চাইবার সুযোগ। লেট হার এক্সপ্লেইন হারসেল্‌ফ! ও তো পালিয়ে যায়নি, বার বার ফিরে আসছে। অবভিয়াসলি শি কেয়ার্স ফর হার![৬৬]

এই সবটা মিলিয়ে প্রেমের যে ছবি তৈরি করে, তা পাঠকের প্রেম সংক্রান্ত সনাতন ধারণাকেই সমর্থন করে। শুধু যে নতুন বৈশিষ্ট্যটি 'প্রেম' সংবর্গে যুক্ত করতে হয়, তা হল পরস্পরের প্রেমে পড়া মানুষ দুটি সমলিঙ্গের।

এছাড়া আছে নবনীতার লেখা রূপান্তরকামী পুরুষের গল্প 'বাপ রে বাপ!'। 'পুরুষ' এবং 'নারী' এই দুই ধারণাগত সংবর্গের বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বিশীল বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু রূপান্তরকামী বিষয়টি কোনোভাবেই সংবর্গের কেন্দ্রীয় এমনকি গৌণ বৈশিষ্ট্যের আওতায় পড়ছে না। যদিও দেশ ও সংস্কৃতি ভেদে প্রতিনিধিত্বিশীলতার তফাৎ হয়, তবু জোরের সাথেই বলা যায় যে রূপান্তরকামী বিষয়টি কোনও সংস্কৃতিতেই 'পুরুষ' কিংবা 'নারী' সংবর্গের কেন্দ্রীয় কিংবা গৌণ বৈশিষ্ট্য নয়। বস্তুত, রূপান্তরকামী মানুষদেরকে তৃতীয় বিশ্বের সমাজ এক প্রকার প্রান্তীয় ক'রে রাখতে চায়। হয় তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে, নয়তো একেবারেই আমল দিতে চায় না। তাই রূপান্তরকামিতা 'পুরুষ' ও 'নারী' সংবর্গের প্রতিনিধিত্বিশীল বৈশিষ্ট্যের সারিতে একেবারে প্রান্তীয় (peripheral) বৈশিষ্ট্য। কিন্তু নবনীতা তাঁর গল্পে রূপান্তরকামী পুরুষকেই স্থাপন করেছেন গল্পের কেন্দ্রে। আমরা পরপর বেশ কিছু দৃষ্টান্ত দেখে নেব, যেখানে রূপান্তরকামী সোমেশের কথনশৈলী, শব্দ চয়ন, তার দেহভঙ্গি, চালচলন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সোমেশের সোমা হয়ে ওঠার জার্নি ধরা আছে এই গল্পে।

- চিরকালই সোমেশের চেহারায় সেই মেয়েলি মিষ্টিতাটা আছে, 'লালিমা পাল (পুং)' গোছের একটা লাবণ্য, যাকে বলে লালিত্য।[৬৭]
- বাড়িতে মেয়েরা এলেই আর রক্ষে নেই! অমনি সোমেশবাবু এসে হামলে পড়বেন, 'বাঃ, বাঃ, কী শাড়ি এটা; ... দেখি! দেখি! অর্গানজা প্রিন্ট বুঝি? ... বালাজোড়া কবে করালেন মিসেস রয়? আগে দেখিনি তো? দারুণ কাজটা করেছে কিন্তু! ক'ভরি সোনায় হল?' [৬৮]
- ... কথায় কথায় চোখে জল এসে যাচ্ছিল সোমেশবাবুর ...[৬৯]

- সরু ভুরুর মাঝখানে নীল টিপ, শ্যাম্পু করা বয়জ-কাট চুল কপাল উড়ে পড়ছে, দু হাতের দশটা নোখে ম্যাচিং শকিং পিংক নেল পলিশ, সেই আঙুল দিয়ে খুব ডেলিকেটলি 'ফেমিনা' ধরে আছেন সোমেশবাবু।[৭০]
- কপালের উড়ো চুল আস্তে করে সরিয়ে সোমেশ বললেন, 'কেমন দেখছো? আমার নাম এখন সোমা।'[৭১]
- ... হাসলেন সোমা চৌধুরী, 'আসলে প্রবলেম অন্যত্র। ... চাকরিতে, পাসপোর্টে ... সব সার্টিফিকেটগুলিতে ... চল্লিশ বছরের আইডেনটিটি হঠাৎ বদল করা কি সহজ? উঃ, মা গো!'[৭২]
- ইন্দু, আমাকে তুমি ছেড়ে যাবে না তো ভাই? [৭৩]
- কনুই দিয়ে ইন্দ্রাণীকে একটা মেয়েলি ধাক্কা দিয়ে মুচকি হাসলেন সোমেশ।[৭৪]
- ... ভুরু উঁচিয়ে ঠোঁট গোল করে কমপ্লিমেন্ট দেন, 'ঈ-ঈ-শ্-শ্---কী-ই দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে ইন্দু! ...'[৭৫]

সোমেশের ভাষিক নির্বাচন ও প্রায়-ভাষা গুরুত্বপূর্ণ। গল্পের অন্যান্য চরিত্রেরা সোমেশের সোমা হয়ে যাওয়ার ঘটনায় প্রাথমিকভাবে হকচকিয়ে গেলেও পরে তারা প্রত্যেকেই সামলে যায়। বিশেষ ক'রে সোমেশের স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা তাকে একেবারেই নিরাশ করেনি, বরং তারা বেশ ভালোভাবেই সমর্থন করেছে। এই সমর্থনের পরিবেশ বাস্তব জগতে খুবই দুর্লভ। যে-সমাজে রূপান্তরকামীরা নানা প্রতিকূলতার কারণে অধিকাংশ সময়েই নিজেদেরকে রূপান্তরিত করে উঠতেই পারে না, সেই সমাজে দাঁড়িয়ে নবনীতা দেবসেন একজন সফল রূপান্তরিত মানুষের জীবন ও তার সামাজিক স্বীকৃতির গল্প বলেছেন। এভাবে তিনি পাঠকের ধারণায় থাকা 'পুরুষ' সংবর্গের প্রতিনিধত্বশীল বৈশিষ্ট্যের রেডিয়ালে প্রান্তীয় অবস্থানে থাকা রূপান্তরকামিতা বৈশিষ্ট্যটিকে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে আনতে চেয়েছেন।

নবনীতা খুব সহজ নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে এইসব কাহিনি লিখে গেছেন বাঙালি পাঠকসমাজ যাতে তাঁদের এতকালের 'প্রেম', 'যৌনতা' ও 'লিঙ্গ পরিচিতি' সংক্রান্ত সংবর্গগুলির প্রান্তীয় বৈশিষ্ট্যকে কিছুটা কেন্দ্রের দিকে আনতে পারেন কিংবা কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য একত্রীকরণ (assemble) ক'রে নিতে পারেন। যদিও একুশ শতকে দাঁড়িয়েও অনেক পাঠকের কাছেই এটি

ঠিক আলগোছে একত্রীকরণ (softly assemble) করার মতো বিষয় নয়। তবে যদি এমনটা করা সম্ভব হয়, তাহলে সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামী মানুষদের প্রতি সমাজের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব হয়তো কিছুটা কমবে এবং বাংলায় ‘কুইয়র’ সাহিত্য গড়ে ওঠার প্রবণতাও বাড়বে।

৯.৪. তথ্যসূত্র

১। Peter Stockwell, *Cognitive Poetics: An Introduction* (London and New York: Routledge, 2002), 29.

২। Elena Semino, “A cognitive stylistic approach to mind style in narrative fiction,” in *Cognitive stylistics: Language and cognition in text analysis*. eds. E. Semino and J. Culpeper, (Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002), 97.

৩। Semino, “A Cognitive Stylistic Approach,” 96.

৪। R. Fowler, *Linguistics and the Novel* (London: Methuen, 1977), 103.

৫। নবনীতা দেবসেন, "আমি অনুপম," *দশটি উপন্যাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., জানুয়ারি ২০০৩), ২৮।

৬। দেবসেন, "আমি অনুপম," ১৯।

৭। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৬৯।

৮। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৮৮।

৯। দেবসেন, "আমি অনুপম," ২৪।

১০। দেবসেন, "আমি অনুপম," ২৪।

১১। দেবসেন, "আমি অনুপম," ২৫।

১২। দেবসেন, "আমি অনুপম," ২৫।

১৩। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৩১।

১৪। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৩১।

১৫। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৩২।

১৬। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৩২।

১৭। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৩২।

১৮। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৩২।

১৯। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৩৬।

২০। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৩৭।

২১। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৪৭।

২২। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৫১।

২৩। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৬৫।

২৪। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৪১।

২৫। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৫৯।

২৬। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৫২।

২৭। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৬২।

২৮। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৬০।

২৯। দেবসেন, "আমি অনুপম," ১৭।

৩০। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৪৮।

৩১। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৭১।

৩২। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৭২।

৩৩। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৭২।

৩৪। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৯৪।

৩৫। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৯৫।

৩৬। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৪২।

৩৭। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৪৯।

৩৮। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৫৮।

৩৯। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৫৮।

৪০। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৭২।

৪১। George Lakoff and Mark Johnson, *Metaphors We Live By* (Chicago: University of Chicago Press, 1980), 154-155.

৪২। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৭২।

৪৩। C. Day Lewis, *The Poetic Image* (London: Jonathan Cape, 1947), 18.

৪৪। দেবসেন, "আমি অনুপম," ৭১।

৪৫। Dey's Publishing, "NDS Memorial Lecture", uploaded January 15, 2022, video, 54:35, https://www.facebook.com/share/v/Hri5K5x4HqYvA3bp/?mibextid=jmPrMh.

৪৬। নবনীতা দেবসেন, "রাজকুমারী কামবল্লী," *গল্পসমগ্র* ২, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২২৫।

৪৭। দেবসেন, "রাজকুমারী কামবল্লী," ২২৪।

৪৮। নবনীতা দেবসেন, "মূল রামায়ণ," *গল্পসমগ্র* ২, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২১৭।

৪৯। দেবসেন, “মূল রামায়ণ,” ২১৭।

৫০। দেবসেন, “মূল রামায়ণ,” ২১৭।

৫১। দেবসেন, “মূল রামায়ণ,” ২১৭।

৫২। দেবসেন, “মূল রামায়ণ,” ২১৭।

৫৩। দেবসেন, “মূল রামায়ণ,” ২১৭।

৫৪। দেবসেন, “মূল রামায়ণ,” ২১৮।

৫৫। Stockwell, *Cognitive Poetic*, 29.

৫৬। নবনীতা দেবসেন, “সীতার পাতাল প্রবেশ,” *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২৪৪।

৫৭। দেবসেন, “মূল রামায়ণ,” ২১৮।

৫৮। দেবসেন, “অমরত্বের ফাঁদে,” ২৩২।

৫৯। নবনীতা দেবসেন, “সীতা থেকে শুরু,” *গল্পসমগ্র ২*, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭), ২০৯।

৬০। দেবসেন, “রাজকুমারী কামবল্লী,” ২২৯।

৬১। দেবসেন, “রাজকুমারী কামবল্লী,” ২২৯।

৬২। নবনীতা দেবসেন, *অভিজ্ঞান* (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, ২০১২), ১১।

৬৩। দেবসেন, *অভিজ্ঞান*, ১৪।

৬৪। দেবসেন, *অভিজ্ঞান*, ৪৬।

৬৫। দেবসেন, *অভিজ্ঞান*, ৭৯।

৬৬। দেবসেন, *অভিজ্ঞান*, ৬৭-৬৮।

৬৭। নবনীতা দেবসেন, “বাপ রে বাপ!,” *গল্পসমগ্র ৩*, ৪র্থ সংস্করণ, (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০২০), ২৫৬।

৬৮। দেবসেন, “বাপ রে বাপ!,” ২৫৬।

৬৯। দেবসেন, “বাপ রে বাপ!,” ২৫৬।

৭০। দেবসেন, “বাপ রে বাপ!,” ২৫৮।

৭১। দেবসেন, “বাপ রে বাপ!,” ২৫৮।

৭২। দেবসেন, “বাপ রে বাপ!,” ২৫৯।

৭৩। দেবসেন, “বাপ রে বাপ!,” ২৫৯।

৭৪। দেবসেন, “বাপ রে বাপ!,” ২৫৯।

৭৫। দেবসেন, “বাপ রে বাপ!,” ২৬১।

দশম অধ্যায়

নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের শৈলীতে জীবনাদর্শের প্রতিফলন অনুসন্ধান

১০. নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের শৈলীতে জীবনাদর্শের প্রতিফলন অনুসন্ধান

১০.১. ভূমিকা

> As Threadgold (1989) observes, texts are never ideology-free nor are they objective. Nor can they be separated from the social realities and processes they contribute to maintaining. For Threadgold, spoken and written genres are not just linguistic categories but 'among the very processes by which dominant ideologies are reproduced, transmitted and potentially changed' (107).[১]

T. Threadgold তাঁর ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত 'Talking about genre: Ideologies and incompatible discourses' শীর্ষক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সাহিত্যিক সমাজ-পরিবেশের অন্তর্গত একজন ব্যক্তিমানুষ। স্বভাবতই সমাজের আর পাঁচজন চিন্তক পুরুষের ন্যায় সাহিত্যিকও তাঁর ব্যক্তিজীবনের একেকটি বাঁকে বিশেষ বিশেষ চিন্তা, আস্থা, মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হন। ফলস্বরূপ, তাঁর সৃষ্টির জগতের ভিতরে ভিতরে অনুভূত হয় তাঁর অনুসৃত বা সমর্থিত মূল্যবোধ তথা জীবনাদর্শের সচেতন বা অসচেতন প্রকাশ। আখ্যানের ক্ষেত্রে জীবনাদর্শের প্রতিফলন দেখা যায় ভাষিক চয়নে তথা আখ্যান নির্মাণের শৈলীতে।

সাহিত্যিকের অনুসৃত জীবনাদর্শ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনও বিশেষ ভাবাদর্শ (ideology) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। আবার, জীবন ও পরিপার্শ্বকে দেখার এমন কোনও দৃষ্টিভঙ্গিও জীবনাদর্শ হয়ে উঠতে পারে, যা হয়তো ইতিহাসে আলাদা করে কোনও বিশেষ ভাবাদর্শের জন্ম দেয়নি। আমরা যাকে বলি 'ideology', অভিধান অনুসারে সেটি হল –

1 a set of ideas that an economic or political system is based on: *Marxist / capitalist ideology* **2** a set of beliefs, especially one held by a particular group, that influences the way people behave: *the ideology of gender roles* [২]

অভিধানে একরকম সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হলেও, বিদ্যজনেরা 'ideology'-র কোনও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় উপনীত হতে পারেননি। তবু যেসব সংজ্ঞা প্রচলিত, সেগুলির কয়েকটি নিম্নরূপ –

(a) the process of production of meanings, signs and values in social life;
(b) a body of ideas characteristic of a particular social group or class;
(c) ideas which help to legitimate a dominant political power;
(d) false ideas which help to legitimate a dominant political power;
(e) systematically distorted communication;
(f) that which offers a position for a subject;
(g) forms of thought motivated by social interests;
(h) identity thinking;
(i) socially necessary illusion;
(j) the conjuncture of discourse and power;
(k) the medium in which conscious social actors make sense of their world;
(l) action-oriented sets of beliefs;
(m) the confusion of linguistic and phenomenal reality;
(n) semiotic closure;
(o) the indispensable medium in which individuals live out their relations to a social structure;
(p) the process whereby social life is converted to a natural reality.[৩]

এই প্রসঙ্গে Louis Althusser-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিখ্যাত *For Marx* গ্রন্থে তিনি লিখছেন,

> In ideology men do indeed express, not the relation between them and their conditions of existence, but the way they live the relation between them and their conditions of existence: this presupposes both a real relation and an 'imaginary', 'lived' relation. Ideology, then, is the expression of the relation between men and their "world." that is, the (overdetermined) unity of the real relation and the imaginary relation between them and their real conditions of existence. In ideology the real relation is inevitably invested in the imaginary relation, a relation that expresses a will (conservative, conformist, reformist or revolutionary), a hope or a nostalgia, rather than describing a reality. [৪]

এই উক্তির সঙ্গে সকলে নিশ্চয়ই সহমত পোষণ করবেন না। ঠিক যেমন সমালোচক Terry Eagleton মনে করেন –

> Ideology, then, is not to be reduced to miscognition, but is to be seen as signifying a set of practical relations with the "real." [৫]

বেশিরভাগ ভাবাদর্শ প্রকারান্তরে 'dominance'-কে বৈধতা দিলেও, এর বিপরীতধর্মী ভাবাদর্শও নিতান্ত দুর্লভ নয়। এই বিপরীতধর্মী ভাবাদর্শগুলিকে "positive ideologies" হিসেবে চিহ্নিত করছেন van Dijk। তাঁর কথায় –

> 'positive' ideologies, such as those of feminism and anti-racism in the same way, namely as systems that sustain and legitimize opposition and resistance against domination and social inequality. Karl Mannheim called such positive or oppositional ideologies 'utopias'. "Anti-ideologies" such as those of anti-racism, thus, are not just opposing racism and racist ideologies, but have their own (e.g., humanitarian) ideology -- just as feminist ideologies are not merely anti-sexist.[৬]

সমাজ পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত একজন ভাবুক হিসেবে সাহিত্যিক তাঁর জীবনে কোনও এক বা একাধিক ভাবাদর্শকে পাথেয় করতে পারেন। তবে এছাড়াও, জীবনে চলার পথে আরও নানা ধরনের ছোট-বড় মূল্যবোধের সমন্বয়ে একেকটি জীবনাদর্শ গড়ে ওঠে। হয়তো সেগুলি সেই অর্থে কোনো নির্দিষ্ট '-বাদ' বা '-ism' হিসাবে ইতিহাসে উল্লিখিত হয় না। কিন্তু সেইসব জীবনাদর্শও মানুষের নিত্যদিনের যাপনকে নিয়ন্ত্রণ করে। সাহিত্যিকের সাহিত্যসাধনার জগতে তো তার প্রতিফলন অনিবার্য। এর দৃষ্টান্ত আমরা নবনীতা দেবসেনের সাহিত্যে পেয়েছি, যা বর্তমান অধ্যায়ে পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে। সেইসঙ্গে দেখা যাবে, van Dijk উল্লিখিত "positive ideologies"-ও নবনীতার গল্প উপন্যাসে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

> The analysis may start by looking at textual features in the text and move from there to explanation and interpretation of the analysis. This may include tracing underlying ideologies from the linguistic features of a text, unpacking particular biases and ideological presuppositions underlying the text and relating the text to other texts, and to readers' and speakers' own experiences and beliefs (Clark 1995).[৭]

‘Developing critical reading practices’ প্রবন্ধে R. J. Clark নির্দেশিত উপরোক্ত পদ্ধতি বর্তমান অধ্যায়ে অনুসরণ করা হয়েছে। নবনীতা দেবসেনের গল্প ও উপন্যাসের শৈলীগত বৈশিষ্ট্য সন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে আগেই নির্ণয় করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্য হল, সেইসব শৈলীগত বৈশিষ্ট্যে কী ধরনের জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হয়, তা অনুসন্ধান করা।

১০.২. নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যে প্রতিফলিত জীবনাদর্শ

নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের শৈলীতে প্রধানত তিন ধরনের জীবনাদর্শের প্রভাব অনুভূত হয়। এই জীবনাদর্শগুলি নিম্নরূপ –

(ক) নারীবাদের প্রভাবপুষ্ট জীবনাদর্শ

(খ) বহুসংস্কৃতিবাদের প্রভাবপুষ্ট জীবনাদর্শ

(গ) সমস্ত গ্লানি, তুচ্ছতা, অচরিতার্থতাকে সরিয়ে নবোদ্যমে বাঁচতে শেখার জীবনাদর্শ

১০.২.১. নারীবাদ (Feminism)

নারীবাদের ইতিহাস যেমন সুদীর্ঘকালের, তেমনি বিদগ্ধমহলে এই বিষয়ে চর্চার পরিসরও সুব্যাপ্ত। এখন কেবলমাত্র মূল আলোচনায় প্রবেশের সুবিধার্থে নারীবাদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা তুলে ধরা হল।

পুরুষের আধিপত্যবাদ থেকে নারীর মুক্তি, নারীর নিজস্বতা, স্বাধীন ইচ্ছা, অভিরুচির কথা বলে নারীবাদ। লিঙ্গবৈষম্যহীন সমাজ, নারীর সমানাধিকার অর্জন এবং নারীর নিজস্ব পরিচিতি নির্মাণের বিষয়ে সচেতনতার বার্তা দেন নারীবাদীরা।

১০.২.২. বহুসংস্কৃতিবাদ (Multiculturalism)

সমাজে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির মানুষের পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান এবং নিজ নিজ সংস্কৃতির চর্চাকে ধরে রাখার কথা বলে বহুসংস্কৃতিবাদ। এই আদর্শ অনুসারে, বৃহত্তর সাংস্কৃতিক সমাজ পরিমণ্ডলে স্বল্প জনসংখ্যার সংস্কৃতিকেও যাতে বাঁচিয়ে রাখা যায়, যাতে বৃহৎ জনসংখ্যার সংস্কৃতির চাপে তা হারিয়ে না যায়, সেই ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, জনজাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং বিবিধ সংস্কৃতির সহাবস্থান, বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে থেকেও ভিন্ন সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও চর্চা – এগুলি যখন কোনও গল্প বা উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে সংশ্লিষ্ট গল্প বা উপন্যাসে ধরা দিয়েছে বহুসংস্কৃতিবাদী জীবনাদর্শ।

১০.২.৩. সমস্ত গ্লানি, তুচ্ছতা, অচরিতার্থতাকে সরিয়ে নবোদ্যমে বাঁচতে শেখার জীবনাদর্শ

বলা বাহুল্য, এই জীবনাদর্শ কোনো 'বাদ' বা '-ism'-এর জন্ম দেয়নি। মানুষের নিত্যদিনের জীবন অভিজ্ঞতা থেকে উঠে এসেছে এই জীবনাদর্শ, যাকে অনেক মানুষ জীবনে চলার পথে পাথেয় করেন, আবার অনেকে হয়তো পাথেয় করতে চেয়েও করতে পারেন না। কিন্তু এমন এক আদর্শের কথা জানেন অধিকাংশই। জীবনের এই আদর্শকে রবীন্দ্রনাথের ভাষা অনুসরণ করে বলা যায়, "ভালোমন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে"[৮]। কারণ, জীবনের যাবতীয় গ্লানি, তুচ্ছতা, অচরিতার্থতাজনিত সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারলে তবেই জীবনের আসন্ন পথে নবোদ্যমে পদক্ষেপ করা যায়। নবনীতা যে রবীন্দ্রকবিতার এই বাক্যটিকে তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র করেছিলেন, তা আমরা বর্তমান সন্দর্ভের প্রাথমিক পর্যায়ের 'নবনীতা দেবসেনের জীবন ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা' শীর্ষক অংশেই জেনেছি। তাঁর এই জীবনাদর্শের ছাপ বারবার ফুটে উঠেছে তাঁর সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে।

১০.৩. নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের শৈলীতে জীবনাদর্শের প্রতিফলন

আমরা প্রধানত বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্পে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা জীবনাদর্শের বাহক শব্দ কিংবা শব্দগুচ্ছ লক্ষ করব। কারণ লেখিকার সচেতন বা অসচেতন শব্দচয়নের প্রকৃতিতেই ধরা দিয়েছে তাঁর জীবনাদর্শ। তবে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভাষাবৈশিষ্ট্যেও আলোকপাত করা হবে।

১০.৩.১. নারীবাদের প্রভাবপুষ্ট জীবনাদর্শ প্রকাশক শৈলী অনুসন্ধান

১০.৩.১.১. 'ফিনিক্স' উপন্যাসে নারীবাদ প্রকাশক শব্দ ব্যবহার

প্রধান চরিত্র বিপাশাকে কেন্দ্র করে উচ্চারিত শব্দগুচ্ছ নিম্নরূপ –

'মুক্ত প্রাণ', 'ফ্রি স্পিরিট', 'বন্ধনহীন চিত্ত', 'ম্যাচিয়োর ভুবনায়িত মানুষ', 'উদ্ধত যৌবন', 'পুরুষ প্রয়োজন', 'নিজের অভীষ্ট', 'মেধা', 'মনন', 'মুক্তপক্ষ'।

১০.৩.১.২. 'ফিনিক্স' উপন্যাসে নারীবাদ প্রকাশক বাক্য ও বাক্যাংশ ব্যবহার

প্রধান চরিত্র বিপাশাকে কেন্দ্র করে উচ্চারিত নারীবাদী জীবনাদর্শের প্রতিফলক বহুবিধ বাক্যাংশ ও বাক্যের মধ্য থেকে নিদর্শন হিসাবে কয়েকটি নিচে উদ্ধৃত হল –

> পৃথিবীতে যেখানে খুশি যেভাবে খুশি নিজের ইচ্ছেমতো জীবনযাপন করতে পারেন[৯]
> ছাত্রবয়েসে ইয়োরোপে হিচ হাইক করেছেন[১০]
> অ্যাকাডেমিক সমাজে এত গুরুত্ব দেয় সকলে[১১]
> টিপিক্যাল ভারতীয় মায়ের পরাকাষ্ঠা নন[১২]
> পুরুষ ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ বিপাশার তাদের প্রয়োজন[১৩]
> ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তাঁর ফ্যানের সংখ্যা প্রচুর[১৪]
> বিপাশা ভাবেন, কাকে বলে বয়স হওয়া? [১৫]

পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে গিয়ে নারীর সার্বিক স্বাধীনতাকে স্পষ্ট করে এইসব শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার।

এছাড়া, সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে আমরা বিপাশার অনুভূতি প্রকাশক যেসব চিত্রকল্পের হদিশ পেয়েছি [দ্র. ১.৩.২.১-এর (ক), (খ) এবং ১.৩.৩.১-এর (ছ)], সেখানেও ধরা দিয়েছে তার পুরুষের সমান কিংবা পুরুষের থেকে অধিক যোগ্যতা এবং স্বাধীনতা।

১০.৩.১.২. *'ঘূর্ণি' উপন্যাসে নারীবাদ প্রকাশক শৈলী*

ঋতবানের স্ত্রী রিমি একজন চিত্রশিল্পী, খুবই স্বাধীনচেতা, জীবনে চলার পথে তার প্রেম এসেছে বারবার। স্বামী ঋতবানকে যেমন সে ভালোবাসে, তেমনি অন্য পুরুষকেও স্বাগত জানায় নির্দ্বিধায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পরিকাঠামোয় একজন পুরুষের বহুগামিতাকে নিরন্তর সহ্য করে চলা স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্ত অগুন্তি। কিন্তু এর ঠিক বিপরীত ছবি বিরলতম। সেই বিরলতম কাহিনির সাক্ষ্য বহন করছে 'ঘূর্ণি'।

স্বামী ঋতবানের দৃষ্টিকোণ থেকে রিমি সম্পর্কিত কয়েকটি অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ করব –

- এত অস্থির, এমন বৃষ্টিধারার মতো অবাধ্য, এত বর্ষার মেঘের মতো অন্ধকার রহস্যে ঘেরা, ঋতবানের বউ, রিমি চ্যাটার্জি।[১৬]
- মেয়েটার মধ্যে একটা জান্তব আকর্ষণ আছে। রিমির মধ্যেও। সেটাই তো সমস্যা।[১৭]
- ... পুরো ঘটনাটা রিমিরই খ্যাপামি, তারই ত্রুটিজনিত বিভ্রান্তি ... আবির্ভূত হল সুন্দরী রিমি, সরিয়ে নিল চঞ্চলদাকে, তাঁর দিবস নিশা, তাঁর কাজের সময়, বিশ্রামের সময়, সকলই গ্রাস করে ফেলল সে।[১৮]
- তুই কী করে ভাস্বতীকে, টুকাইকে, ঋতকে এমন করে ভুলে গেলি আদি? রিমি কি সত্যি সত্যি জাদুকরী? [১৯]
- পূর্ণব্রতর ব্যাপারটা ... ওকে মেনে নিতে বাধ্য করেছিল রিমি, ... হাসতে হাসতে বুঝিয়েছিল ওকে রিমি, পূর্ণব্রত ইজ জাস্ট মাই বেডমেট, নাথিং মোর ...[২০]
- এমনকি বাচ্চা ছেলে জিৎ-এর সঙ্গে রিমি যা করল ... আটকাতে পারেনি ঋত। আপত্তি টেকেনি তার। ... তার বাধা টেকেনি। ... রিমি যাই করুক, ঋত তা সহ্য করে নিয়েছে। ঢেকেঢুকেও রেখেছে যথাসাধ্য।[২১]

- সেই প্রথম সন্তানের অ্যাবরশন দিয়ে শুরু। ... এই সব যন্ত্রণাদায়ক কর্মকাণ্ডে এই সব জটিল ঘটনায় ঋতর মন-প্রাণ-রুচি সব কিছুই ভিতরে ভিতরে খান খান হয়ে গিয়েছে বারবার।[২২]
- আবার রিমি তাকে জাদুবলে বশ করেছে।[২৩]
- রিমি এমন মক্ষিরানি টাইপের ...[২৪]
- অন্যের কথায় চলা রিমির চরিত্রে নেই[২৫]
- ... কী একটা বন্ধনহীনতার নিষ্ঠুরতা আছে রিমির মধ্যে।[২৬]
- ঠিক-ভুল কে জানে, কিন্তু রিমিকে প্রতিহত করার শক্তি ওর ছিল না। জটিল একটা মোহের আঠালো জালের মধ্যে বাঁধা পড়েছিল ঋতবান, স্ত্রী বশম্বদ ঋতবান, অন্ধ, অসমর্থ, মাছির মতো সামান্য শিকার।[২৭]

ওপরের চিহ্নিত বিভিন্ন অংশে প্রকাশ পেয়েছে স্ত্রীর প্রতি ঋতবানের অনিঃশেষ মুগ্ধতা, কখনো ব্যর্থতা, কখনো যন্ত্রণা। সেইসঙ্গে তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্ধৃতিতে লক্ষিত হয় একই ঘটনায় লিপ্ত পুরুষ ও নারীর মধ্যে নারীকেই দোষী সাব্যস্ত করে পুরুষের দোষকে লঘু করে দেখার পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা। আবার কোথাও ধরা থাকে একজন নারীর নিজ সিদ্ধান্তে অনড় থেকে পুরুষকে নিয়ন্ত্রণ করার আশ্চর্য ভঙ্গি। শেষ উদ্ধৃতিতে নির্মিত চিত্রকল্পে দৃশ্যমান হয় সেই নিয়ন্ত্রণাধীন অবনত পুরুষের ছবি।

এছাড়া সমগ্র উপন্যাসে ঋতবানসহ অন্যান্য চরিত্রের বিবিধ ভাবনার মধ্য দিয়ে রিমির উপস্থিতিভঙ্গি এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়। এক্ষেত্রে যেসব শব্দগুচ্ছ মনোযোগ আকর্ষণ করে, সেগুলি নিম্নরূপ –

- মনোযোগ চায় খাজনা আদায়ের ভঙ্গিতে[২৮]
- রিমি যেন স্বাধীন, একা, সে কারও কাছে দায়বদ্ধ নয়।[২৯]
- তা না হলে প্রায় কিশোর জিৎকে সে তার মোহমদির উর্ণজালে জড়াত? [৩০]
- দুরাত্মার যেমন ছলের অভাব হয় না, প্রেমাত্মা রিমিরও কখনও যুক্তির অভাব হয় না।[৩১]

এগুলিতে যেমন ধরা আছে এক নারীর আক্ষরিক অর্থেই স্ব-অধীন খেয়ালী মানসিকতা, তেমনি একাধারে খুব সূক্ষ্মভাবে মিশে আছে পুরুষশাসিত সমাজে বেড়ে ওঠা নরনারীর (ঋতবান ও ভাস্বতী) পক্ষ থেকে একধরনের খোঁচা।

রিমির পাশাপাশি এই উপন্যাসে এসেছে আরেক নারী ভাস্বতী। ভাস্বতীর স্বামী আদিত্যর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে রিমি। আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ঝাপটায় ভাস্বতীর পৃথিবীটা টলে গিয়েছে। তবু সে ভেঙে পড়েনি। ভাস্বতী চরিত্রের মধ্য দিয়ে নবনীতা দেখিয়েছেন, ব্যক্তিগত জীবনটাই নারীর একমাত্র ভাবনাচিন্তার জায়গা নয়। বহির্জগতে নারীর দায়িত্ববহুল কর্মজীবন আছে, তার একটা আলাদা প্রতিষ্ঠিত সুপরিচিতি আছে। আদিত্য ভাস্বতীকে ছেড়ে রিমির সাথে চলে গেলেও আমরা ভাস্বতীকে নিম্নরূপে ভাবতে দেখি –

> তীব্র ছোরার মতো বিঁধছে। সহ্য করতে পারছি না। ভালো হচ্ছে সামনের সপ্তাহে ইলেকশন ডিউটি পড়ছে। অন্য কিছু চিন্তা-ভাবনার সময় থাকবে না শ্রীমতী ইলেকশন কমিশনারের।[৩২]

নিম্নরেখাংকিত অংশটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্যক্তিগত জীবন কোনোভাবে এলোমেলো হয়ে গেলেও পুরুষের মতোই একজন নারীও তার কর্মজীবনে নিজস্ব পরিচিতি (self identity)-তে ভালো থাকার রসদ পেতে পারে।

১০.৩.১.৩. 'অ্যালবাট্রস' উপন্যাসে নারীবাদ প্রকাশক শব্দ ব্যবহার

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুরুষের বহুগামিতাকে কেবল মেনে নেয় না, সেই সঙ্গে কখনো কখনো প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় দিতেও পিছপা হয় না। কিন্তু বহুগামী নারী এই সমাজের চোখে পাপিষ্ঠা। কিন্তু নবনীতা দেবসেনের 'ফিনিক্স' এবং 'ঘূর্ণি' উপন্যাসের মতোই 'অ্যালবাট্রস' উপন্যাসেও দেখা যায় নারীর বহুগামিতা এবং সেই বহুগামিতার জন্য নারীর উদ্ধত গর্বিত ভঙ্গি। যেমন –

... বন্ধুর প্রেমিককে যদি চুরি করতে চাও সেটা হয়তো পাপ বলে ভাবা যেতেও পারে, কিন্তু ইফ ইউ জাস্ট ওয়ান্ট টু হ্যাভ ফান উইথ হিম – জাস্ট এনজয় হিস্ কম্পানি ফর আ নাইট – তাতে দোষের কী আছে? [৩৩]

পদ্মিনী সিং দেহে মনে সম্পূর্ণ স্বাধীন এক প্রৌঢ়া সুন্দরী। তার নিজের উক্তিতেই তার ছবি স্পষ্ট হয় –

আই অ্যাম মাই ওন উওম্যান – আ ফ্রী উওম্যান ... দ্য ওয়ে মেন হ্যাভ বীন, দ্য ওয়ে মেন আর,... অ্যান্ড আই লাইক টু ইউজ মেন ফর মাই ঔন প্লেজার ... যেটা মেয়েরা করলেই সমাজের মাথায় বজ্রপাত হয়।[৩৪]

প্রতিটি শব্দব্যবহারে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতা ঝংকৃত হতে থাকে। মেয়েদের জন্য সমাজের এঁকে দেওয়া গণ্ডীরেখাকে কোনো পরোয়াই করেনি পদ্মিনীর মতো চরিত্রেরা।

'অ্যালবাট্রস', 'ফিনিক্স' এবং 'ঘূর্ণি'-র মতো উপন্যাসের এইরকম নারী চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্ভবত পাঠককে সচেতন করে দেওয়া যে পুরুষের যৌন আধিপত্যের বিরুদ্ধে নারীর নিজ শরীর, কামনা-বাসনা, যৌনতা এবং প্রজননের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত।

তবে 'অ্যালবাট্রস' উপন্যাসে ঔপন্যাসিককে দুটি অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করতে দেখা যায় –

- প্রথমত, পাঠক গোটা উপন্যাসে যার বয়ানের মাধ্যমে বহুগামিনী পদ্মিনী সম্পর্কে জানতে পারেন, সেই পিউ আসলে পদ্মিনীর দ্বারা এতটাই 'ভার্বালি অ্যাবিউজড' যে সে বর্তমানে মানসিক চিকিৎসাধীন। তার এলোমেলো চিন্তাস্রোত উপন্যাসে একাধিকবার দেখা গেছে। তাই পদ্মিনী সম্পর্কেও সে যা কিছু বলেছে, তার কতখানি সত্য আর কতখানি তার বিকৃত চিন্তার প্রতিফলন, সে-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থেকেই যায়।
- দ্বিতীয়ত, পিউয়ের প্রেমিক ঋত্বিক পদ্মিনী সম্পর্কিত কথাগুলো বিশ্বাস করে না। তার কথায়,

ফ্রাস্ট্রেটেড মহিলা – গল্পগুলো পর্ণোগ্রাফির বই পড়ে পড়ে শিখে রেখেছে। তোমাকে বোকা পেয়ে ঝাড়ছে।[৩৫]

অর্থাৎ, পদ্মিনীর মিথ্যা বলার সম্ভাবনা আছে।

পদ্মিনীর মতো একটি চরিত্র নির্মাণ করে ঔপন্যাসিক নিঃসন্দেহে পাঠককে ভেতর থেকে ধাক্কা দিতে চান। উচ্ছৃঙ্খল পুরুষের ধারণার পাশে উচ্ছৃঙ্খল নারীর ধারণাকে স্থাপন করলেও, এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে ঔপন্যাসিক স্থায়িত্ব দেননি। কারণ, সামাজিক সুস্থিরতাকে যা বিচলিত করে, তা পুরুষ-নারী যে-ই করুক না কেন, তা সর্বদা অসমর্থনীয়। অন্যথায় পাঠকের কাছেও উপন্যাস ও ঔপন্যাসিকের গ্রহণযোগ্যতা হ্রাসের সম্ভাবনা থাকে। তাই পদ্মিনীর মতো মেয়েদের মৃত্যুর পথে নিয়ে যাওয়াকেই স্রষ্টা সহজ সমাধান মনে করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে এভাবে একটি নারীকে কেন্দ্র করে পাঠকের চিন্তার জগতে নাড়াচাড়া ফেলে দেওয়াও নারীবাদেরই অন্যতম লক্ষণ।

১০.৩.১.৪. সমপ্রেমের কাহিনি ও নারীবাদ

শুধুমাত্র নারীর অগ্রগতি, আত্মপ্রতিষ্ঠা বা নারীর প্রতি সহমর্মিতাই নয়, নারীবাদীরা সমকামিতাকে সমর্থন জানিয়েছেন। এই সমর্থনের মূলে যে ভাবনা ক্রিয়াশীল তা হল, সমকামিতা শুধু যৌনক্রিয়া নয়, তা একইসঙ্গে নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য কায়েমের বিরুদ্ধে এক প্রকার প্রতিবাদ।

‘অভিজ্ঞান’ ও ‘বামা-বোধিনী’ উপন্যাসে সমপ্রেম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে এবং তা পারিবারিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

১০.৩.১.৫. গল্প উপন্যাসে নারী ও অর্থনীতি

পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো অর্থনৈতিকভাবে নারীকে পরাধীন করে রাখে। জায়া এবং জননীর ভূমিকাতেই নারীকে আবদ্ধ রাখতে চায় এই সমাজ। এই আদর্শানুযায়ী চলতে গিয়ে তাই স্বাভাবিকভাবেই নারীকে জীবনধারণের জন্য অর্থনৈতিকভাবে নির্ভর করতে হয় পুরুষের ওপর। এভাবে নারী হয়ে পড়ে পুরুষের অধীনস্থ, নির্ভরশীল এবং স্বাধীন ইচ্ছার রূপায়নে অক্ষম।

নবনীতা দেবসেন তাঁর গল্পে উপন্যাসে যেসব নারী চরিত্রের ওপর আলোকপাত করেছেন, তারা কিন্তু প্রায় কেউই ওপরে বিবৃত নারীদের কোঠায় পড়ে না। মোটের ওপর সকলেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা থাকায় তারা প্রত্যেকেই স্বাধীন এবং আত্মবিশ্বাসী, কোনোভাবেই পুরুষের মুখাপেক্ষী নয়।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্থার শিকার হওয়া মেয়েদের সংখ্যা আমাদের সমাজে কম নয়। এরকম দৃষ্টান্ত আমরা নবনীতার 'দ্বিরাগমন' উপন্যাসে পেয়েছি। কাজের সঙ্গে কোনোরকম আপস না-করেও সেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছে এই উপন্যাস।

১০.৩.১.৬. অন্যান্য কয়েকটি গল্প উপন্যাস এবং নারীবাদ

'স্বভূমি' উপন্যাসে আলোর জন্য যেসব বিশেষণ বারবার প্রযুক্ত হয়েছে, সেগুলি এইরকম – "লিবারেটেড ওম্যান", "গ্রেসফুল", "এলিগ্যান্ট", "স্বাধীন মেয়ে", "ক্রেজি গার্ল"। আলো সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে, নিজের প্রচেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ ক'রে ভাইকে নিয়ে বিদেশে পড়তে গেছে নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে। তারপর নিজের সিদ্ধান্তেই পড়া ছেড়ে দিয়ে এক

বিদেশীকে বিয়ে ক'রে ঘোর সংসারী হয়েছে। অনেক বছর পর সে আবার গবেষণা শুরু করেছে।

'প্রোপাইটার' গল্পের শুভমিতা বাবা-মায়ের অমতে ভালোবেসে যাকে বিয়ে করেছিল, একটা সময় পর সে সেই মদ্যপ স্বামীকে ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। প্রাথমিকভাবে সে স্বামীকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং এভাবে নিজেও ভালো থাকার জন্য স্বামীর অফিসের বসের কাছে সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু বহু চেষ্টার পরেও স্বামীকে সুস্থ জীবনে যখন ফেরানো যায়নি, তখন সে নিজে একটা সুস্থ মানুষকে তার জীবনে গ্রহণ করেছে। স্বামীর অফিসের বস্‌কে বিয়ে ক'রে সুখী জীবন লাভ করেছে। সমাজের বক্র দৃষ্টির পরোয়া না-করে শুভমিতা নিজের ভালো থাকাকে গুরুত্ব দিয়েছে, যা আমাদের সমাজের অধিকাংশ মেয়ে করতে ভয় পায়।

'নাট্যারম্ভ' গল্পে কারুবাকী দাশগুপ্ত এবং তার অধ্যাপক মা শমিতা দাশগুপ্তের যে ছবি নির্মাণ করেছেন লেখিকা, তা আবারও নিঃসন্দেহে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ প্রেক্ষাপটে সীমালঙ্ঘনমূলক বৈকি। কারুবাকীর অত্যাধুনিক সাজপোশাক, আচার-আচরণ-চলাফেরা এবং তার মায়ের আধুনিকমনস্কতা, পুরুষহীন সংসারে তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব, কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা – এই সবকিছু প্রচলিত সমাজমানসিকতার বৃত্তের বাইরে চলে যায়।

এভাবে নবনীতার প্রায় সমস্ত গল্প আর উপন্যাস থেকে যথেচ্ছ পরিমাণ নারীবাদের বৈশিষ্ট্যবাহী দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়।

১০.৩.১.৭. আখ্যান মধ্যস্থ সম্ভাব্য বিশ্ব ও বাস্তব বিশ্বের পরিকল্পনায় ধৃত নারীবাদ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে নবনীতার উপন্যাসে কাহিনির অন্তর্গত সম্ভাব্য বিশ্ব ও বাস্তব বিশ্বের উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে আমরা বুঝেছি যে প্রতিটি সম্ভাব্য বিশ্বের অবাস্তবায়ন আসলে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছে। এখন আমরা বিশেষভাবে নজর করব 'ঘূর্ণি' উপন্যাসে।

সম্ভাব্য বিশ্বের ইঙ্গিত →

> আমি জানি, একদিন ওরা ফিরে আসবেই। রিমি অন্তত চিরদিনের মতো চলে যাবার পাত্রী নয়, সবটাই ওর ছটফটানি[৩৬]

এমনটা ঋতবানের বিশ্বাস। কারণ, ঋতবানের স্ত্রী রিমি স্বেচ্ছায় বারবার অন্য পুরুষের সঙ্গে চলে গেলেও প্রতিবার স্বেচ্ছায় স্বামীর কাছে ফিরে আসে। ঋতবানকে সে ভালোবাসে এবং চিরকালের মতো ছাড়ার কথা ভাবতেও পারে না। রিমি শেষবার যখন চলে গেল আদিত্যর সঙ্গে, তখন ঋতবানের বিশ্বাস যদি সত্যি হতো, তাহলে আমরা যে বাস্তব বিশ্ব পেতেম, সেখানে রিমি আবারও ফিরে আসত। কিন্তু ঋতবানের বিশ্বাস সত্যি হয়নি। পরিবর্তে আমরা যে বাস্তব বিশ্ব পেলাম, তা নিম্নরূপ –

বাস্তব বিশ্ব →

আদিত্য তার সংসারে ফিরে আসলেও রিমি আর ফিরল না। সে সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নিয়েছে। ঋতবানকে চিঠিতে সে জানিয়েছে –

> সন্ন্যাসের এটাই ম্যাজিক। আর দেখা হবে না। মেনে নে।[৩৭]

উপন্যাস এখানেই শেষ হয়। আমরা জানি না, ঋতবান মেনে নিতে পেরেছিল কিনা। তবে এটা স্পষ্ট যে রিমি নিজের সিদ্ধান্ত তার স্বামীর ওপরে একরকম চাপিয়ে দিল। অবধারিতভাবে পাঠকের যাবতীয় সহানুভূতির স্থল হয় একজন সমর্থ ও নিরপরাধ পুরুষ অর্থাৎ ঋতবান।

অথচ আমাদের সমাজ সাধারণত এটির বিপরীত ছবি দেখতেই অভ্যস্ত। সহানুভূতি সমবেদনার স্বাভাবিক কেন্দ্রস্থল হয় নিরপরাধ অবলা নারী। কারণ যুগ যুগ ধরে দাম্পত্য সম্পর্কে নারীই পুরুষের দ্বারা প্রতারিত, প্রত্যাখ্যাত, অবহেলিত হয়ে এসেছে। এমন নারীর সংখ্যা এতই বেশি যে এই প্রতারণা, প্রত্যাখ্যান, অবহেলা সমাজে একপ্রকার স্বাভাবিকের জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু 'ঘূর্ণি' উপন্যাসে স্বামীর কোনো অন্যায় না-থাকা সত্ত্বেও দাম্পত্য সম্পর্কে ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্ত্রী। এটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় বিস্ময়কর। প্রথাগত নারীত্বের আদর্শানুযায়ী নির্মিত নারীর আচার-আচরণ, ব্যবহারবিধির ছাঁচকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন 'ঘূর্ণি'-র স্রষ্টা।

১০.৩.১.৮. আখ্যানের নিরীক্ষণ পরিকল্পনায় ধৃত নারীবাদ

নবনীতা দেবসেনের কলমে সৃষ্ট আখ্যানে আমরা কখনোই একচেটিয়া সর্বজ্ঞকথন পাইনি। যা পেয়েছি, তা হয় ভূমিকানুগ কথন, নাহলে আত্মকথন, অথবা মিশ্রকথন। ফলে বহিস্থ-কথকের নিরীক্ষণ ব্যতিরেকেও প্রবলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের নিরীক্ষণ। স্বাভাবিকভাবেই, কোনো একট নির্দিষ্ট নিরীক্ষণ-লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে কখনো কখনো ধরা দিয়েছে একই আখ্যানের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের নিরীক্ষণের পার্থক্য, যা চরিত্রগুলির পৃথক পৃথক মূল্যবোধকে ফুটিয়ে তুলেছে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে 'অ্যালবাট্রস' উপন্যাস থেকে।

'অ্যালবাট্রস' উপন্যাসে পদ্মিনী সিং-এর জীবনযাপনের শৈলী যখন নিরীক্ষণের লক্ষ্য, তখন তার নিরীক্ষক মিস্ ব্যানার্জি এবং নিরীক্ষক পদ্মিনীর দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা পড়েছে বিপুল পার্থক্য।

মিস্ ব্যানার্জির নিরীক্ষণ –

> ... পদ্মিনীমাসিকে তো মাঠেঘাটে-হাটেবাজারে, ট্রামেবাসে-ট্রেনে-প্লেনে সর্বত্র সক্কলেই যথেষ্ট abuse করেছে, করে চলেছে[৩৮]

পদ্মিনীর নিরীক্ষণ –

> নো বডি ঔনস মাই বডি অর সোল, আমি দেহে মনে স্বাধীন – দ্য ওয়ে মেন হ্যাভ বীন, দ্য ওয়ে মেন আর,... অ্যান্ড আই লাইক টু ইউজ মেন ফর মাই ঔন প্লেজার – যেটা পুরুষরা মেয়েদের নিয়েই সহস্র বছর ধরেই করে আসছে। যেটা মেয়েরা করলেই সমাজের মাথায় বজ্রপাত হয়।[৩৯]

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়ে না যে নারীপুরুষের শারীরিক সম্পর্কের বিষয়ে উভয় চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তাদের মূল্যবোধের পার্থক্যকেও সুনিশ্চিত করে। কিন্তু তারপর যেটি সবচেয়ে বেশি লক্ষ করার, তা হল এই যে, দুই ভিন্ন মূল্যবোধের কোনোটিকে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করা হয়নি। দুটিকে কেবল পাঠকের সামনে হাজির করা হয়েছে। ফলে উভয় মূল্যবোধের প্রতি যে এক ধরনের সমদর্শিতা তৈরি হয়, তা কার্যত নারীবাদের বৈশিষ্ট্যকেই ইঙ্গিত করে [দ্র. চিত্র ২১]।

চরিত্র ‘ক’-এর নিরীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত মূল্যবোধ

চরিত্র ‘খ’-এর নিরীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত মূল্যবোধ

} কোনোরকম মূল্যায়ণ না-করার ফলে প্রাপ্ত ভাবাদর্শ

চিত্র ২১: নিরীক্ষণ-পরিকল্পনা থেকে প্রাপ্ত ভাবাদর্শ

ঔপন্যাসিক আখ্যানে তাঁর নিরীক্ষণ-পরিকল্পনার দ্বারা খুব সূক্ষ্মভাবে নারীবাদের প্রভাবপুষ্ট জীবনাদর্শকে চালনা করতে চেয়েছেন পাঠকের মধ্যে।

১০.৩.২. বহুসংস্কৃতিবাদের প্রভাবপুষ্ট জীবনাদর্শ প্রকাশক শৈলী অনুসন্ধান

নবনীতার কলমে বহুসংস্কৃতিবাদ ঠিক নারীবাদের মতো তীব্র আকার না-নিলেও এর উপস্থিতি বেশ সহজলভ্য। একাধিক সংস্কৃতির পারস্পরিক সহাবস্থানের প্রতি লেখিকার এক ধরনের সমর্থন আছে, তা বোঝা যায়। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসেই ধরা দেয় ভারতীয় অভিবাসী জীবনের ছোট বড় টুকরো ছবি। সেই সূত্রেই আসে বিদেশের প্রকৃতি, ঘরোয়া পরিবেশ, সেখানকার সংস্কৃতির ছোঁয়া এবং অবশ্যই চরিত্রের মুখের ভাষায় অহরহ 'কোড' সরণ। এসবের পাশাপাশিই আসে ওইসব অভিবাসী মানুষের ভারতীয় শিকড়ের প্রতি অমোঘ টান এবং ভারতীয়ত্বকে (ethnicity) লালন করে চলার অভিপ্রায়। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে নবনীতা দেবসেনের সাহিত্যকে মোটেই বহুসংস্কৃতিবাদের প্রতিনিধি স্থানীয় বলা যায় না। বহুসংস্কৃতিবাদের আদর্শকে এইসব লেখা বরং খানিক আলগোছে বহন করে।

১০.৩.২.১. 'স্বভূমি' উপন্যাসে বহুসংস্কৃতিবাদ

বহুসংস্কৃতিবাদ এই উপন্যাসে খুব বেশি করে ধরা আছে। বাঙালি মেয়ে আলো আমেরিকায় পড়াশোনা করে এক বিদেশীকে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। তার টোরোন্টোর সংসারে মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে মা-বাবা আসেন বেড়াতে। আমেরিকায় আলো একদিকে যেমন সুইমিং কস্টিউম (তার মায়ের কথায় "দু'টুকরো ন্যাকড়া") প'রে সুইমিং করে, নানারকম পার্টিতে যায়, নিজেরা পার্টি দেয়, বাড়িতে বিচিত্র সব পাশ্চাত্য সাজসরঞ্জাম, ইলেক্ট্রিক যন্ত্রপাতি – এককথায় আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনশৈলীতে অভ্যস্ত, তেমনি অন্যদিকে এই আলোর বাড়িতেই রয়েছে মস্ত আয়োজনের ঠাকুরঘর। সেখানে সে নানা দেবতার নিত্যপূজা করে। এই আলোই জীবনের দীর্ঘ

সময় আমেরিকায় থেকেও ভারতীয় ঠিকুজি-কুষ্টির সংস্কৃতিকে বহন ক'রে চলে। এভাবেই তৈরি হয় সংস্কৃতিগত সন্নিধানের একেকটি মুহূর্ত।

উপন্যাসে বহুসংস্কৃতিবাদের দু'ধরনের প্রবণতা চোখে পড়ে –

প্রথমত, বিদেশে সংসার করলেও বাঙালি সংস্কৃতি তথা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অমোঘ টান অনুভব করে আলো। সে তার নিজের সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে চায় এবং তার আগামী প্রজন্মের মধ্যেও সঞ্চারিত করে দিতে চায়। এর পাশাপাশি অভিবাসী বাঙালির নতুন প্রজন্মের মধ্যে কখনো কখনো ভারতীয় সংস্কৃতি বহনে অনিচ্ছাও দেখা যায়। এই সবকিছুরই দুয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হল –

আলো পঁচিশ বছর ক্যানাডার অধিবাসী। তার পরিবারে সে ভারতীয়, তার স্বামী লুইজিয়ানার এবং তাদের মেয়ে ক্যানাডিয়ান পাসপোর্টধারী। অর্থাৎ, তারা একই পরিবারের তিন সদস্য তিন দেশের সংস্কৃতির বাহক। আলোর সদ্য কিশোর বয়স পেরনো মেয়ে লালী নিকলসনের কথায়,

> মা'র সঙ্গে তো এই নিয়েই আমার ঝগড়া। বাংলা বলতে হবে, শাড়িও পরতে হবে, কলকাতাকে ভালোবাসতেই হবে – এ কী জুলুম? এ যে অত্যাচার! [৪০]

আমরা এর পরের দৃষ্টান্তে লালীর ভাষিক চয়ন বিশেষভাবে খেয়াল করব –

> মা'র 'ঠাকুরঘর' একটা ফ্যানটাস্টিক ব্যাপার। ট্র্যাডিশনাল রুটস খুঁজতে হলে ওখানে যেতে হয়। ও বাবা! সে একটা – দারুণ জিনিস। মা যদিও ওটাকে মেডিটেশন রুম বলতেই ভালবাসে, কিন্তু তাতে ছোট্ট ছোট্ট সব সুইট গডস অ্যান্ড গডেসেস আছে, খেলনা পুতুলের মতো তাদের থালা বাটিও আছে। মা তাদের জল দেয়, সুগার কিউব দেয়। তারা খায় না কোনওদিনই। ছোটবেলায় আমিই গিয়ে খেয়ে নিতাম।[৪১]

'গডস' আর 'গডেসেস'-এর সঙ্গে যখন 'সুইট' শব্দটা জুড়ে যায়, তখন আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে লালী আসলে ভারতীয় দেবদেবীর সংস্কৃতিকে দেখছে এবং ভাবছে এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাইরের একটা নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে। দেবদেবীর প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি-

প্রীতির রীতিতে আজন্ম অভ্যস্ত কোনও ভারতীয় 'সুইট'-এর মতো এমন হালকা মেজাজের আদুরে শব্দ দেবদেবীর প্রসঙ্গে সাধারণত ব্যবহার করে না। প্রসঙ্গত আরও একটি বিষয় লক্ষ্যনীয়। কিশোরকাল উত্তীর্ণ একটি মেয়ের ভাবনায় যখন এমন স্পষ্টভাবে ধরা দেয় যে 'গডস' আর 'গডেসেস' কোনওদিনই খায় না, তখন আবারও বোঝা যায় যে মেয়েটি হিন্দুধর্মের আচারকে দেখছে নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে। কারণ, হিন্দুধর্মের আচার-ব্যবহারের সংস্কৃতির আবেষ্টনে থাকা ছেলেমেয়েদের খুব ছোট বয়সেই দেবদেবীর এই না-খাওয়ার বিষয়টি মনে গেথে যায় এবং এটি আর তাদের কাছে একটুও বিস্ময়ের মনে হয় না।

আলোর স্বামী ক্রিশ্চান। তাই তার বাড়িতে ঠাকুরঘর যেমন আছে, তেমনি সে চার্চেও যায়, খ্রিসমাসের উৎসব পালন করে। অন্যদিকে তার স্বামী ফ্রেডরিক প্রতিদিন তাকে একগুচ্ছ ফুল এনে বলে, "ফর ইয়োর ব্লেসেড ঠাকুরস"।

আলো-ফ্রেডরিক স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে ইংরেজির পাশাপাশি আসে বাংলাও। আলো বিদেশে বাস করেও ভাষার শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়নি। মেয়ের ছোটবেলায় বাংলায় ঘুমপাড়ানি গান শোনাত। ফ্রেডরিকের ভাষায়, আলো "আজেবাজে হিন্দি ছবি" দেখে, "যাচ্ছেতাই সব সোপ-অপেরার সিরিয়াল" দেখে।

আলো তার ভাইপো জয়, যার জন্ম মার্কিন দেশে, তাকে বোঝায় –

> যতই এদেশে থাকো, তোমার বাবা-মা ইন্ডিয়ান, ইন্ডিয়াতেই তোমার রুট্‌স – এতদিন এ দেশে থাকার পরেও দেখছ না, মার্কিন কালোরা তাদের শেকড় খুঁজছে আফ্রিকায়? আর নির্বোধ তোমরা ইচ্ছে করে তোমাদের চমৎকার শেকড় উপড়ে ফেলবে? ... তুমি যদি থার্ড ওয়ার্ল্ডের সেবা করতে চাও তাহলে গো টু দ্য কান্ট্রি দ্যাট ফ্লোজ ইন ইয়োর ভেইন্স –"[৪২]

দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতির সহাবস্থান থেকে স্বাভাবিকভাবেই উভয়ের একটা তুলনা চলতে থাকে। বিশেষত আলোর মায়ের কথায় বারবার উঠে এসেছে

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে দুই সংস্কৃতির ভালো ও মন্দের দিক, তা কখনো খাদ্যাভ্যাসে, পোশাক-পরিচ্ছদে, কখনো গৃহস্থালির নানাবিধ সরঞ্জাম ব্যবহারে, আবার কখনো নানারকম উৎসব-অনুষ্ঠানের হালহকিকতে। এছাড়া ফ্রেডরিকের কথায় আসে লুইজিয়ানার রেসিজমের সঙ্গে ভারতীয় কাস্টইজমের তুলনা।

১০.৩.২.২. 'ঘূর্ণি' উপন্যাসে বহুসংস্কৃতিবাদ

- আদি জীবনানন্দ আবৃত্তি করলে টুকাই, ইংরিজি স্কুলের টুকাই, পরের পংক্তি থেকে যোগ দিত বাপের সঙ্গে।[৪৪]

এটি ভাস্বতীর ছেলে ও স্বামী সম্পর্কিত ভাবনার অন্তর্গত একটি বাক্য। বাক্যটি উচ্চারণ ক'রে পড়তে গেলেই আমরা বুঝতে পারি, বাক্যের অন্তর্গত 'ইংরিজি' শব্দটির প্রথমে একটা ঝোঁক (stress) পড়বে। এই অতিরিক্ত ঝোঁক থেকে স্পষ্ট হয়, ইংরেজি স্কুলে পড়া ছাত্রের মুখে জীবনানন্দের কবিতা আবৃত্তি যেন স্বাভাবিকভাবেই অপ্রত্যাশিত। তবু ভাস্বতীর স্বামী আদিত্য তার ছেলের মধ্যে এই অভ্যাস তৈরি করে দিয়েছে। ইংরেজি স্কুলে পড়াশোনা করা প্রজন্মের মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতির ধারাকে সঞ্চালিত করে দেওয়ার প্রবণতার মধ্যে ঔপন্যাসিকের সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায়, যা আসলে সংস্কৃতির শিকড়কে অটুট রাখার বার্তা দেয়।

- দক্ষিণ আফ্রিকার কফিটা সত্যি ভালো। আর চা-টা তেমনই বিশ্রী। রুবিকস বলে একরকমের নিজস্ব উৎপাদন, লালরং-এর শরবতের মতো চা নিয়ে এরা যদিও খুবই গর্বিত।[৪৫]

'বিশ্রী' এবং 'শরবতের মতো চা নিয়ে এরা যদিও খুবই গর্বিত' কথা দুটির মধ্যে ধরা পড়ে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী চা সংস্কৃতির উৎকর্ষজনিত কিঞ্চিৎ অহংকারের মনোভঙ্গি।

১০.৩.২.৩. 'অ্যালবাট্রস' উপন্যাসে বহুসংস্কৃতির আধারে নারীবাদী চিন্তার প্রতিফলন

নারীবাদের বিশিষ্ট প্রবক্তা সিমোন দ্য বোভয়ার ভাষায়,

> One is born but rather becomes a woman.[৪৫]

নারীকে মানুষ হিসেবে নয়, পুরুষের সঙ্গী হিসেবেই বিবেচনা করে যেকোনো পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। দেশভেদে, সংস্কৃতিভেদে তার প্রকাশটাই কেবল ভিন্নতর। 'অ্যালবাট্রস' উপন্যাসের উদ্ধৃতি তারই সাক্ষ্যবাহী –

> ওদিকে সতীপুজো, সতীব্রত, সতীমন্দির হচ্ছে রাজস্থানে – আর এদিকে ... সাহেব বর ভারি দুঃখ পাবে স্ত্রী যদি ভার্জিন হয়? ভাববে, মেয়েটা নিশ্চয়ই খুব আনঅ্যাট্রাকটিভ, তাই এতকাল কোনও পুরুষ মানুষ তাকে চায়নি।[৪৬]

১০.৩.২.৪. 'ফিনিক্স' উপন্যাসে বহুসংস্কৃতিবাদ

বিপাশা অ্যান্ডারসন এবং তার মেয়ে রোহিণী বেটিনা অ্যান্ডারসন – উপন্যাসের প্রধান দুই চরিত্রের নামের মধ্যেই মিশে আছে বহুসংস্কৃতিবাদের ছোঁয়া। জর্জ অ্যান্ডারসনকে বিয়ের পর বিপাশা চৌধুরি পরিচিত হয় বিপাশা অ্যান্ডারসন নামে। বিপাশা আর জর্জের মেয়ের নামকরণে দুই দেশের ঐতিহ্যই প্রতীয়মান। 'রোহিণী' ভারতীয় নামের স্মারক এবং মধ্যনাম 'বেটিনা' হল জর্জের মায়ের নাম; ইংল্যান্ডের পারিবারিক ঐতিহ্য মেনে ঠাকুরমার নাম নাতনীর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তারপর আছে বাবার পদবী অ্যান্ডারসন। বাঙালি মা এবং ইংরেজ বাবার মিশ্র ঐতিহ্যের ধারা বহন করেছে রোহিণী। উপন্যাসে তার কার্যকলাপেও তা স্পষ্ট। রোহিণী একজন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ফিল্‌ম মেকার।

ইংল্যান্ডের শিল্পীসমাজের একাংশের জীবনযাপনের 'এক্সপেরিমেন্টাল' ভঙ্গি উঠে এসেছে কিছু বর্ণনাধর্মী চিত্রকল্পে। ভারতীয় মেয়ে বিপাশার সেই পরিবেশে মানসিকভাবে মানিয়ে নিতে না-পারার মধ্যে ধরা দেয় প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক মননগত প্রভেদ।

১০.৩.২.৫. 'শনি-রবি' উপন্যাসে বহুসংস্কৃতিবাদ

এই উপন্যাসে পাওয়া গেছে খাদ্যসংস্কৃতিতে আদান-প্রদানের কথা। কলকাতায় যেমন এসেছে বিদেশি জাংকফুড, তেমনি টেক্সাসে গেছে এদেশের সিঙাড়া বা সামোসা।

বাঙালি ছেলের বিদেশী স্ত্রীকে যেমন ন'য়ের দশকের কলকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারে জিন্‌স-টিশার্ট পরে আসতে দেখা গেছে, তেমনি কলকাতায় পা রাখার পর তাদের দুটি ছোট ছোট শ্বেতাঙ্গ ছেলেমেয়ের পরনে দেখা যায় কাঁথার কাজ করা পাঞ্জাবী, যোধপুরী পাজামা আর এমব্রয়ডারি করা সিল্কের সালোয়ার কুর্তা।

দুবাই, টেক্সাস এবং কলকাতায় গৃহকর্মে সাহায্যকারী কাজের লোকের রকমফের নিয়ে একটা তুলনামূলক আলোচনা এই উপন্যাসে অভিনবত্ব তৈরি করেছে।

১০.৩.২.৬. বিভিন্ন গল্পে বহুসংস্কৃতিবাদ

'মূল-রামায়ণ' গল্পে হনুমান লঙ্কায় পৌঁছে যা যা দেখেছে, সেই বর্ণনা রামায়ণের অনুসারীই হয়েছে। তবে শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে নবনীতা রামায়ণে বর্ণিত প্রাচীন ভারতীয় অনার্য সংস্কৃতিকে আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্বাদ পাওয়া মানুষের চোখ দিয়ে দেখিয়েছেন। যেমন –

i. রাবণের পুষ্পক রথকে বলা হয়েছে 'মাল্টিস্টোরিড বিমান'।
ii. রাবণের প্রাসাদের অভ্যন্তরে এনেছেন আধুনিক কালের 'ডাইনিং হল'।
iii. নগরীর ঘরবাড়ির বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন 'এলিভেশন', 'আর্কিটেকচারাল এক্সেলেন্স' জাতীয় শব্দবন্ধ।

এইসব বিদেশী শব্দের দ্বারা যে ছবি ফুটে ওঠে, তা সুপ্রাচীন লঙ্কা নগরীর আধুনিকীকরণ ঘটিয়েছে নিঃসন্দেহে। আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র স্রষ্টার মতোই

নবনীতাও রাম অপেক্ষা রাবণ পক্ষের ঐশ্বর্য ও বীরত্বে মুগ্ধ। এইসব শব্দ প্রয়োগের মধ্যে কার্যত মিশে আছে চিরাচরিত ভাবনার সীমাকে অতিক্রম করে যাওয়া। এইসব শব্দব্যবহার আসলে লেখিকার প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক সংস্কৃতিকে মিলিয়ে দেখার প্রবণতাকে চিহ্নিত করে।

'ডক্টর দেবসেনের বিদেশযাত্রা', 'অপারেশন ম্যাটারহর্ন', 'হাওয়া-ই-হিন্দ', 'সেদিন দুজনে', 'দেশে যাওয়া', 'কায়াক', 'জোবান সুজিকি' প্রভৃতি গল্পে নানাভাবে এসেছে বিদেশের প্রসঙ্গ, কখনো আবার দেশী-বিদেশী সংস্কৃতির তুলনা। কোনও কোনও গল্পের আবার আদ্যন্ত পটভূমিটাই হয়েছে বিদেশ। ফলে সেসব কাহিনিতে যে বিদেশী সংস্কৃতির রমরমা, তা বলাই বাহুল্য।

প্রাদেশিক ও বিদেশী শব্দ ব্যবহার

প্রধানত হিন্দি এবং ওড়িয়া ভাষা শোনা যায় কাহিনির অন্তর্গত বাড়ির কাজের লোকের মুখে। চাকর, পাহারাদার শ্রেণির মানুষেরা অন্য প্রতিবেশী রাজ্য থেকে কলকাতা শহরে আসে জীবিকার সন্ধানে। তাদের মুখের হিন্দি কিংবা ওড়িয়ামিশ্রিত বাংলা ভাষার উচ্চারণশৈলীতে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে মনিবের প্রতি সদা আনুগত্য আর একান্ত বিশ্বস্ততার অলিখিত প্রতিশ্রুতি। নবনীতার বেশ কতকগুলি গল্পে গুনিয়াভাই এরকমই একটি চরিত্র।

নবনীতার গল্প উপন্যাসের বেশিরভাগ চরিত্র উচ্চশিক্ষিত। তাই বাস্তবসম্মতভাবেই তাদের মুখের ভাষায় বাংলার পাশাপাশি যখন-তখন ইংরেজির ব্যবহার চোখে পড়ে। বাঙালির মুখে অহরহ কোড-সরণ যেন তাদের শিক্ষিত শ্রেণিকে আরও বেশি করে চিহ্নিত করে।

১০.৩.৩. সমস্ত গ্লানি, তুচ্ছতা, অচরিতার্থতাকে সরিয়ে নবোদ্যমে বাঁচতে শেখার জীবনাদর্শ প্রকাশক শৈলী

এই জীবনাদর্শের রহস্য ধরা আছে মূলত বিভিন্ন কাহিনির সম্ভাব্য বিশ্ব এবং কাহিনির বাস্তব বিশ্বের পারস্পরিক সংস্থানের শৈলীতে। সন্দর্ভের অষ্টম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, একেকটি উপন্যাসে এক বা একাধিক সম্ভাব্য বিশ্বকে বাস্তবায়িত হতে না-দিয়ে শেষ পর্যন্ত যে বাস্তব বিশ্বকে উপস্থাপিত করা হয়েছে, সেখানে চরিত্রের অভিযোজন ঘটেছে। সম্ভাব্য বিশ্বকে পিছনে ফেলে আসন্ন বাস্তব বিশ্বের পথে পা বাড়ানোর মধ্যেই সন্তর্পণে লুকিয়ে আছে জীবনের সমস্ত গ্লানি, তুচ্ছতা কিংবা অচরিতার্থতাকে মন থেকে সরিয়ে ফেলে নব উদ্যমে বাঁচতে শেখার জীবনাদর্শ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'সীতা থেকে শুরু'-র 'পৌরাণিকী' পর্বের একটি সম্ভাব্য বিশ্ব অষ্টম অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে (দ্র. ৮.৪), যেখানে কাহিনির বাস্তব বিশ্বে প্রাপ্ত সীতা চরিত্রের কোনো অভিযোজন দেখা যায়নি। কারণ, নবনীতা রামায়ণের মূল কাহিনিকে অক্ষুণ্ণ রেখেই বিকল্প সম্ভাবনার রঙ ধরাতে চেয়েছেন। কিন্তু এখানে একটি বিষয় খেয়াল করা প্রয়োজন। 'সীতা থেকে শুরু' নামকরণের মধ্যেই রয়েছে এগিয়ে চলার অনুষঙ্গ। এই এগিয়ে চলার উৎসবিন্দুতে রয়েছে সীতার যুগ আর লক্ষ্যবিন্দুতে আছে বর্তমানের আধুনিক যুগ। তাই তো 'সীতা থেকে শুরু'-র প্রথম পর্বের নাম 'পৌরাণিকী' এবং তৃতীয় তথা অন্তিম পর্বের নাম 'আধুনিকী'। এদুয়ের মাঝে আছে 'মাতৃয়ার্কি' পর্ব, যাকে বলা যায় একেবারে হাল আমলের আধুনিকতা থেকে কিছুটা পুরনো কালের প্রতিনিধিত্ব করছে। সময় যত এগিয়েছে, পুরুষের মুখাপেক্ষী না থেকে নারী ক্রমশ স্বনির্ভর, স্বাধীন হয়েছে। 'পৌরাণিকী' পর্বে শূর্পণখার ভাইকে বিয়ে করে সীতার সুখে থাকার সম্ভাব্য বিশ্ব বাস্তবায়িত হয়নি। সেখানে স্বামীর অসততাকে চিনতে পেরেও সীতা সেই স্বামীকে ছেড়ে স্বাধীন সুখী জীবন যাপন করার কথা ভাবতেই পারেনি। কিন্তু

‘আধুনিকী’ পর্বে এসে উক্ত সম্ভাব্য বিশ্বের এক প্রকার বাস্তবায়ন দেখা যায় ‘প্রোপাইটার’ গল্পে। এই গল্পে শুভমিতা ভালোভাবে নিজের জীবন ধারণ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। মদ্যপ স্বামীর নিত্য অত্যাচারের ঘেরাটোপ থেকে সে নিজেকে মুক্ত করেছে এবং সম্পূর্ণ নিজের সিদ্ধান্তে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে নিজের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে।

সুতরাং, আপাতভাবে ‘সীতা থেকে শুরু’-র কোনো একটি চরিত্রের (সীতার) অভিযোজন হয়নি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ‘সীতা থেকে শুরু’-র তিনটি পর্বকে একত্রে চিন্তা করলে, ‘নারী’ হয়ে ওঠে একটি চরিত্র, তিনটি পর্ব জুড়ে যার ক্রম-বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ‘সীতা থেকে শুরু’ নামকরণে আভাসিত যাত্রাপথের সূচনাবিন্দুতে যদি থাকে পুরুষের অন্যায়কে মেনে নিয়ে সংসারে নারীর টিঁকে থাকা, তবে সেই নারী নানা ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে অভিযোজনের মধ্য দিয়ে যাত্রাপথের শেষ বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছায়, যেখানে আছে আদর্শহীন পুরুষের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন করে নিজের শর্তে বেঁচে থাকা। সংসারে টিঁকে থাকা আর বেঁচে থাকার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। এর ফলে আবারও প্রতিফলিত হয়েছে নবোদ্যমে বাঁচতে শেখার জীবনাদর্শ। আর এসবের মধ্যে নারীবাদের ভাবাদর্শ যে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশে আছে, তা তো বলাই বাহুল্য।

১০.৩.৪. সন্দর্ভের অন্যান্য অধ্যায়ে বিশ্লেষিত বিবিধ শৈলীগত বৈশিষ্ট্যে জীবনাদর্শের প্রতিফলন

বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত জীবনাদর্শ নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়াও পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিশ্লেষিত বিভিন্ন শৈলীগত বৈশিষ্ট্যও প্রায়শই ওপরে বর্ণিত তিনটি জীবনাদর্শের কোনো-না-কোনো জীবনাদর্শকে ইঙ্গিত করেছে।

প্রতিটি আখ্যানে কথকের বাক ব্যবহারে কিংবা চরিত্রের সংলাপ ও চিন্তার প্রকাশে ধরা দিয়েছে বিবিধ চিত্রকল্প, কখনো আন্তর্বয়ান, আবার কখনো বিচ্যুতি ও সমান্তরতার মতো

বৈশিষ্ট্য। এইসব বৈশিষ্ট্য নিঃসন্দেহে চরিত্রায়ণে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। এভাবে একেকটি চরিত্রের আলোকে কখনো কখনো প্রতিফলিত হয়েছে একেকটি ভাবাদর্শ। এপ্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় –

চিত্রকল্পের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণকালে যখন আমরা চিত্রকল্পের মাধ্যমে চিরাচরিত সীমার লঙ্ঘন, পুরুষতান্ত্রিক অবদমন এবং নারীর অস্তিত্ব-সমস্যার ধারণার প্রকাশ দেখেছি, তখন বিভিন্ন চরিত্রের নির্মাণ কিংবা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে চিত্রকল্পগুলি বারবার নারীবাদী ভাবাদর্শ দ্বারা জারিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক সন্নিধান প্রকাশক চিত্রকল্প বহুসংস্কৃতিবাদের প্রতিনিধিত্ব করে। প্রজন্মগত ব্যবধান প্রকাশক চিত্রকল্পে আসলে ধরা পড়েছে নবীনের কার্যকলাপের প্রতি প্রবীনের নিরীক্ষণ। সেই নিরীক্ষণে আপাতভাবে মিশে থাকে নিজেদের প্রজন্মকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের ইচ্ছা। কিন্তু তারপর নবীন-প্রবীনের আপাত দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে নবীনকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলার যে মনোভঙ্গি, তা যেন প্রকারান্তরে বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত তৃতীয় জীবনাদর্শের সূচক।

আন্তর্বয়ান বিশ্লেষণকালে আমরা 'ফিনিক্স' উপন্যাসে যে ধরনের আন্তর্বয়ানের দেখা পেয়েছি, তা একজন নারীর জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোকে স্পষ্ট করে। 'জরা হট্‌কে জরা বঁচ্‌কে ইয়ে হ্যায় নোবেল, মেরি জান্!' গল্পে উপস্থিত বিভিন্ন আন্তর্বয়ান দেখায়, নারীর নিজস্ব কীর্তি, প্রতিভা, প্রতিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে সমাজ তাকে তার স্বামীর পরিচয়ে চিনতে চায়, এমনকি সেই স্বামী যদি প্রাক্তন হয় তাহলেও। 'বামুন-মুচি-রাজা' গল্পের আন্তর্বয়ান কিন্তু প্রাধান্য দেয় বর্তমান অধ্যায়ে উল্লিখিত তৃতীয় জীবনাদর্শটিকে। এগুলি কয়েকটি নিদর্শন মাত্র। আন্তর্চারিত্রিকতাও নানাভাবে জীবনাদর্শের দ্যোতক হয়েছে।

বিচ্যুতি ও সমান্তরতার বিশ্লেষণ থেকে কেবল 'বামা-বোধিনী'র দৃষ্টান্ত স্মরণ করাই যথেষ্ট বলে মনে হয়। এই উপন্যাস থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন ধরনের বিচ্যুতি ও সমান্তরতা যৌথভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে নারীবাদকে।

আদিকাব্যের চরিত্রদের বিপরিচিতিকরণ এবং রূপান্তরকামী পুরুষকে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ক'রে পাঠকের সংশ্লিষ্ট সংবর্গীয় ধারণাকে ওলটপালট করে দেওয়ার মধ্যে ধরা আছে লেখিকার নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এছাড়া, আরও অনেক জায়গাতেই ভাবাদর্শের উপস্থিতি টের পাওয়া গেছে। কিছু কিছু সংশ্লিষ্ট শৈলী আলোচনাকালে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে একথা তো অবশ্যস্বীকার্য যে, শৈলীগত সমস্ত বৈশিষ্ট্য জীবনাদর্শকে ধারণ করে না। স্বাভাবিকভাবেই, নবনীতার লেখাতেও এমন অনেকানেক লিখনবৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা হয়তো সরাসরি কোনো জীবনাদর্শের প্রতিনিধিত্ব না-করে গল্প ও উপন্যাসকে শিল্পগুণসম্পন্ন করে তোলায় কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। যেমন – নবনীতার সাহিত্যে পাওয়া অধিকাংশ কৌতুকময় চিত্রকল্প, অধিকাংশ ঋণাত্মক আন্তর্বয়ান প্রভৃতি।

১০.৪. উপসংহার

কোনও সাহিত্যিক নিদর্শনকে যেমন কেবলমাত্র জীবনাদর্শের আবরণের নিচে রেখে বিশ্লেষণ করলে তার প্রতি সুবিচার করা হয় না, তেমনি জীবনাদর্শের সুস্পষ্ট প্রতিফলনকে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়াও কাঙ্ক্ষিত নয়। তাই সন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে যেসব শৈলীগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতেই স্বতন্ত্রভাবে জীবনাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে, এমনটা নয়। অনেকসময় দেখা গেছে, শৈলীগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশক কোনো-কোনো দৃষ্টান্ত উক্ত তিন ধরনের

জীবনাদর্শের কোনোটিকেই প্রকাশ করেনি। আবার এমনটাও দেখা গেছে যে একই শৈলীগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশক কয়েকটি দৃষ্টান্ত স্বতন্ত্রভাবে না-হলেও সম্মিলিতভাবে জীবনাদর্শের প্রতিফলক হয়েছে। যেমন – 'নাট্যারম্ভ' গল্পের কৌতুকময় চিত্রকল্পের দৃষ্টান্তগুলি একত্রে নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নির্দেশ করে।

আমাদের মনে হতে পারে, নবনীতা দেবসেনের লেখায় কেন উক্ত তিন প্রকার জীবনাদর্শই প্রকট হল। এর সম্ভাব্য কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে আমরা স্মরণ করতে পারি সন্দর্ভের প্রথম দিকের 'নবনীতা দেবসেনের জীবন ও সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা' শীর্ষক লেখক-পরিচিতি জ্ঞাপক অধ্যায়ের কিছু তথ্য। নবনীতা দেবসেনের দীর্ঘ জীবনের নানা অভিজ্ঞতাই উক্ত তিন প্রকার ভাবাদর্শের সৃজক। নারীবাদী চিন্তাধারা যেমন তাঁর কর্মজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, তেমনি তাঁর পারিবারিক জীবনের সাপেক্ষেও যথেষ্ট প্রভাবশালী। বহুসংস্কৃতিবাদ নবনীতার সাহিত্যে স্বচ্ছন্দে ডালাপালা বিস্তার করতে পেরেছে তাঁর জীবনের অনেকখানি পর্ব বিদেশে অতিবাহিত হওয়ার সুবাদে। তৃতীয় যে ভাবাদর্শ উল্লিখিত, তা আসলে রবীন্দ্রনাথ কথিত 'ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যরে লও সহজে' – এই বাণীরই সমার্থক। জীবনের চড়াই-উতরাই, ঘাত-প্রতিঘাতের মুহূর্তে নবনীতা মন্ত্রজ্ঞান ক'রে আঁকড়ে ধরেছিলেন এই বাণী। স্বভাবতই তা তাঁর সৃষ্টির মধ্যেও অবিরত অনুরণিত হতে থাকে বিচিত্র শৈলীর আশ্রয়ে।

১০.৫. তথ্যসূত্র

১। Brian Paltridge, *Discourse Aanalysis: An Introduction*, 2nd ed. (London: Bloomsbury, 2012), 29.

২। *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, 9th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2015), s.v. "ideology".

৩। Terry Eagleton, *Ideology: An Introduction* (London and New York: Verso, 1991), 1-2.

৪। Louis Althusser, *For Marx*, trans. Ben Brewster (London: The Penguin Press, 1969), 233-234.

৫। Terry Eagleton, "Ideology, Fiction, Narrative," *Social Text*, no. 2 (Summer 1979): 63, https://doi.org/10.2307/466398.

৬। Teun A. van Dijk, *Ideology and Discourse: A Multidisciplinary Introduction*, 8, https://www.discourses.org/wp-content/uploads/2022/06/Teun-A.-van-Dijk-2012-Ideology-And-Discourse.pdf.

৭। Paltridge, *Discourse Aanalysis*, 30.

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "বোঝাপড়া," *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ (কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ), ১৮৩।

৯। নবনীতা দেবসেন, *ফিনিক্স*, ২য় সংস্করণ (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৫), ১১।

১০। দেবসেন, *ফিনিক্স*, ১১।

১১। দেবসেন, *ফিনিক্স*, ১২।

১২। দেবসেন, *ফিনিক্স*, ১২।

১৩। দেবসেন, *ফিনিক্স*, ১৪।

১৪। দেবসেন, *ফিনিক্স*, ১৯।

১৫। দেবসেন, *ফিনিক্স*, ২৯।

১৬। নবনীতা দেবসেন, *ঘূর্ণি* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৮), ১৩।

১৭। দেবসেন, *ঘূর্ণি*, ১৩।

১৮। দেবসেন, *ঘূর্ণি*, ১৪।

১৯। দেবসেন, *ঘূর্ণি*, ৩৩।

২০। দেবসেন, *ঘূর্ণি*, ১৬।

২১। দেবসেন, *ঘূর্ণি*, ১৭।

২২। দেবসেন, *ঘূর্ণি*, ১৭।

২৩। দেবসেন, *ঘূর্ণি*, ১৭।

২৪। দেবসেন, *ঘূর্ণি*, ২৭।

২৫। দেবসেন, *ঘূর্ণি*, ২৭।

২৬। দেবসেন, *ঘূর্ণি*, ৩২।

২৭। দেবসেন, *ঘূর্ণি*, ১৭-১৮।

২৮। দেবসেন, *ঘূর্ণি*, ২২।

২৯। দেবসেন, *ঘূর্ণি*, ২৩।

৩০। দেবসেন, *ঘূর্ণি*, ২৬।

৩১। দেবসেন, *ঘূর্ণি*, ২৫।

৩২। দেবসেন, *ঘূর্ণি,* ৩৫।

৩৩। নবনীতা দেবসেন, *অ্যালবাট্রস,* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৪), ২৯।

৩৪। দেবসেন, *অ্যালবাট্রস,* ৫৫।

৩৫। দেবসেন, *অ্যালবাট্রস,* ৪১।

৩৬। দেবসেন, *ঘূর্ণি,* ৫৮।

৩৭। দেবসেন, *ঘূর্ণি,* ৮০।

৩৮। দেবসেন, *অ্যালবাট্রস,* ৪৭।

৩৯। দেবসেন, *অ্যালবাট্রস,* ৫৫।

৪০। নবনীতা দেবসেন, "স্বভূমি," *দশটি উপন্যাস* (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., জানুয়ারি ২০০৩), ৯৯।

৪১। দেবসেন, "স্বভূমি," ১০০।

৪২। দেবসেন, "স্বভূমি," ১২০।

৪৩। দেবসেন, *ঘূর্ণি,* ১৩।

৪৪। দেবসেন, *ঘূর্ণি,* ৩৫।

৪৫। বাসবী চক্রবর্তী, "নারীবাদ: বিভিন্ন ধারা," *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা,* রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী সম্পাদিত (কলকাতা: উর্বী প্রকাশন, ২০১১), ৪৪।

৪৬। দেবসেন, *অ্যালবাট্রস,* ৪৩।

গবেষণালব্ধ ফল

ও

সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ গবেষণাকর্মের দিকনির্দেশ

গবেষণালব্ধ ফল ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ গবেষণাকর্মের দিকনির্দেশ

গবেষণালব্ধ ফল

১.

সমগ্র গবেষণায় একদিকে যেমন নবনীতা দেবসেনের কথাসাহিত্যের শৈলীগত বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে সেইসব বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ পাঠকের কাছে কীভাবে ধরা দেওয়া সম্ভব, তা খতিয়ে দেখা হয়েছে পাঠকের বোধগত প্রক্রিয়া ও কাঠামো বিশ্লেষণের মাধ্যমে। লেখক তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে পাঠকের অভিমুখে চিন্তাস্রোত চালনা করেন। এই বিষয়টি সর্বজনবিদিত হলেও এতদিনের বাংলা সাহিত্যকেন্দ্রিক গবেষণার ধারায় পাঠকের বোধের বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের অভাব দেখা যায়। বর্তমান গবেষণায় সেই অভাব অন্তত কিছুটা পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য, চিত্রকল্প, আন্তর্বয়ান, বিচ্যুতি, সমান্তরতা এবং সর্বোপরি আখ্যানকৌশলের বহুবিচিত্র বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে নবনীতার সাহিত্যে। এইসকল ভাষিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে রচিত উপন্যাস ও গল্প পৃথকভাবে এবং সম্মিলিতভাবেও নির্মাণ করেছে বাচন (discourse)। অর্থাৎ, স্রষ্টার সঙ্গে পাঠকের সংযোগের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, যার মাধ্যমে স্রষ্টা কিছু তথ্য, কিছু চিন্তা পাঠকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারেন। স্রষ্টা তাঁর পাঠককে ঠিক কীভাবে একেকটি উপন্যাস ও গল্পের আধারে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে ভাবাতে চেয়েছেন, তা বর্তমান গবেষণায় ভাষিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণের আলোকে ব্যাখ্যাত হয়েছে। গল্প ও উপন্যাসের অন্তর্গত বিভিন্ন চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি, তাদের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক, সমাজে তাদের নিজস্ব পরিচিতি, প্রতিষ্ঠা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে

একেকটি সম্পর্কের গভীরে নিহিত ক্ষমতার সম্পর্ক, তার বিপরীতে নারীর আত্মপরিচয় নির্মাণ, ব্যক্তিস্বাধীনতা – এইসবকিছুকে ধারণ করে আছে উপযুক্ত ভাষিক নির্বাচন। সেইসব ভাষিক নির্বাচনের মধ্যেই ধরা আছে সাহিত্যস্রষ্টার জীবন ও বাস্তব বিশ্বকে বোঝার ও ব্যাখ্যা করার নিজস্ব ভঙ্গি।

নবনীতা দেবসেনের কলমে যে বাচন গড়ে উঠেছে, তা আমাদের চারপাশের বাস্তব বিশ্বের নানা সামাজিক সমস্যা ও অসংগতিকে চিহ্নিত করেছে, সমালোচনা করেছে, অনেকসময় সমাধানের পথও দেখিয়েছে। বিভিন্ন আখ্যানের অন্তর্গত বাস্তব বিশ্ব যখন আমাদের চারপাশের বাস্তব বিশ্বের সাপেক্ষে একেকটি সম্ভাব্য বিশ্বে পরিণত হয়েছে, তখনই সমাধানসূত্র পাওয়া গিয়েছে। এইভাবে বাচন একদিকে যেমন বাস্তব বিশ্বের উপাদান দ্বারা নির্মিত হয়েছে, তেমনি আবার বাস্তব বিশ্বকেই বিনির্মাণ করতে চেয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে গবেষণা সন্দর্ভে বিশ্লেষিত বিভিন্ন শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে। কারণ, শৈলীগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে কাজে লাগিয়েই আখ্যানের কথক এবং চরিত্রের ভাষিক চয়নকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাচন 'বামাবোধিনী'র মতো উপন্যাসে আঙ্গিকের নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে। এই উপন্যাসের বাচন যেমন বিষয়গত দিক থেকে পাঠকের বাস্তব বিশ্বের নিরিখে একটি সম্ভাব্য বিশ্ব হাজির করেছে, তেমনি আঙ্গিকগত দিক থেকেও বিকল্প সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এভাবে বিষয় ও আঙ্গিক পারস্পরিক সমতা রক্ষা করেছে এবং পাঠকের কাছে স্রষ্টার অভিপ্রায়কে সুস্পষ্ট করেছে।

নবনীতা দেবসেনের সাহিত্য একদিকে যেমন পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরে নিত্য অপমান-বিশ্বাসঘাতকতা-লাঞ্ছনা-বঞ্চনা জর্জরিত জীবন অতিক্রম ক'রে নারীর ঘুরে দাঁড়ানোর দিশা দেখায়, তেমনি অন্যদিকে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমকামী কিংবা রূপান্তরকামী মানুষের স্বপ্নকেও বাস্তব রূপ দেয়। সমাজের বিজয়ী ও বিজিত শ্রেণির মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকা

বুদ্ধিজীবী মানুষের আতান্তর, আত্মবিচার ও আত্মগ্লানি যেমন তাঁর সাহিত্যে ধরা দেয়, তেমনি আবার আত্মজীবনীমূলক গল্পগুলি প্রাত্যহিক ছোট-ছোট সুখদুঃখের অনুভূতিকে হাসির মোড়কে আবৃত ক'রে যেন এক সর্বব্যাপী আনন্দোচ্ছল বাঁচার অনুভূতিকে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দিতে চায়। আর নিখাদ হাস্যরসের গল্প তো আছেই। এছাড়া, বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসের ভাষিক নির্বাচন বারবার স্পষ্ট করেছে এবং একইসঙ্গে চ্যালেঞ্জ করেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজনির্মিত লিঙ্গবৈষম্যের ধারণাকে। আমরা বুঝতে পারি, বিভিন্ন গল্প উপন্যাসের বিষয় নির্বাচন, বিষয় পরিবেশন, চরিত্র চিত্রণ, ভাষিক বৈশিষ্ট্য চয়ন – এই সবরকম শৈলীগত প্রকাশের মধ্য দিয়ে নবনীতার লেখনীর যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যটির বারবার সম্মুখন হয়, তা হল, প্রতিষ্ঠিত প্রথা খুব সূক্ষ্মভাবে ভাঙনের বৈশিষ্ট্য (subversive), যা তাঁর প্রগতিশীল ব্যতিক্রমী চিন্তার প্রকাশক।

পাঠক শৈলীগত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রয়োগের সার্থকতা অনুধাবন করেন কখনো ছক নবীকরণ, কখনো ছক ভাঙন অথবা ছক সংরক্ষণ কিংবা ছক দৃঢ়ীকরণ, আবার কখনো জ্ঞান পুনর্গঠনের দ্বারা। মেটাফরের ব্যবহার ও সেই সূত্রে চরিত্রের মনোশৈলী বোঝার জন্যও সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে পাঠকের জ্ঞানের ছক। নবনীতা যখন রাম, সীতা, বাল্মীকি, শূর্পণখা চরিত্রের বিপরিচিতিকরণ ঘটিয়েছেন, তখন এইসব চরিত্রের প্রতিনিধিত্বশীল বৈশিষ্ট্যে আশ্চর্য বদল এনেছেন। আর সেই বিপরিচিতিকরণ পাঠকের ওইসব চরিত্র সংক্রান্ত এতদিনের পুরনো জ্ঞানের ছকের নবীকরণ করেছে। নবনীতার কলমে যখন সৃষ্টি হয়েছে 'কুইয়র' সাহিত্য, তখন পাঠক দেখেন, 'পুরুষ' ও 'নারী' সংবর্গের যে উদাহরণ (সমকামী) প্রান্তীয়, তাকে নিয়ে আসা হয়েছে সংবর্গের কেন্দ্রের দিকে। সুতরাং পাঠকের ছকের নবীকরণ হয়েছে এক্ষেত্রেও।

পাঠকের জ্ঞানের ছক তৈরি হয় তথ্য ও অভিজ্ঞতা দ্বারা, যা পাঠক আহরণ করেন তাঁর চারপাশের বাস্তব বিশ্ব থেকে। একইভাবে প্রতিটি আখ্যানের অভ্যন্তরেও গড়ে ওঠে একটি

বাস্তব বিশ্ব। সেইসঙ্গে থাকতে পারে এক বা একাধিক সম্ভাব্য বিশ্বও। আখ্যানের এই বাস্তব ও সম্ভাব্য বিশ্বকে পাঠক তাঁর নিজের চারপাশের বাস্তব বিশ্বের সঙ্গে অল্প-বিস্তর তুলনা করে বোঝেন। অর্থাৎ, আখ্যানবিশ্বের অন্তর্গত ছোট থেকে ছোট বিষয়ের ক্ষেত্রেও পাঠকের নিজস্ব বাস্তব বিশ্বজাত জ্ঞানের ছক কখনো নবীকরণ, কখনো ভাঙন, কখনো-বা সংরক্ষণ ইত্যাদি হতে হতে আখ্যান-পাঠ ক্রমশ এগিয়ে চলে। নজর কাড়ার মতো ছক নবীকরণ হতে দেখা যায় নবনীতার বিভিন্ন আত্মজীবনীমূলক গল্প পাঠকালে। এই সব গল্পে আমরা দেখেছি, কাহিনির বাস্তব বিশ্ব আসলে আমাদের চারপাশের বাস্তব বিশ্বের সাপেক্ষে একটি সম্ভাব্য বিশ্বে পরিণত হয়েছে। লেখিকা একটি বিকল্প আমাদের সামনে হাজির করেছেন। পরিবারে পুরুষ সদস্য না-থাকলেই যে নারীরা অসহায় হয়ে যাবে, এমনটা নয় – এমন একটা প্রচ্ছন্ন বার্তাই যেন এই গল্পগুলোর মাধ্যমে ধরা দেয়।

পাঠক কীভাবে মনোপরিসরের মাধ্যমে 'সীতা থেকে শুরু'-র 'পৌরাণিকী' পর্বের অন্তর্গত সম্ভাব্য বিশ্বের ইঙ্গিতকে বুঝতে পারেন, তা দেখানো হয়েছে। এই সম্ভাব্য বিশ্বের ইঙ্গিত নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এক কথায় সেই উদ্দেশ্য হল, যুগান্তরব্যাপী পুরুষতান্ত্রিকসমাজে নারীর অসম্মানের জীবন ও সেখান থেকে উত্তরণের পথ সম্পর্কে পাঠকের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

মহাকাব্যিক চরিত্রের বিপরিচিতিকরণ হোক কিংবা 'কুইয়র' সাহিত্যে একটি সংবর্গের প্রান্তীয় উদাহরণকে কেন্দ্রে নিয়ে আসা হোক অথবা চিত্রকল্প, আন্তর্বয়ান, বিচ্যুতি-সমান্তরতা এবং আখ্যান নির্মাণের বিচিত্র কৌশলই হোক না কেন, আমরা লক্ষ করেছি, প্রায় সবকিছুর ভিতরে-ভিতরে মিশে আছে স্রষ্টার জীবনাদর্শ। ১০.৩. অংশে আলোচিত জীবনাদর্শের প্রতিফলক গোত্রের শব্দগুচ্ছের পুনঃপুন ব্যবহার সম্মিলিতভাবে নিঃসন্দেহে পাঠকের ভাবনায় অভিঘাত সৃষ্টি করতে সক্ষম। নবনীতা দেবসেনের সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা কখনো স্পষ্টভাবে, কখনো

প্রচ্ছন্নে উদ্ভাসিত হতে দেখেছি প্রধানত তিন ধরনের জীবনাদর্শকে, যার একটি নারীবাদী ভাবাদর্শের প্রভাবপুষ্ট, একটি বহুসংস্কৃতিবাদের প্রভাবপুষ্ট এবং তৃতীয়টি হল, সমস্ত গ্লানি, তুচ্ছতা, অচরিতার্থতাকে সরিয়ে নবোদ্যমে বাঁচতে শেখার জীবনাদর্শ।

লেখক এবং পাঠকের সংযোগসেতুর ভূমিকা নেয় লেখকের সৃষ্টি, অর্থাৎ বর্তমান গবেষণায় আখ্যান। লেখক যখন তাঁর সৃষ্টির ভাঁজে ভাঁজে রেখে দেন জীবনকে দেখার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, তখন তা কখনো পাঠকের প্রতিনিধিত্বশীলতা ধারণার দ্বারা, কখনো মনো-পরিসর সৃষ্টির মাধ্যমে, কখনো আবার সম্মুখন-পশ্চাদন ধারণার মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়ে যায় পাঠকের বোধের জগতে এবং পরিণামে কখনো পাঠকের ছক সংরক্ষণ হয়, কখনো ছক ভাঙন কিংবা ছক নবীকরণ হয়, কখনো আবার ছক বৃদ্ধি বা জ্ঞান পুনর্গঠনও হতে পারে। ঠিক যেভাবে নবনীতা দেবসেনের উপন্যাস ও গল্পের পরতে পরতে বিচিত্র শৈলীগত বৈশিষ্ট্যে ছড়িয়ে থাকা তিন ধরনের জীবনাদর্শকে আমরা (বা পাঠক) ধরতে পেরেছি আমাদের (বা পাঠকের) বোধগত প্রক্রিয়ার সহায়তায়। এভাবে পাঠক আখ্যান পাঠের মধ্য দিয়ে আখ্যানের যে-যে বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হন, তা দিয়ে তিনি নির্মাণ করেন নিহিত লেখক (implied author)। বর্তমান গবেষণায় আখ্যান এবং পাঠকের মধ্যবর্তী বোধগত স্তরটিকে চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে আখ্যানের বিভিন্ন শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের নিরিখে। পাঠকের পূর্বজ্ঞানের সাহায্যে আখ্যানকে ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য আসলে লেখকের নির্বাচিত ভাষিক বৈশিষ্ট্য এবং অন্তর্নিহিত জীবনাদর্শের মধ্যবর্তী সংযোগকে প্রতিষ্ঠা দেয়।

স্রষ্টা নানা শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের সমাহারে যেন তাঁর নিজস্ব মূল্যবোধ তথা জীবনাদর্শের আলো জ্বালিয়ে রাখেন পাঠকের জন্য। পাঠক তাঁর বোধগত প্রক্রিয়ার সহায়তায় যখন একেকটি শৈলীগত বৈশিষ্ট্যের রহস্য ভেদ করতে পারেন, ঠিক তখনই এক এক ক'রে পাঠকের অন্তরে

লেখক প্রদত্ত জীবনাদর্শের আলো জ্বলে ওঠে। তারপর অবশ্য পাঠক সেই জীবনাদর্শকে গ্রহণ করবেন কিনা, সেটি তাঁর নিজস্ব অভিরুচি।

২.

বর্তমান গবেষণায় দুটি ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক সম্প্রসারণের অবকাশ দেখা দিয়েছে। সেই দুই ক্ষেত্রে যে-যে নতুন ভাবনার সংযোজন সম্ভব হয়েছে, সেগুলি পরপর উল্লেখ করা হল।

২.১. আন্তর্বয়ানের ধনাত্মকতা ও ঋণাত্মকতা

M. Ahmadian এবং H. Yazdani তাঁদের 'A Study of the Effects of Intertextuality Awareness on Reading Literary Texts: The Case of Short Stories' শীর্ষক গবেষণামূলক নিবন্ধে চার প্রকার আন্তর্বয়ানের কথা বলেছিলেন – আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান (allusion), স্বাঙ্গীকরণমূলক আন্তর্বয়ান (adaptation), নির্দেশধর্মী আন্তর্বয়ান (indication) এবং উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান (quotation)। অন্যদিকে, M. H. Abrams এবং G. G. Harpham রচিত *A Glossary of Literary Terms* থেকে জানা যায়, আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান দু'ভাবে প্রযুক্ত হতে পারে – "to illustrate or expand upon or enhance a subject"[১] অথবা "to undercut it ironically by the discripancy between the subject and the allusion"[১]।

বর্তমান গবেষণায় উপরোক্ত দুই জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে তাত্ত্বিক সম্প্রসারণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। নবনীতা দেবসেনের সাহিত্যের শৈলীগত বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, কেবলমাত্র আবেশধর্মী নয়, নির্দেশধর্মী এবং উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান প্রয়োগের উদ্দেশ্যও হতে পারে দুরকম – উপস্থাপ্য বিষয়কে স্পষ্ট করা অথবা উভয় আন্তর্বয়ানের অব্যবহিত প্রসঙ্গের মধ্যে বিপুল পার্থক্যের ভিত্তিতে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে উপস্থাপ্য বিষয়কে উৎসপাঠের বিষয়ের তুলনায় লঘু করে দেখানো।

আন্তর্বয়ান যে পাঠে প্রযুক্ত হচ্ছে সেই পাঠ এবং ওই আন্তর্বয়ানের উৎসপাঠ – এই দু'য়ের অব্যবহিত প্রসঙ্গ (context) যদি অনেকটাই সমজাতীয় হয়, তাহলে আন্তর্বয়ান ব্যবহারের উদ্দেশ্য হয় বিষয়কে আরও ভালোভাবে স্পষ্ট করা অর্থাৎ, "to illustrate or expand upon or enhance a subject"। এই ধরনের আন্তর্বয়ানকে আমরা বলেছি ধনাত্মক আন্তর্বয়ান (positive intertext)। এই নাম অনুসারেই বলা হয়েছে ধনাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান (positive allusion), ধনাত্মক নির্দেশধর্মী আন্তর্বয়ান (positive indication) এবং ধনাত্মক উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান (positive quotation)।

আবার, আন্তর্বয়ান যে পাঠে প্রযুক্ত হচ্ছে সেই পাঠ এবং ওই আন্তর্বয়ানের উৎসপাঠ – এই দু'য়ের অব্যবহিত প্রসঙ্গ (context) যদি বিজাতীয় হয়, তাহলে সেই ধরনের আন্তর্বয়ানকে আমরা বলেছি ঋণাত্মক আন্তর্বয়ান (negative intertext)। এক্ষেত্রে দেখা যায়, ঋণাত্মক আন্তর্বয়ান আসলে যতটা না বিষয়কে স্পষ্ট করতে চায়, তার থেকে অনেক বেশি তার উদ্দেশ্য হল উৎসপাঠের সংশ্লিষ্ট অব্যবহিত প্রসঙ্গের স্মৃতিকে উসকে দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গের গুরুত্বকে লঘু করে দেখানো অর্থাৎ Abrams ও Harpham-এর ভাষা ধার করে বলা যায় "undercut" করা, যা নবনীতার কলমে প্রায়শই হাস্যরস সৃষ্টির একটা জোরাল মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ঋণাত্মক আন্তর্বয়ানের নামানুসারেই এসেছে ঋণাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান (negative allusion), ঋণাত্মক নির্দেশধর্মী আন্তর্বয়ান (negative indication) এবং ঋণাত্মক উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান (negative quotation)।

কেবল স্বাঙ্গীকরণ (adaptation)-এর ক্ষেত্রে ঋণাত্মকতা সম্ভব নয়। কারণ, এক্ষেত্রে উৎসপাঠ থেকে যা গ্রহণ করা হয়, তা অবিকৃত অবস্থায় সরাসরি গ্রহণ ক'রে বর্তমান পাঠে প্রয়োগ করা হয়।

২.২. পাঠকের ছকে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আন্তর্বয়ান এবং আন্তর্চারিত্রিকতার প্রভাব

ধনাত্মক আন্তর্বয়ান পাঠকের ছক দৃঢ়ীকরণ (schema reinforcement) করে। ঋণাত্মক আন্তর্বয়ান পাঠকের জ্ঞান পুনর্গঠন (knowledge restructuring) করে।

আন্তর্চারিত্রিকতার যেসব প্রকারভেদ পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে দেখা গিয়েছে – চরিত্রনাম কেন্দ্রিক আন্তর্চারিত্রিকতা পাঠকের জ্ঞান পুনর্গঠন করেছে। চরিত্রের পুনর্ব্যবহার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ছক নবীকরণ (schema refreshment) করেছে। আবার, ক্ষেত্র বিশেষে চরিত্রের পুনর্ব্যবহার ছক সংরক্ষণ (schema preservation) কিংবা ছক বৃদ্ধি (schema accretion) করেছে। চরিত্রমিশ্রণ এবং চরিত্রানুকরণ পাঠকের জ্ঞান পুনর্গঠন করেছে।

সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ গবেষণাকর্মের দিকনির্দেশ

বর্তমান গবেষণায় দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হয়েছে নবনীতা দেবসেনের উপন্যাস ও গল্প থেকে। অন্য কোনও ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, কবি কিংবা নাটকপ্রণেতার সৃষ্টির শৈলীগত বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্যের হাত ধরে স্রষ্টার চিন্তা, মূল্যবোধ, তাঁর নিজের জীবনাদর্শ কীভাবে পাঠকের বোধের জগতে পৌঁছায়, তা পৃথক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণসাপেক্ষ। সেক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণা ভবিষ্যতে গবেষণায় তথ্যভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

বর্তমান গবেষণায় আন্তর্বয়ানকে কেন্দ্র করে যেসব তাত্ত্বিক ভাবনার ও তাত্ত্বিক সম্প্রসারণের অবকাশ রচিত হয়েছে, সেগুলি পরবর্তী কোনও শৈলীনির্ভর গবেষণায় কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। শুধুমাত্র সাহিত্যিক পাঠই নয়, তা হতে পারে সংবাদপত্র, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপন, সামাজিক মাধ্যম ইত্যাদিতে ব্যবহৃত ভাষিক বৈশিষ্ট্যের শৈলীনির্ভর গবেষণা।

বর্তমান গবেষণাকে প্রেক্ষাপটে রেখে পর্যবেক্ষণসম্ভব উপাত্ত (empirical data) সংগ্রহের মাধ্যমে পরবর্তী কোনও গবেষণাকর্ম আয়োজন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে, বর্তমান গবেষণায় যেসব পাঠ অবলম্বন করা হয়েছে, সেগুলি পাঠের সময় পাঠকেরা কী ধরনের পাঠ-প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন, তা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে যে বর্তমান গবেষণাসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য কতখানি সমর্থন করছে আর কতখানি পার্থক্য তৈরি হচ্ছে। পাঠকভেদেই-বা ফলাফলের কতখানি হেরফের হচ্ছে, তা নিরীক্ষণসাপেক্ষ। বর্তমান গবেষণার ভিত্তিতে শুধু তুলনামূলক বিশ্লেষণই নয়, হাতেকলমে পর্যবেক্ষণ করলে হয়তো নতুন কোনও বৈশিষ্ট্যের সন্ধানও পাওয়া যাবে। এছাড়া, পাঠকের পাঠ-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত নানাবিধ আবেগের ধরনধারণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা সম্ভব যে পাঠকভেদে স্রষ্টার চিন্তা, ছোট বড় মূল্যবোধ, আস্থা ও সর্বোপরি জীবনাদর্শের প্রভাবের স্থায়িত্ব কতখানি। বর্তমান গবেষণায় কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঠককে পর্যবেক্ষণ না-করে সাধারণভাবে বিস্তৃত অনুসন্ধান করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। M. H. Abrams and G. G. Harpham, *A Glossary of Literary Terms* (Delhi: Cengage Learning, 2012), 12

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

দেবসেন, নবনীতা। *অভিজ্ঞান*। ২য় সংস্করণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, মে ২০১২।

দেবসেন, নবনীতা। *অ্যালবাট্রস*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৪।

দেবসেন, নবনীতা। *গল্পসমগ্র ১*। ৭ম সংস্করণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৯।

দেবসেন, নবনীতা। *গল্পসমগ্র ২*। ৫ম সংস্করণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৭।

দেবসেন, নবনীতা। *গল্পসমগ্র ৩*। ৪র্থ সংস্করণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০২০।

দেবসেন, নবনীতা। *গল্পসমগ্র ৪*। ৪র্থ সংস্করণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০২০।

দেবসেন, নবনীতা। *ঘূর্ণি* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০৮।

দেবসেন, নবনীতা। *দশটি উপন্যাস*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., জানুয়ারি ২০০৩।

দেবসেন, নবনীতা। *দ্বিরাগমন*। ৩য় সংস্করণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৭।

দেবসেন, নবনীতা। *নব-নীতা*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, বৈশাখ ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

দেবসেন, নবনীতা। *ফিনিক্স*। ২য় সংস্করণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জুন ২০১৫।

দেবসেন, নবনীতা। *রূপকথা সমগ্র*। কলকাতা: পত্রভারতী, নভেম্বর ২০১১।

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

ইসলাম, রফিকুল এবং সরকার, পবিত্র (সম্পা)। *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ দ্বিতীয় খণ্ড*, ২য় সংস্করণ। ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। *সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, মোঃ আফসারুল হুদা কর্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৩।

গুপ্ত, ক্ষেত্র (সম্পা.)। *মধুসূদন রচনাবলী*। ৪র্থ সংস্করণ। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৪।

ঘোষ, শঙ্খ। *কবিতার মুহূর্ত*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, জানুয়ারি ১৯৮৭।

ঘোষ, শঙ্খ। *শব্দ আর সত্য*। কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮২।

চক্রবর্তী, অলোক। *আখ্যানের তত্ত্বভুবন*। কলকাতা: আশাদীপ, ২০২৩।

চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল। *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। কলকাতা: রত্নাবলী, ২০১৫।

চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। *শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৪২।

চট্টোপাধ্যায়, হীরেন। *উপন্যাসের রূপরীতি*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *গীতবিতান।* কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *জাপান-যাত্রী*। কলিকাতা: ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *বলাকা।* কলকাতা: বিশ্বভারতী, নূতন সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* চতুর্থ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* দশম খন্ড। সুলভ সংস্করণ। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র-রচনাবলী,* ষষ্ঠ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সঞ্চয়িতা।* কলকাতা: সাহিত্যম্, ২০০৩।

দাশ, জীবনানন্দ। *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা।* কলকাতা: ভারবি, ২০১৪।

দাশ, শিশিরকুমার। *ভাষা জিজ্ঞাসা।* ৬ষ্ঠ সংস্করণ। কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।

দাস, অমিতাভ। *আখ্যানতত্ত্ব।* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ২০১৯।

দেবসেন, নবনীতা। *নবনীতার নোটবই।* ৪র্থ সংস্করণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০১৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক। *পুতুল নাচের ইতিকথা।* কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

বসু, বুদ্ধদেব। *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা।* সৌরেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত। কলকাতা: নাভানা, ১৯৫৩।

বসু, বুদ্ধদেব (সম্পা)। *আধুনিক বাংলা কবিতা।* কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৩।

বসু, রাজশেখর। *পরশুরাম গল্পসমগ্র।* দীপংকর বসু সম্পাদিত। কলকাতা: এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২।

বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পা)। *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা।* কলকাতা: উর্বী প্রকাশন, ২০১১।

বিবেকানন্দ, স্বামী। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড)।* কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

বেদব্যাস। *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা।* ৮ম সংস্করণ। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী অনূদিত। শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী প্রকাশিত। নদীয়া: ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, ২০০৬।

মজুমদার, অভিজিৎ। *শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব।* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৬।

মিত্র, সুচেতা। *শব্দের শরীরী প্রতিমা।* কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারি ১৯৮৫।

মিশ্র, অশোককুমার। *কাব্যশৈলী মঞ্জরী।* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪।

মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরেকৃষ্ণ। *কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ।* কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

রায়, অপূর্বকুমার। *শৈলীবিজ্ঞান।* কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬।

রায়, সুকুমার। *আবোল তাবোল।* ২য় সংস্করণ। কলকাতা: নির্মল বুক এজেন্সী, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ।

শ', রামেশ্বর। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।* ৩য় সংস্করণ। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

সিংহ, রাজীব (সম্পা)। *অন্বেষণ ও বিশ্লেষণ ১: নবনীতা দেবসেন।* কলকাতা: প্রতিভাস, জানুয়ারি ২০২৪।

সেন, অঞ্জন ও সিংহ, উদয় নারায়ণ (সম্পা), *উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব।* কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১০।

সেন, নবেন্দু (সম্পা)। *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা।* কলকাতা: রত্নাবলী, ২০০৯।

সেন, সুকুমার। *ভাষার ইতিবৃত্ত।* কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১৯৯৩।

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Abrams, M. H. and Harpham, G. G. *A Glossary of Literary Terms*. Delhi: Cengage Learning, 2012.

Allen, Graham. *Intertextuality*. London: Routledge, 2000.

Althusser, Louis. *For Marx*. Translated by Ben Brewster. London: The Penguin Press, 1969.

Barthes, R. *Image Music Text*. Translated by Stephen Heath. London: Fontana Press, 1977.

Brone, G. and Vandaele, J. (eds.). *Cognitive Poetics: Goals, Gains and Gaps*. Berlin: Mouton de Gruyter, 2009.

Cambridge International Dictionary of English. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Eagleton, Terry. *Ideology: An Introduction*. London and New York: Verso, 1991.

Ellmann, Richard, and Charles, Feidelson Jr. (eds.). *The Modern Tradition*. New York: Oxford University Press, 1965.

Evans, V. *A Glossary of Cognitive Linguistics*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2007.

Evans, V and Green, M. *Cognitive Linguistics: An Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2006.

Forster, E. M. *Aspects of the Novel*. London: Penguin Books, 2005.

Fowler, R. *Linguistics and the Novel*. London: Methuen, 1977.

Gavins, J and Steen, G. (eds.). *Cognitive Poetics in Practice*. London: Routledge, 2003.

Geeraerts, D. and Cuyckens, H. (eds.). *The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics*. NY: OUP, 2007.

Gibbs, Raymond, W. (ed.). *The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought*. NY: CUP, 2008.

Kristeva, Julia. *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*. Translated by Thomas Gora, Alice Jardine, and Leon S. Roudiez. New York: Columbia University Press, 1980.

Lakoff, G. and Johnson, M. *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Leech, G.N. and Short, M.H. *Style in Fiction*. London: Longman, 1981.

Lewis, C. Day. *The Poetic Image*. London: Jonathan Cape, 1947.

McIntyre, D. *Point of View in Plays: A cognitive stylistic approach to viewpoint in drama and other text-types*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2006.

Ortony, A. (ed.). *Metaphor and Thought*. 2nd edition. NY: CUP, 1993.

Oxford Advanced Learner's Dictionary. 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.

Paltridge, Brian. *Discourse Analysis: An Introduction*. 2nd ed. London: Bloomsbury, 2012.

Plett, H. F., ed. *Intertextuality*. New York and Berlin: Walter de Gruyter, 1991.

Poe, Edgar, A. *The Black Cat and Other Stories*. edited by Andy Hopkins and Jocelyn Potter. Harlow: Pearson Education Limited, 1999.

Raghunath, R. *Possible Worlds Theory and Counterfactual Historical Fiction*. Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020.

Richards, I. A. *Principles of Literary Criticism*. London & NY: Routledge, 2001.

Ryan, Marie-Laure. *Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory*. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 1991.

Semino, E and Culpeper, J. (eds.). *Cognitive Stylistics: Language and cognition in text analysis*. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002.

Short, M. *Exploring the Language of Poems, Plays and Prose*. NY: Routledge, 2013.

Stockwell, P. *Cognitive Poetics: An Introduction*. London & NY: Routledge, 2002.

Tsur, R. *Toward a Theory of Cognitive Poetics*. 2nd edition. Brighton & Portland: Sussex Academic Press, 2008.

University of Chicago Press. The Chicago Manual of Style. 17th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2017.

Wellek, R. and Warren, A. *Theory of Literature*. London: Jonathan Cape, 1954.

সহায়ক বাংলা ও ইংরেজি প্রবন্ধ (পত্রিকায় প্রকাশিত)

চক্রবর্তী, সুমিতা। "মূর্তিতে কি দিবে ধরা"। *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা ১৯৮৮-৮৯*। ৩য় সংখ্যা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (মার্চ ১৯৮৯): ২৪-৩৬।

দাস, পারমিতা. "আভ্যন্তরীণ বিচ্যুতি: সাধারণ পরিচয় ও নির্বাচিত গল্পে তার নানা মাত্রা অনুসন্ধান." *Jadavpur Journal of Languages and Linguistics* 06. Special Edition. (2024): 84-93. Accessed December 12, 2024. https://archive.org/details/shobdo-2-final-copy/mode/2up.

বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপ্ত (সম্পা)। *চার্বাক*। ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (ফাল্গুন ১৪২৯ বঙ্গাব্দ)।

মজুমদার, ভাস্কর। "সাহিত্যের না-বাঁধা সেতু"। *আনন্দবাজার পত্রিকা* (জানুয়ারি ২৪, ২০২৪): ৪।

Ahmadian, M., and H. Yazdani. "A Study of the Effects of Intertextuality Awareness on Reading Literary Texts: The Case of Short Stories." *Journal of Educational and Social Research* 3, no. 2 (May 2013): 155–66. Accessed February 11, 2023. https://doi.org/10.5901/jesr.2013.v3n2p155.

Dan, Mina, ed. "English-to-Bangla List." *Bulletin of the Department of Linguistics*, no. 17. University of Calcutta (2013): 75-132.

Eagleton, Terry. "Ideology, Fiction, Narrative." *Social Text*, no. 2 (Summer 1979): 62–80. Accessed October 8, 2024. https://doi.org/10.2307/466398.

Gabriela Tucan. "The Reader's Mind Beyond The Text – The Science Of Cognitive Narratology". *Romanian Journal of English Studies*. (February 2013): 299-308. Accessed September 8, 2023. https://doi.org/10.2478/rjes-2013-0029.

Levin, Samuel R. "Internal and External Deviation in Poetry". *Word*. 21, no. 2 (1965): 225-37. Accessed April 16, 2022. https://doi.org/10.1080/00437956.1965.11435425.

Ortikova, M. O. "The Notion Of Stylistic Devices From The Position Of Cognitive Stylistics". *Academic Research In Educational Sciences*. 2. no. 6. (2021): 1100-06. Accessed June 11, 2023. https://doi.org/10.24412/2181-1385-2021-6-1100-1106.

Shonoda, Mary-Anne. “Metaphor and Intertextuality: A Cognitive Approach to Intertextual Meaning-Making in Metafictional Fantasy Novels.” *International Research in Children s Literature* 5, no. 1 (July 2012): 81-96. Accessed June 11, 2023. https://www.researchgate.net/publication/274562324_Metaphor_and_Intertextuality_A_Cognitive_Approach_to_Intertextual_Meaning-Making_in_Metafictional_Fantasy_Novels.

সহায়ক ইংরেজি প্রবন্ধ (গ্রন্থে প্রকাশিত)

Harrison, C. and Stockwell, P. “Cognitive poetics”. In *The Bloomsbury Companion to Cognitive Linguistics*. edited by J. Littlemore and J.R. Taylor. 218-233. London: Bloomsbury, 2014.

Kövecses, Z. “Conceptual Metaphor Theory”. In *The Routledge Handbook of Metaphor and Language*. edited by E. Semino and Zsofia Demjen. 13-27. NY: Routledge. 2017.

Mukařovský, J. "Standard Language and Poetic Language." In *A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure, and Style*. Translated by Paul L. Garvin. Washington: Georgetown University Press, 1964.

Stockwell, P. “Cognitive stylistics”. In *The Routledge Handbook of Language and Creativity*. edited by Rodney Jones. 233-45. London: Routledge, 2015.

সাক্ষাৎকার

দেবসেন, নবনীতা। “আলাপ: নবনীতা দেবসেন”। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কল্যাণ মৈত্র। *আমার সময়*। বর্ষ ১, সংখ্যা ১১, (মে, ২০১০)। ১২-২৫।

দেবসেন, নবনীতা। “জীবনে অনেক পেয়েছি”। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সুদেষ্ণা বসু। *নানারঙের নবনীতা*। কলকাতা: পত্রভারতী, জানুয়ারি ২০২০। ৩৮৭-৪০২।

Sen, Nabaneeta Dev. “MEET THE WRITER: ‘I wanted to write about sexuality, deception, loss, but I could not’: Writer Nabaneeta Dev Sen”. Interview by Ritu Menon. *Scroll.in*. Accessed December 8, 2022. https://scroll.in/article/943817/i-wanted-to-write-about-sexuality-deception-loss-but-i-could-not-writer-nabaneeta-dev-sen.

অন্তর্জাল সূত্র

https://archive.org.
https://departmental-library.blogspot.com.
https://libgen.st/.
https://nptel.ac.in.
https://www.researchgate.net.
https://scholar.google.com.
https://shodhganga.inflibnet.ac.in.
কণিষ্ক ভট্টাচার্য, “রেশমি সুতোর পাকে পাকে”, শেষবার দেখার তারিখ এপ্রিল ২২, ২০২৪।

https://www.facebook.com/share/p/rVvhEYBxdBkWV35C/?mibextid=xfxF2i
তিসা, জামিয়া রহমান খান। “প্যারোডি এবং বাংলা সাহিত্য।” শেষবার দেখার তারিখ ফেব্রুয়ারি ০৬, ২০২৩। https://roar.media/bangla/main/literature/parody-and-bangla-literature।
দেবসেন, নবনীতা। “আমার প্রথম বই – আমি, অনুপম”। শেষবার দেখার তারিখ জুলাই ০১,২০২৪। https://pagefournews.com/ami-anupam-nabaneeta-deb-sen/।
দেবসেন, নবনীতা। “মেয়েদেরও এক টুকরো ছেলেবেলা থাকে বইকী”। শেষবার দেখার তারিখ জুলাই ০৪, ২০২৪। https://www.anandabazar.com/amp/rabibashoriyo/childhood-memories-of-nabaneeta-dev-sen-1.664436।
মণ্ডল, স্বপনকুমার “নবনীতা দেবসেন: নারী ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বিস্তার”। আনন্দবাজার অনলাইন। শেষবার দেখার তারিখ সেপ্টেম্বর ১৬, ২০২২। https://www.anandabazar.com/amp/editorial/nabaneeta-dev-sen-shown-the-versatility-of-her-personality-1.1095168 ।
মিলনসাগর, “তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান”, শেষবার দেখার তারিখ মার্চ ৩০, ২০২৩। http://www.milansagar.com/kobi/tarashankar/kobi-tarashankarbandyopadhyay_kobita4.html।
সরকার, যোগীন্দ্রনাথ। "কাকাতুয়া"। *বাংলার কবিতা*। শেষবার দেখার তারিখ এপ্রিল ২৭, ২০২৫। https://banglarkobita.com/poem/famous/434।
Biswas, Debabrata. “Hey Madhabi Dwidha Keno (হে মাধবী, দ্বিধা কনে)- Debabrata Biswas.” YouTube, February 28, 2015. Music video, 3:10. https://youtu.be/u-201DnBdKQ?si=AFL_T5zYt6DU2y86.
Dey’s Publishing. “NDS Memorial Lecture”. Uploaded January 15, 2022. Video. https://www.facebook.com/share/v/Hri5K5x4HqYvA3bp/?mibextid=jmPrMh.
ENGLISH 123: INTRODUCTION TO FICTION. “INTERTEXTUALITY VS. ADAPTATION”. Accessed April 22, 2024. https://introtofictionf18.web.unc.edu/imtertextuality-vs-adaptation/.
Ling 131: Language & Style. “A brief history of Stylistics”. Accessed August 09, 2022. https://www.lancaster.ac.uk/fass/projects/stylistics/introduction/history.htm.
Pankin, J. “Schema Theory”. 2013. Accessed September 23, 2021. http://web.mit.edu/pankin/www/Schema_Theory_and_Concept_Formation.pdf.
Rafi, Mahd and Dutt, Geeta. "Ae Dil Hai Mushkil Jeena Yahan - HD Video Song." YouTube. Uploaded December 3, 2019. Music video. https://www.youtube.com/watch?v=R_JYoyWtLmk.
Sahitya Akademi. “Meet the author: Nabaneeta Dev Sen”. August 12, 2004. Accessed May 16, 2024. https://sahitya-akademi.gov.in/library/meettheauthor/nabaneeta_dev_sen.pdf.
Shutterstock. “Mountains Flowers Foreground royalty-free images”. Accessed May 07, 2023. https://images.app.goo.gl/GRhRd4D5ALPpEeWw7.

Som, Bidisha. “Lec 1: Nature of human thought – I”. Posted January 18, 2022. NPTEL IIT Guwahati. Video, 48:08. https://youtu.be/lfdXVlutp_E?si=Xzds6RUrj2Vj3SzT.

Som, Bidisha. “Lec 7: Metaphor”. Posted January 19, 2022. NPTEL IIT Guwahati. Video, 1:18:23. https://youtu.be/i2bb4NMcBUk?si=zkMc-xpxmA_fdiRj.

van Dijk, Teun A. *Ideology and Discourse: A Multidisciplinary Introduction.* Accessed August 1, 2024. https://www.discourses.org/wp-content/uploads/2022/06/Teun-A.-van-Dijk-2012-Ideology-And-Discourse.pdf.

Wikipedia, “Parama (film)”, Accessed February 11, 2023. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Parama_(film).

Wikipedia, “The Graduate”, Accessed February 11, 2023. https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Graduate.

Wikipedia, “Roy Sullivan”, Accessed February 11, 2023. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Roy_Sullivan.

Shakespeare, William. *Romeo and Juliet*. Accessed April 25, 2025. https://shakespear.folger.edu.

Wikipedia. “Nabaneeta Dev Sen”. Accessed April 06, 2024. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNabaneeta_Dev_Sen&psig=AOvVaw2HPTo4Hrsna8yuDKwPS4JC&ust=1746384430362000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjRxqFwoTCLDf15D7h40DFQAAAAAdAAAAABAJ.

পরিশিষ্ট ১

নির্বাচিত পরিভাষা

বাংলা – ইংরেজি

(সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভে ভাষাতত্ত্বের বাংলা পরিভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে। ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে জড়িত অতিপরিচিত বাংলা পরিভাষাগুলি তালিকাভুক্ত করা হয়নি। তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিচিত, একেবারেই অপরিচিত এবং বর্তমান গবেষণার সাপেক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষাসমূহ তালিকাভুক্ত হয়েছে। পরিভাষা নির্ধারণের জন্য যেসব উৎস ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি তালিকার শেষে উল্লিখিত।)

অণু-আন্তর্বয়ন– micro-intertextuality

অনুপ্রাস – alliteration

অনুভব – perception

অবাস্তব বিশ্ব – non-actual world

অর্থতাত্ত্বিক – semantic

আখ্যানকৌশল – narrativity

আদান – input

আদি-প্রতিমা – prototype

আন্তর্চারিত্রিকতা – interfigurality

আন্তর্বয়ান– intertext

আন্তর্বয়ন– intertextuality

আবেশ / আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান – allusion

আভাসিত লেখক – implied author

আলগোছে একত্রীকরণ – softly assemble (দ্র. কষ্টপূর্বক একত্রীকরণ)

উৎসক্ষেত্র – source domain

উৎসপাঠ – source text

উদ্ধৃতি / উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান – quotation

উপমা – simile

উপরিগত – overlapping

ঋণাত্মক আবেশ / ঋণাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান – negative allusion

ঋণাত্মক উদ্ধৃতি / ঋণাত্মক উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান – negative quotation

ঋণাত্মক নির্দেশধর্মী আন্তর্বয়ান – negative indication

ঋণাত্মক সার্ব-আন্তর্বয়ন – negative macro-intertextuality

ঋণাত্মক অণু-আন্তর্বয়ন – negative micro-intertextuality

কষ্টপূর্বক একত্রীকরণ – hardly assemble

কাহিনি-অতিরিক্ত কণ্ঠস্বর – extra-fictional voice

কাহিনি-বিশ্ব – text-world

কাহিনি-মহাবিশ্ব – text-universe

কেন্দ্রীয় – central

ক্ষেত্র – field

গৌণ – secondary

চিত্রকল্প – image; imagery

চিন্তন প্রক্রিয়া – thought process

চিরাচরিত রূপক – conventional metaphor

চেতনাপ্রবাহমূলক পদ্ধতি – stream of consciousness

ছকবদ্ধতা – schematicity

ছক – schema

ছকমূলক বিচ্যুতি – schematic deviation

ছক নবীকরণ – schema refreshment

ছক বৃদ্ধি – schema accretion

ছক ভাঙন – schema disruption

ছক দৃঢ়ীকরণ – schema reinforcement

ছক সংরক্ষণ – schema preservation

ছাঁচ – template

জ্ঞান পুনর্গঠন – knowledge restructuring

জ্ঞান সংগঠন – knowledge structure

দুর্বলভাবে ঋণাত্মক – weakly negative

দুর্বলভাবে ধনাত্মক – weakly positive

ধনাত্মক আবেশ / ধনাত্মক আবেশধর্মী আন্তর্বয়ান – positive allusion

ধনাত্মক উদ্ধৃতি / ধনাত্মক উদ্ধৃতিমূলক আন্তর্বয়ান – positive quotation

ধনাত্মক নির্দেশধর্মী আন্তর্বয়ান – positive indication

ধনাত্মক সার্ব-আন্তর্বয়ন– positive macro-intertextuality

ধনাত্মক অণু-আন্তর্বয়ন– positive micro-intertextuality

ধারণা – concept

ধারণাগত রূপক – conceptual metaphor

নকশা – diagram

নির্দেশধর্মী আন্তর্বয়ান – indication

নির্ধারিত – selective

নিয়ন্ত্রক বৈশিষ্ট্য – dominant feature

পটভূমিক জ্ঞান – background knowledge

পশ্চাৎপট – background

পশ্চাদন – ground

পশ্চাদিত – grounded

পাঠ – text

প্রতিনিধিত্বশীল বৈশিষ্ট্য – prototypical feature

প্রতিনিধিত্বশীল উদাহরণ – prototypical example

প্রতীক – symbol

প্রমুখন – forgrounding

প্রমুখিত – forgrounded

প্রসঙ্গ – context

প্রান্তীয় – peripheral

প্রায়-ভাষা – para-language

প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক – contextual relation

প্রেক্ষিত – perspective

বাস্তব বিশ্ব – actual world

বিচ্যুতি – deviation

বিপরিচিতিকরণ – defamiliarisation

বিমূর্ত – abstract

বোধ – cognition

বোধগত আখ্যানতত্ত্ব – cognitive narratology

বোধগত কাঠামো – cognitive structure

বোধগত প্রক্রিয়া – cognitive process

বোধগত বিজ্ঞান – cognitive science

বোধগত শৈলী – cognitive style

বোধগত শৈলীবিজ্ঞান – cognitive stylistics

বোধগত সামর্থ্য – cognitive competence

বৈশিষ্ট্য-বাতিলকরণ তত্ত্ব – feature-cancellation theory

ভাবাদর্শ – ideology

ভাষিক নির্বাচন – linguistic choice

ভাষিক রূপক – linguistic metaphor

ভিত্তি পরিসর – base space

মন – mind

মনো-পরিসর – mental space

মনোভাব – attitude

মনোযোগ – attention

মনোশৈলী – mind style

মূর্ত – concrete

মূর্তকরণ – embodiment

মৌলিক প্রতিমাময়তা / প্রতিনিধিত্বশীলতা – prototypicality

রূপক – metaphor

রূপাদর্শ – model

লক্ষ্যপাঠ / বর্তমান পাঠ – target text

লক্ষ্যক্ষেত্র – target domain

সন্নিধান – juxtaposition

সমধর্মী সমষ্টি – set

সমান্তরতা – parallelism

সম্ভাব্য বিশ্ব – possible world

সম্ভাব্য বিশ্ব তত্ত্ব – possible world theory

সম্মুখন-পশ্চাদন – figure-ground

সম্মুখিত – figured

সংবর্গ / ধারণাগত সংবর্গ – category / conceptual category

সংবর্গায়ন – categorization

সংবেদন – sensation

সার্ব-আন্তর্বয়ন– macro-intertextuality

সূচক – deictic

সূচন – deixis

স্মৃতি – memory

স্বরমিত্রতা – assonance

স্বাঙ্গীকরণমূলক আন্তর্বয়ান– adaptation

পরিভাষা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব উৎসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে, সেগুলি নিচে উল্লেখ করা হল –

১। কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস *জার্মান ভাবাদর্শ*, গৌতম দাস কর্তৃক অনূদিত (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৯)।

২। রাজীব চৌধুরী, "আন্তর্বয়ান থেকে আন্তর্বয়ন", *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা*, নবেন্দু সেন সম্পাদিত (কলকাতা: রত্নাবলী, ২০০৯), ৬৭৪-৬৮৭।

৩। হাকিম আরিফ, "বোধগত ভাষাবিজ্ঞান", *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ দ্বিতীয় খণ্ড*, রফিকুল ইসলাম এবং পবিত্র সরকার সম্পাদিত (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১২), ৩৪১-৭৫।

৪। Mina Dan, ed., "English-to-Bangla list," *Bulletin of the Department of Linguistics*, no. 17 (University of Calcutta, 2013), 75–132.

পরিশিষ্ট ২

নবনীতা দেবসেনের সাহিত্যকর্মের তালিকা

উপন্যাস

১. আমি, অনুপম (১৯৭৮)

২. প্রবাসে দৈবের বশে (১৯৮৫)

৩. অন্য দ্বীপ (১৯৮৬)

৪. স্বভূমি (১৯৮৬)

৫. শীত সাহসিক হেমন্তলোক (১৯৮৮)

৬. একটা দুপুর (১৯৯৬)

৭. বামা-বোধিনী (১৯৯৭)

৮. দেশান্তর (১৯৯৮)

৯. ঠিকানা (১৯৯৯)

১০. মায়া রয়ে গেল (২০০০)

১১. শনি-রবি (২০০১)

১২. পাড়ি (২০০২)

১৩. উড়াল (২০০৩)

১৪. তিতলি (২০০৪)

১৫. অ্যালবাট্রস (২০০৪)

১৬. একটি ইতিবাচক প্রেমকাহিনী (২০০৫)

১৭. দ্বিরাগমন (২০০৬)

১৮. রামধন মিত্তির লেন (২০০৬)

১৯. ইহজন্ম (২০০৭)

২০. ঘূর্ণি (২০০৮)

২১. অভিজ্ঞান (২০০৯)

২২. ফিনিক্স (২০১১)

২৩. হৃদকমল (২০১৫)

গল্পগ্রন্থ

১. মঁসিয়ো হুলোর হলিডে (১৯৮০)

২. গল্পগুজব (১৯৮২)

৩. ভালোবাসা কারে কয় (১৯৯২)

৪. নাট্যারম্ভ (১৯৯২)

৫. বসনমামা এবং অন্যান্য (১৯৯৪)

৬. সীতা থেকে শুরু (১৯৯৪)

৭. খগেনবাবুর পৃথিবী (১৯৯৭)

৮. জরা হট্‌কে এবং অন্যান্য (২০০০)

৯. সপ্তকাণ্ড (২০০১)

১০. রাগ-অনুরাগ ও অন্যান্য গল্প (২০০৩)

কাব্যগ্রন্থ

১. প্রথম প্রত্যয় (১৯৫৯)

২. স্বাগত দেবদূত (১৯৭১)

৩. তুমি মনস্থির করো (২০০৯)

নাটক

১. মেদেয়া এবং তিনটি একাঙ্ক নাটক (১৯৯৪)

২. অভিজ্ঞান্‌ দুষ্মন্তম্‌ (২০১০)

ভ্রমণকাহিনি

১. করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে (১৯৭৮)

২. ট্রাকবাহনে ম্যাকমাহনে (১৯৮৩)

৩. হে পূর্ণ তব চরণের কাছে (১৯৮৪)

৪. তিন ভুবনের পারে (১৯৯০)

৫. উত্তমাশা অন্তরীপ (২০০৯)

৬. যাবই যাব পেরু (২০১৫)

আত্মজনকথা

১. স্বজনসকাশে (২০১৫)

রম্যরচনা

১. নটী নবনীতা (১৯৮৪)

২. শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর (১৯৯৫)

৩. বারান্দা (২০০০)

৪. ঘুলঘুলি (২০০০)

৫. নবনীতার নোটবই (২০১১)

৬. ভালো-বাসার বারান্দা – ১ম খণ্ড (২০১০), ২য় (২০১৫), ৩য় (২০১৬), ৪র্থ (২০১৯), ৫ম (২০১৯)

কিশোরসাহিত্য

১. সমুদ্রের সন্ন্যাসিনী (১৯৭৯)

২. স্বপ্ন কেনার সদাগর (১৯৯৪)

৩. কায়াক (১৯৯৬)

৪. পলাশপুরের পিকনিক (১৯৯৭)

৫. ইচ্ছামতী (১৯৯৯)

৬. বুদ্ধিবেচার সওদাগর (১৯৯৯)

৭. চাকুম-চুকুম (২০০০)

৮. সাত কন্যের দেশ (২০০০)

৯. মনকেমনের গল্প (২০০২)

১০. রঙ্কিণীর রাজ্যপাট এবং অন্যান্য (২০০৫)

১১. ছোট্ট বুবুল আর পরীরা (২০০৮)

১২. তিন্নি আর মাসির গপ্পোগাছা (২০০৮)

১৩. মৌয়ের বন্ধুরা (২০০৮)

১৪. মায়া অরণ্যে মণি-মানিক (২০১০)

প্রবন্ধগ্রন্থ

১. ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ও অন্যান্য প্রবন্ধ (১৯৭৭)

২. বীরশৈব সন্তকবি ও বীরশৈব সাধনা (১৯৮৭)

৩. চন্দ্রমল্লিকা ও প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ (২০১৫)

অনুবাদ

১. অষ্টমী [আট এশীয় নারীর কবিতা] (২০০৬)

২. উপমহাদেশের গল্প (২০১৩)

৩. শতেক বচন [কন্নড় বীরশৈব কবিতা] (২০১৫)

৪. হলদে ওয়ালপেপার এবং অন্যান্য [শার্লট পারকিনস গিলম্যানের গল্প] (২০১৫)

এছাড়াও আছে তাঁর ‘নারী তুমি অর্ধেক আকাশ’, ‘অপরাজিতা রচনাবলী’, ‘সই বারোয়ারী গদ্য-পদ্য’-র মতো আরও অনেক সম্পাদিত গ্রন্থ, আছে ‘নব-নীতা’, ‘এক ডজন রূপকথা’, ‘স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প’, ‘গল্পসমগ্র’, ‘ভ্রমণসমগ্র’, ‘নবনীতা দেব সেন রচনাবলি’ ইত্যাদির মতো অনেকানেক সংকলন, অমনিবাস, সংগ্রহ, সমগ্র ও রচনাবলি জাতীয় গ্রন্থ।